আমার দেখা নয়াচীন

শেখ মুজিবুর রহমান

www.songramernotebook.com

আমার দেখা নয়াচীন
শেখ মুজিবুর রহমান

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

প্রসঙ্গ ‘আমার দেখা নয়াচীন’

ড. আখতার হোসেন

বাংলা ট্রিবিউন

Scanned with CamScanner

আমার দেখা নয়াচীন

শেখ মুজিবুর রহমান

বাংলা একাডেমি

Scanned with CamScanner

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জন্মশতবর্ষ গ্রন্থমালা : ১

আমার দেখা নয়াচীন
শেখ মুজিবুর রহমান

গ্রন্থস্বত্ব : জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট

প্রথম প্রকাশ : ১৮ই মাঘ ১৪২৬/১লা ফেব্রুয়ারি ২০২০
বাএ ৫৯৭৯। অর্থবছর ২০১৯-২০২০। গসঅবি : ৩

মুদ্রণ সংখ্যা : ২০,০০০ কপি

প্রকাশক : মোবারক হোসেন, পরিচালক, গসঅবি বিভাগ, বাংলা একাডেমি
মুদ্রক : সমীর কুমার সরকার, ব্যবস্থাপক, বাংলা একাডেমি প্রেস

গ্রন্থমালার লোগো : রফিকুন নবী
প্রচ্ছদ ও গ্রন্থ-নকশা : তারিক সুজাত
প্রচ্ছদে ব্যবহৃত সম্মেলনের লোগো শান্তির কপোত : পাবলো পিকাসো

মূল্য : ৪০০.০০ টাকা

AMAR DEKHA NAYACHIN [New China as I saw] Sheikh Mujibur Rahman. Published by Mobarak Hossain, Director, Research, Compilation and Lexicography-Encyclopedia Division, Bangla Academy, Dhaka 1000, Bangladesh. First Published : February 2020. Price : Tk. 400.00 only. US $ 40

ISBN 978-984-07-5988-0

Scanned with CamScanner

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-৭৫)

জন্ম ১৭ই মার্চ, ১৯২০ সালে তৎকালীন ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে। পিতা শেখ লুৎফর রহমান, মা সায়েরা খাতুন। তিনি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন টুঙ্গিপাড়া, মাদারীপুর ও গোপালগঞ্জে।

১৯৩৬ সালে স্বদেশি আন্দোলনকারী এবং নেতাজি সুভাষ বসুর সমর্থকদের সংস্পর্শে আসেন। ১৯৩৮-এ বাংলার প্রধানমন্ত্রী এ কে ফজলুল হক ও শ্রমমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীর গোপালগঞ্জ সফরের সুবাদে ১৯৩৯ সালে কলকাতায় সোহরাওয়ার্দীর শিষ্যত্ব গ্রহণ। কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ ও মুসলিম ছাত্রসমাজের নেতৃত্ব প্রদান। ঐ কলেজ থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। পাকিস্তান আন্দোলন এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রতিরোধে নিবেদিতপ্রাণ কর্মী। দেশভাগের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগের ছাত্র হিসেবে চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের দাবি-দাওয়ার আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ায় বহিষ্কৃত। ১৯৪৮ সালের পূর্ব-বাংলার প্রথম ভাষা-আন্দোলনে নেতৃত্বদান এবং একই বছরে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠা। ১৯৪৯-এর ২৩শে জুন পূর্ব-পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হলে যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত। ১৯৫২ সালে পাকিস্তানের প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসেবে নয়াচীনে শান্তি সম্মেলনে যোগদান। ১৯৫৩ সালে দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত। ১৯৫৪-এ স্বল্পকালীন যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার সদস্য। ১৯৫৬ সালে পূর্ব-পাকিস্তান শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম ও দুর্নীতি দমন বিভাগের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ। দ্বিতীয়বার চীন সফর ১৯৫৭ সালে। ১৯৫৮ সালে গ্রেফতার। ১৯৬৬ সালে পূর্ব-বাংলার পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের লক্ষ্যে ৬ দফা পেশ। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেফতার। ১৯৬৯-এ ছাত্রজনতা কর্তৃক 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি লাভ। ১৯৭০ সালে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের অভূতপূর্ব বিজয়। ক্ষমতা হস্তান্তরে পাকিস্তানি স্বৈরশাসকদের টালবাহানা। ১৯৭১-র ৭ই মার্চে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ দান।

১৯৭১-এর ২৬শে মার্চ বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দেন ও পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাতে গ্রেফতার হন। নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিরা ১০ই এপ্রিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠন করেন। ১৭ই এপ্রিল তাজউদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ। মন্ত্রিসভা বঙ্গবন্ধুর পূর্ববর্তী নির্দেশনা অনুযায়ী মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করে। ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় অর্জিত হলে পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি বীরের বেশে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন। বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা এবং বাঙালি জাতিরাষ্ট্রের নির্মাতা হিসেবে কিংবদন্তিতুল্য ব্যক্তিত্ব।

১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ও ১৯৭৫ সালে রাষ্ট্রপতির আসনে অধিষ্ঠিত হন। জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার ভাবাদর্শে বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, বাংলাদেশ পুনর্গঠন ও বিশ্বদরবারে দেশকে তুলে ধরতে ঐতিহাসিক ভূমিকা গ্রহণ। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতাবিরোধী কতিপয় সেনাসদস্য কর্তৃক সপরিবারে মর্মান্তিকভাবে নিহত হন।

www.studybd.net

Scanned with CamScanner

আমার দেখা নয়াচীন

শেখ মুজিবুর রহমান

“সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ, তাদের জীবনযাত্রা, অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসাসহ মৌলিক চাহিদাগুলো মিটাবার জন্য চীন সরকার বিপ্লবের পর কীভাবে উন্নতি করেছে এবং পরিবর্তন এনেছে মানুষের আচরণে তাও জানা যায়। তিনি শুধু সম্মেলনেই অংশগ্রহণ করেন নাই তিনি এই দেশকে খুব গভীরভাবে দেখেছেন। কৃষকের বাড়ি, শ্রমিকের বাড়ি, তাদের কর্মসংস্থান, জীবনমান সবই তিনি দেখেছেন। ছোট ছোট শিশু ও ছাত্রছাত্রীদের গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। শিশু বয়স থেকেই দেশপ্রেম ও কর্তব্যবোধ জাগ্রত করার যে প্রচেষ্টা ও কর্মপন্থা তাও অবলোকন করেছেন। তিনি মুক্তমন নিয়ে যেমন ভ্রমণ করেছেন আবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছেন। প্রতিটি বিষয় গভীর দৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন।”

www.songra

Scanned with CamScanner

১৯৫২ সালের ২-১২ই অক্টোবর চীনের পিকিংয়ে এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় আঞ্চলিক শান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তান প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসেবে এ সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে নয়াচীন সফর করেন। 'আমার দেখা নয়াচীন' স্মৃতিনির্ভর এ ভ্রমণকাহিনি তিনি রচনা করেন ১৯৫৪ সালে কারাগারে রাজবন্দি থাকাকালে। শিল্পিত মন ও সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণে সদ্য বিপ্লবোত্তর গণচীনের শাসনব্যবস্থা ও জীবনচিত্র তুলে ধরেছেন প্রাঞ্জল ভাষায়। এ গ্রন্থে বঙ্গবন্ধুর সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মনোভাব, অসাম্প্রদায়িক ভাবাদর্শ ও বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার গভীর পরিচয় মেলে। একজন তরুণ রাজনীতিকের মনন-পরিচয়, গভীর দেশপ্রেম এবং নিজ দেশকে গড়ে তোলার সংগ্রামী প্রত্যয় ফুটে উঠেছে রচনার পরতে পরতে। অপার সৌন্দর্যপ্রিয়তা, জীবন-সমাজ-সংস্কৃতির প্রতি মুগ্ধদৃষ্টি এবং সঞ্জীবন-তৃষ্ণা এ গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য। এ ভ্রমণকাহিনি রচনার পটভূমি, বহু ঘাত-প্রতিঘাতে পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণ, বর্তমান গ্রন্থ প্রকাশের ইতিবৃত্ত এবং দুর্লভ আলোকচিত্র গ্রন্থটিকে আকর্ষণীয় করেছে। বঙ্গবন্ধুর এ অমিয় ভ্রমণকাহিনি তাঁর অন্য বইগুলোর মতো পাঠকপ্রিয়তা লাভ করবে—এ আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

Scanned with CamScanner

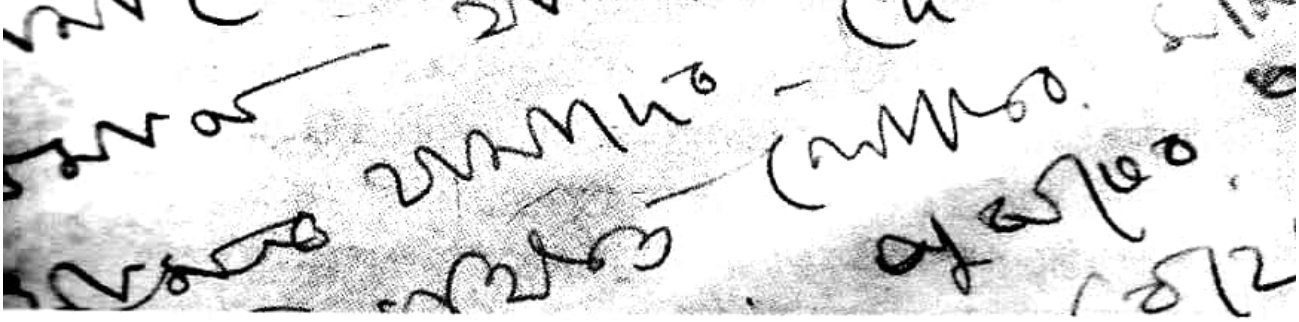

ভূমিকা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫২ সালে চীন ভ্রমণ করেন। পিস কনফারেন্স অব দি এশিয়ান এন্ড প্যাসিফিক রিজিওন্স-এ তদানীন্তন পাকিস্তানের প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসেবে পূর্ব বাংলা থেকে তাঁর নাম দেওয়া হয়। এই সম্মেলনটা অনুষ্ঠিত হয় অক্টোবর মাসে। ঐ বছরই তিনি কারাগার থেকে মুক্তি পান। ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ থেকে বাংলাকে মাতৃভাষার মর্যাদার দাবিতে যে আন্দোলন তিনি করেছিলেন সেই আন্দোলনের দিন থেকে বারবার কারাগারে বন্দি হতে থাকেন। যখনি মুক্তি পেয়েছেন আবার বাংলা ভাষাকে মাতৃভাষার মর্যাদা দান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের দাবি, ক্ষুধার্ত মানুষের অন্নের দাবিতে আন্দোলন ও ভুখা মিছিল করেন। কৃষক, শ্রমিকদের দাবিসহ বিভিন্ন আন্দোলন যা সাধারণ জনগণের ন্যায্য অধিকার আদায়ের দাবি ছিল, সেই সকল দাবি নিয়ে তিনি আন্দোলন করেছেন। যেখানেই গরিব কৃষক, দাওয়ালরা বঞ্চিত হয়েছে তিনি ছুটে গেছেন তাদের কাছে।

রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে সমগ্র পূর্ববঙ্গে যখন সফর করতে যান তখন ফরিদপুর গোপালগঞ্জ-সহ বিভিন্ন জায়গায় গ্রেফতার হন। মুক্তি পেয়ে আবারো আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ১৯৪৯ সালের অক্টোবর মাসে গ্রেফতার হন এবং ২৭শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ সালে মুক্তি পান। দীর্ঘদিন অনশন করেছিলেন রাষ্ট্রভাষার মর্যাদার দাবি আদায়ের জন্য। তাঁর শরীর ভেঙে পড়ে। এরপর সুস্থ হয়ে ঢাকায় এসে আবার কাজ শুরু করেন।

সেই সময় চীন দেশে শান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। নয়াচীন হিসেবে চীন দেশকে অভিহিত করা হতো। সেই চীন দেশে শান্তি সম্মেলনে যাবার দাওয়াত আসে এবং তিনি যোগদান করেন। চীন ভ্রমণের সময় তাঁর যে অভিজ্ঞতা তা তিনি বর্ণনা করেন। এখানে একটা বিষয় লক্ষণীয় যে, এই লেখার মধ্য দিয়ে আমরা দেখি পাকিস্তানি শাসকবর্গ পূর্ববঙ্গের মানুষ যারা সংখ্যায় বেশি অর্থাৎ ৫৬ ভাগ,

Scanned with CamScanner

তাদেরকে কীভাবে বঞ্চনা করেছে সে ধারণাও পাওয়া যায়। ভ্রমণের প্রস্তুতি হিসেবে পাসপোর্ট বানাতে করাচিতে আবেদন পাঠাতে হতো। তখন পাকিস্তানের রাজধানী করাচিতে ছিল। সেখান থেকে হুকুম এলেই পাসপোর্ট তৈরি হয়ে আসত। বিদেশ যাবার ভিসাও পেতে হতো পশ্চিম পাকিস্তান থেকে। প্রতি পদে বিড়ম্বনা হতো। তা অনুধাবন করা যায়।

এই ভ্রমণকাহিনির মধ্যে তখনকার বার্মায় (মিয়ানমার) যাত্রা বিরতির কিছু ঘটনাও তিনি উল্লেখ করেছেন। সেখানে যে অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়েছেন তার মধ্য থেকে সে দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিষয়টা তুলে ধরেছেন। বার্মার আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা নেওয়া যায়। যে সমস্যা এখনও বিদ্যমান তা হলো জাতিগত সংঘাত। আমরা বর্তমান সময়ও সেই একই সংঘাতপূর্ণ অবস্থা দেখতে পাচ্ছি।

প্লেনে চড়ে আকাশে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা এমনকি ছোটখাটো বিষয়ে যেমন মেঘের ভিতরে বাতাস থাকে না বলে যে প্লেনে বাম্পিং হয় আর সেটা যে কারো ভীতির কারণ তা সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। সুদূর চীন ভ্রমণের সময় বিশ্ব শান্তি সম্মেলনের অনেক খুঁটিনাটি বিষয় যা হয়তো আমাদের মতো সাধারণ মানুষের চোখেও পড়ত না। কিন্তু সে বিষয়গুলো চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন। বিশ্বনেতাদের সাক্ষাৎ, কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক, সমাজসেবক ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের নেতাদের সাথে মেলামেশার সুযোগ পেয়েছেন। চীনের মহান নেতা মাও সে তুংয়ের নেতৃত্বে নয়াচীনের জনগণ দীর্ঘ সংগ্রাম ও যুদ্ধ বিজয়ের মধ্য দিয়ে মুক্তি পেয়েছে। স্বাধীন দেশের নাগরিকদের জীবনে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনে উন্নয়নের যাত্রা শুরুসহ নানান বর্ণনা এই লেখায় উল্লেখ রয়েছে।

বিপ্লবের পর সামাজিক ক্ষেত্রে যে একটা পরিবর্তন আসে তা নিয়ন্ত্রণ করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে দেশ কীভাবে পরিচালিত করা যায় তা তিনি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। একটা ধর্মান্ধ জাতিকে অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে দেশকে সকল শ্রেণি-পেশার উন্নয়নে অংশগ্রহণ, দেশপ্রেম, কর্তব্যবোধ সম্পর্কে সচেতন করা এবং মৌলিক চাহিদা পূরণ করে নিজেদের মাতৃভূমিকে গড়ে তোলার দৃষ্টান্ত এ লেখায় পাওয়া যাবে।

সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ, তাদের জীবনযাত্রা, অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসাসহ মৌলিক চাহিদাগুলো মিটাবার জন্য চীন সরকার বিপ্লবের পর কীভাবে উন্নতি করেছে এবং পরিবর্তন এনেছে মানুষের আচরণে তাও জানা

Scanned with CamScanner

যায়। তিনি শুধু সম্মেলনেই অংশগ্রহণ করেন নাই তিনি এই দেশকে খুব গভীরভাবে দেখেছেন। কৃষকের বাড়ি, শ্রমিকের বাড়ি, তাদের কর্মসংস্থান, জীবনমান সবই তিনি দেখেছেন। ছোট ছোট শিশু ও ছাত্রছাত্রীদের গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। শিশু বয়স থেকেই দেশপ্রেম ও কর্তব্যবোধ জাগ্রত করার যে প্রচেষ্টা ও কর্মপন্থা তাও অবলোকন করেছেন। তিনি মুক্তমন নিয়ে যেমন ভ্রমণ করেছেন আবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছেন। প্রতিটি বিষয় গভীর দৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন। আমরা যেমন চীন দেশকে জানতে পারি আবার চমৎকার একটা ভ্রমণকাহিনি যা সে দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, নদীতে নৌকা ভ্রমণ, রিকশায় ভ্রমণ, ট্রেনে ভ্রমণ আর আকাশপথ তো আছেই। সকল ভ্রমণে তাঁর হাস্যরসিকতা, প্রবীণ নেতাদের প্রতি দায়িত্ববোধ সবই জানা যায়।

এই ভ্রমণকাহিনি যতবার পড়েছি আমার ততবারই মনে হয়েছে যে তিনি গভীর পর্যবেক্ষণ করেছেন প্রতিটি ক্ষেত্রে। তার কারণ হলো তাঁর ভিতরে যে সুপ্ত বাসনা ছিল বাংলার মানুষের মুক্তির আন্দোলন ও স্বাধীনতা অর্জন সেটাই বারবার ফুটে উঠেছে আমার মনে, এ-কথাটাও অনুভব করেছি।

এই ভ্রমণকাহিনি অতি প্রাঞ্জল বর্ণনা দিয়ে তিনি পাঠকের জন্য উপভোগ্য করেছেন। প্রতিটি শব্দ, বাক্য, রচনার যে পারদর্শিতা আমরা দেখি তাতে মুগ্ধ হয়ে যাই। বাঙালি জাতিকে তিনি অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে সংগ্রামের পথ পাড়ি দিয়ে স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আক্রমণে বাংলাদেশ ক্ষত-বিক্ষত হয়েছিল। সমগ্র বাংলাদেশকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে গণহত্যা ও নারী ধর্ষণের মধ্য দিয়ে এক বীভৎস পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল। আমরা মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জন করেছি। স্বাধীনতা অর্জনের নেতৃত্ব ১৯৪৮ সাল থেকে ভাষা-আন্দোলনের পথ বেয়ে ১৯৭১ সালে বিজয় অর্জন করি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে। তাঁরই লেখা এ ভ্রমণকাহিনি।

১৯৫২ সালের চীন ভ্রমণের এ কাহিনি তিনি রচনা করেছিলেন ১৯৫৪ সালে যখন কারাগারে ছিলেন। তাঁর লেখা খাতাখানার ওপর গোয়েন্দা সংস্থার সেন্সর ও কারাগার কর্তৃপক্ষের যে সিল দেওয়া আছে তা থেকেই সময়কালটা জানা যায়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের খাতাগুলি কীভাবে রক্ষা পেয়েছে এবং আমি খুঁজে পেয়েছি সে কথা তাঁর লেখা ডায়েরি 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' ও 'কারাগারের রোজনামচা'র ভূমিকাতে বিস্তারিত লিখেছি; তাই এখানে আর পুনরাবৃত্তি করলাম না।

Scanned with CamScanner

১৯৫৭ সালে তিনি আরো একবার চীন ভ্রমণ করেছিলেন যখন শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম, দুর্নীতি দমন ও ভিলেজ-এইড দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন। সে সময় চীন সরকারের আমন্ত্রণে পাকিস্তান সংসদীয় দলের নেতা হিসেবে চীন ভ্রমণে যান। তবে সে ভ্রমণের কোনো লেখা পাই নাই। সে সময়ের ছবি আমাকে উপহার দিয়েছেন চীনের বর্তমান মহামান্য রাষ্ট্রপতি শী জিনপিং। তিনি যখন বাংলাদেশ ভ্রমণে আসেন তখন একটা অ্যালবাম আমাকে উপহার দেন সেই ছবিগুলি এখানে তুলে দিয়েছি। রাষ্ট্রপতি শী জিনপিংকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

১৯৫২ সালের ভ্রমণের ছবিগুলি আমাদের গ্রামের বাড়িতে রাখা ছিল। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আমাদের বাড়ি পুড়িয়ে দেয়। আর ঢাকায় ধানমন্ডির বঙ্গবন্ধু ভবনেও কিছু ছিল, সে বাড়িও ১৯৭১ ও ১৯৭৫ সালে দুইবার লুট করা হয়। ছবির জন্য অনেক চেষ্টা করেছি এবং শেষ পর্যন্ত ১৯৫২ সালের শান্তি সম্মেলনের অনেক ছবি সংগ্রহ করে দিয়েছেন জনাব তারিক সুজাত। তাঁকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ এই অমূল্য ছবিগুলো সংগ্রহ করে দেওয়ার জন্য। আমি যখন একেবারেই হতাশ হয়ে পড়েছিলাম যে এ ছবি বোধ হয় আর কখনোই আমি পাবো না ঠিক তখন তিনি আমাকে ছবিসহ শান্তি সম্মেলনের অনেক মূল্যবান তথ্য এনে দেন। ছবি, স্ট্যাম্প, পোস্টার ইত্যাদি।

আমি আশা করি পাঠকসমাজের কাছে এই বইটি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জীবনের অনেক ঘটনা জানার সুযোগ করে দিবে। অনেক অজানা কাহিনি জানারও সুযোগ হবে। তাঁর লেখা ভ্রমণকাহিনি পড়লে আজকে চীন যে উন্নতি করেছে তারই যেন ভবিষ্যৎ ধারণা তিনি দিয়েছেন। তাঁর দূরদৃষ্টি এবং পর্যবেক্ষণের গভীরতা আমাকে বিস্মিত করেছে। যখনই চীন ভ্রমণ করেছি বারবার এই লেখার কথা আমার মনে পড়েছে কীভাবে তাঁর ভবিষ্যদ্‌বাণী সত্যে পরিণত হয়েছে।

চীন বর্তমান বিশ্বে অন্যতম অর্থনৈতিক শক্তিশালী দেশ হিসেবে স্থান করে নিয়েছে। ১৯৫২ সালে চীন ভ্রমণের সময় গভীর দৃষ্টি নিয়ে নয়াচীন পর্যবেক্ষণ করেছিলেন এবং ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন, সে-কথাই বাস্তবে রূপ পেয়েছে। ভ্রমণের সময় আলাদা একটা খাতায় তিনি নোট নিয়েছিলেন সে খাতাটাও পেয়েছি এবং সেগুলি বইয়ের শেষাংশে দেওয়া আছে।

এই লেখা জনগণের হাতে তুলে দিতে পেরে আমি আনন্দিত। দীর্ঘদিন ধরে বেবী মওদুদ ও আমি কাজ করেছি। বেবী আর ইহজগতে বেঁচে নাই। থাকলে খুবই খুশি হতো। ইংরেজি অনুবাদ ড. ফকরুল করে দিয়েছেন, তাঁকে ধন্যবাদ

Scanned with CamScanner

জানাচ্ছি। শামসুজ্জামান খান পরামর্শ দিয়েছেন, পড়ে দেখেছেন, সে জন্য তাঁকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। বইটি প্রকাশনার জন্য যারা প্রস্তুত করেছেন এবং দিন-রাত অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাদেরকেও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

চীনের মহামান্য রাষ্ট্রপতি ছবিগুলো দিয়েছেন যা এই বইকে সমৃদ্ধশালী করেছে, তাঁর প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সবসময়ে আমার মায়ের কথাই মনে পড়ে। আমার মা যে কত রাজনীতি-সচেতন ছিলেন, কত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন, আমার আব্বাকে তিনি লেখার প্রেরণা দিতেন খাতাগুলি কিনে দিতেন আবার আব্বা যখন জেল থেকে মুক্তি পেতেন তখন খাতাগুলি সংগ্রহ করে সযত্নে রেখে দিতেন। তিনি নিশ্চয়ই আশা করেছিলেন যে এই লেখাগুলি একসময় বই আকারে ছাপা হবে। কিন্তু তিনি তা দেখে যেতে পারলেন না। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট কালরাতে বাবার সাথেই শাহাদত বরণ করেছেন। ঘাতকের বুলেটের নির্মম আঘাতে চিরদিনের মতো না ফেরার দেশে চলে গেছেন। আমার ভাই কামাল ও জামাল এবং তাদের নব পরিণীতা স্ত্রী সুলতানা ও রোজী, আমার দশ বছরের ছোট ভাই শেখ রাসেল, একমাত্র চাচা শেখ নাসের-সহ পরিবারের ১৮ জন সদস্য নিহত হয়েছেন।

আমার মা দেখে যেতে পারলেন না তাঁরই সযত্নে রাখা অমূল্য সম্পদ জনতার কাছে পৌছে গেছে। মায়ের কথাই সবসময় আমার মনে পড়ে। মাকে যদি একবার বলতে পারতাম, দেখাতে পারতাম আব্বার লেখাগুলি পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয়েছে তাহলে কত খুশি হতেন। মা, তোমার কথাই বারবার মনে পড়ে মা।

শেখ হাসিনা

৭ই ডিসেম্বর ২০১৯

Scanned with CamScanner

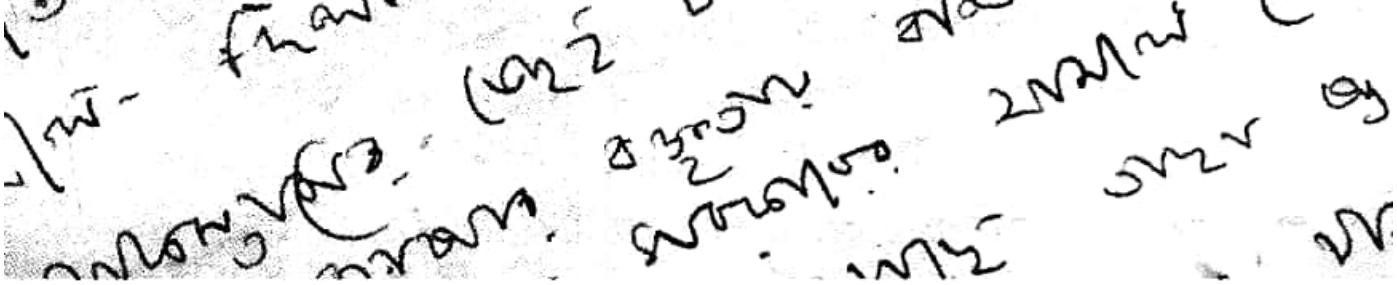

আমার দেখা নয়াচীন

১৯৫২ সালে জেল হতে বের হলাম, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের পর। জেলে থাকতে ভাবতাম আর মাঝে মাঝে মওলানা ভাসানী সাহেবও বলতেন, 'যদি সুযোগ পাও একবার চীন দেশে যেও।' অল্পদিনের মধ্যে তারা কত উন্নতি করেছে। চীন দেশের খবর আমাদের দেশে বেশি আসে না এবং আসতে দেওয়াও হয় না। তবুও যতটুকু পেতাম তাতেই মনে হতো যদি দেখতে পেতাম কেমন করে তারা দেশকে গড়েছে!

হঠাৎ সেপ্টেম্বর মাসে আমন্ত্রণ এলো পিকিং-এ শান্তি সম্মেলনে যোগদান করতে হবে। *পাকিস্তান শান্তি কমিটি* আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছে। পূর্ব বাংলা থেকেও কয়েকজনকে যেতে হবে। ৩৭টি দেশ এতে যোগদান করবে। অনেকে বলতে পারেন কম্যুনিস্টদের শান্তি সম্মেলনে আপনারা যোগদান করবেন কেন? আপনারা তো কম্যুনিস্ট না। কথাটা সত্য যে আমরা কম্যুনিস্ট না। তথাপি দুনিয়ায় আজ যারাই শান্তি চায় তাদের শান্তি সম্মেলনে আমরা যোগদান করতে রাজি। রাশিয়া হউক, আমেরিকা হউক, ব্রিটেন হউক, চীন হউক যে-ই শান্তির জন্য সংগ্রাম করবে তাদের সাথে আমরা সহস্র কণ্ঠে আওয়াজ তুলতে রাজি আছি, 'আমরা শান্তি চাই'। কারণ যুদ্ধে দুনিয়ার যে ক্ষতি হয় তা আমরা জানি ও উপলব্ধি করতে পারি; বিশেষ করে আমার দেশে —যে দেশকে পরের দিকে চেয়ে থাকতে হয়, কাঁচামাল চালান দিতে হয়। যে দেশের মানুষ না খেয়ে মরে, সামান্য দরকারি জিনিস জোগাড় করতে যাদের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে, সে দেশে যুদ্ধে যে কতখানি ক্ষতি হয় তা ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের কথা মনে করলেই বুঝতে পারবেন। কোথায় ইংরেজ যুদ্ধ করছে, আর তার জন্য আমার দেশের ৪০ লক্ষ লোক শৃগাল কুকুরের মতো না খেয়ে মরেছে। তবুও আপনারা বলবেন, আজ তো স্বাধীন হয়েছি। কথা সত্য, 'পাকিস্তান' নামটা পেয়েছি; আর কতটুকু স্বাধীন হয়েছি আপনারা

Scanned with CamScanner

নিজের দিকে তাকালেই বুঝতে পারবেন। যাহা হউক, পাকিস্তান গরিব দেশ, যুদ্ধ চাইতে পারে না। যুদ্ধ হলে পাকিস্তানের জনগণের সকলের চেয়ে বেশি কষ্ট হবে এই জন্য। তাদের পাট, চা, তুলা অন্যান্য জিনিস বিদেশে বিক্রি না করলে দেশের জনগণের কষ্টের সীমা থাকবে না। দুর্ভিক্ষ মহামারি সমস্ত দেশকে গ্রাস করবে। তাই মানুষের মঙ্গলের জন্য, পাকিস্তানের স্বার্থের জন্য —যুদ্ধ চাই না, শান্তি চাই।

ঠিক করলাম শান্তি সম্মেলনে যোগদান করতে হবে। আমাদের পূর্ব বাংলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি জনাব আতাউর রহমান খান, ইত্তেফাক সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন, যাকে আমরা সকলে 'মানিক ভাই' বলি, বন্ধুবর খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস আর ইউসুফ হাসান এবং আমি, এই পাঁচজন যাবো ঠিক হলো। কিন্তু পাসপোর্ট কোথায়? ওটা না হলে তো আর কোনো প্লেন আমাদের নেবে না। সকলেই সরকারের কাছে দরখাস্ত করেছে, করি নাই আমি—কারণ কোথাও আবার সভা করতে গিয়ে থাকবো। আরও ভেবেছিলাম, বোধ হয় পাসপোর্ট পাওয়া যাবে না। যা হোক, যাবার মাত্র একদিন পূর্বে বন্ধুবর ইয়ার মোহাম্মদ খান (তৎকালীন আওয়ামী লীগের ট্রেজারার), যিনি আওয়ামী লীগের ট্রেজারার, আমাকে বললেন, আজই দরখাস্ত করো। চেষ্টা করে দেখা যাবে। যা হউক, তাঁর ও আতাউর রহমান সাহেবের কথায় দরখাস্ত করলাম। কিন্তু পরে আবার জানতে পারলাম আমার দরখাস্ত পাসপোর্ট অফিসে পৌঁছে নাই। মহাবিপদ! পাসপোর্ট অফিসার জনাব শুকুর সাহেব খুব ভালো লোক। ব্যবহারও চমৎকার, আর কাজও করতে পারেন। তাঁর মতো কর্মচারী হলে দেশের উন্নতি হতে বাধ্য। তিনি বললেন, আবার আমার কাছে আর একটা দরখাস্ত করুন। তাই করলাম। তার হাতে তো আর ক্ষমতা নাই—'লাল ফিতার প্যাঁচ'। করাচির হুকুম প্রয়োজন। তাহা না হলে তো পাকিস্তানের বিশেষ করে পূর্ব বাংলার কোনো জলসাই হয় না। খবর নিয়ে দেখা গেল তখনও হুকুম পৌঁছে নাই। হোম ডিপার্টমেন্টের অনুমতি নাই। সন্ধ্যা পর্যন্ত আমরা সকলেই বসে রইলাম পাসপোর্ট অফিসে। পরের দিনই যেতে হবে—কোনো কিছু ঠিক করতে পারি নাই। কাপড় জামা টাকা পয়সা কোনো কিছুর জোগাড় নাই। রাত্রে করাচি থেকে মিয়া ইফতেখার উদ্দিনের কাছ থেকে খবর পেলাম সিট রিজার্ভ করা হয়ে গেছে। সকালে আবার পাসপোর্ট অফিসে গেলাম। প্রায় দশটার সময় খবর এলো হুকুম

Scanned with CamScanner

এসেছে পাসপোর্ট দিয়ে দিতে। কিন্তু ১২টায় বিওএসি প্লেন ছেড়ে যাবে—এর মধ্যে কী করবো? ভেবে কূল পাই না। সাড়ে এগারোটার সময় পাসপোর্ট পেলাম। ফোন করে জানলাম, প্লেন ২৪ ঘণ্টা লেট। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। সময় কিছু পাওয়া গেল। পাসপোর্ট নিয়ে ব্রিটিশ হাই কমিশনারের অফিসে গেলাম। ব্রহ্মদেশের কনসাল অফিসে গেলাম। আমরা সকলেই এক সাথে ঘুরছি। পরে জানা গেল ভিসার প্রয়োজন নাই, কারণ আমরা তো এখনও 'রানিমা'র প্রজা।

আমাদের বিদেশে লিখতে হবে পাকিস্তানি ব্রিটিশ নাগরিক। হায়রে স্বাধীনতা! বাড়ি ফিরতে প্রায় ৬টা বেজে গেল। টাকার প্রয়োজন, আমরা তো বড়লোক নই। আর পাকিস্তানে ফটকা ব্যবসাও করতে আসি নাই যে নগদ টাকা থাকবে! ধার করতে হবে। জোগাড়ে লেগে গেলাম। ফরেন এক্সচেঞ্জ দরকার। যাহা হোক, কোনোমতে কিছু জোগাড় করলাম, কাপড়-চোপড়ও কিছু জোগাড় হলো। দুই বৎসর আড়াই বৎসর জেলে থেকে কাপড় প্রায়ই ছোট হয়ে গেছে।

পরের দিন সকালে হঠাৎ আতাউর রহমান সাহেব ফোন করলেন প্লেন ৮টায় আসবে, যথাসময় ৯টায় ছাড়বে। আমাকে খুঁজতে আতাউর রহমান সাহেব গেছেন, আর আমি খুঁজতে আসছি তাঁকে। তাঁর বাসায় খবর পেলাম প্লেন ছাড়ার সময়। তাড়াতাড়ি কমলাপুর চললাম মানিক ভাইকে আনতে, কারণ তিনি তো খবর জানেন না। যেয়ে দেখি মানিক ভাই বসে রয়েছেন, কোনো প্রস্তুতি নাই। উনি ঠিক করেছেন যাবেন না, কারণ টাকার অভাব; বিশেষ করে ইত্তেফাকের লেখা কে লিখবে, টাকার জোগাড় কে করবে? আপনারা বোধ হয় জানেন না, মানিক ভাই ইত্তেফাকের শুধু সম্পাদক নন, লেখক, প্রকাশক থেকে শুরু করে পিয়নও বটে। দুনিয়ার যাবতীয় কাজ তাঁর প্রায় একলারই করতে হয়। অন্য কর্মীরা প্রায়ই জেলে, ওয়াদুদ বাইরে। ওয়াদুদের ওপর সমস্ত ভার দিলেন। আর খোন্দকার আবদুল হামিদের মতো ২/১ জনকে লেখা দিতে অনুরোধ করে রওয়ানা হলেন। আওয়ামী লীগ অফিসে এসে আতাউর রহমান সাহেবের সাথে দেখা হলো। আমরা তেজগাঁ অ্যারোড্রামের দিকে রওয়ানা হলাম, যেয়ে দেখি প্লেন প্রস্তুত; পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দও উপস্থিত। খুবই আনন্দিত হলাম, বিশেষ করে মাহমুদুল হক কাসুরী, আবদুল্লা মল্লিক ও অনেককে দেখে।

Scanned with CamScanner

প্লেন ছেড়ে দিলো। ভাবলাম নূতন দেশ দেখবো, কত আনন্দ! শুনে আরও খুশি হলাম রেঙ্গুনে বিকাল ও রাতে থাকতে পারবো বলে। সারা বিকাল আমরা রেঙ্গুন শহর দেখতে পারবো। প্রায় ২টায় রেঙ্গুন পৌছলাম। আমাদের বিরাট একটা হোটেলে নিয়ে যাওয়া হলো। সুন্দর কামরা দেওয়া হলো। আমরা গোসল করে প্রস্তুত হলাম। আতাউর রহমান সাহেব তাঁর দূর সম্পর্কের এক আত্মীয় টাঙ্গাইলের আরফান খান সাহেবের ছেলে আজমল খাঁ—ওখানে থেকে ব্যবসা করে—অনেক টাকার মানুষ ও পুরানা ব্যবসায়ী, সকলে জানে ও চেনে—তাকে ফোন করে দিলেন। কিছু সময়ের মধ্যেই তিনি এলেন। তাঁর নিজের মটরগাড়ি আছে। সেই গাড়িতে করে প্রথমেই তাঁর রয়াল স্টেশনারি দোকানে নিয়ে গেলেন বিরাট দোকান দেখে আনন্দ হলো। তাঁর কাছ থেকে শুনলাম নিজের চেষ্টায়ই তিনি লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক। তার বয়স ৩০/৩৫ বৎসর হবে। দেশি লোক পেয়ে অনেকদিন পরে সে আমাদের সাথে প্রাণ খুলে আলাপ করলো। দেশের কথা জানতে চাইলো। আমাদের নিরপেক্ষভাবে ব্রহ্মদেশের খবর দিলো। তাঁর বাসায় নিয়ে গেল এবং স্ত্রীর সাথে পরিচয় করিয়ে দিলো। ভদ্র মহিলার চমৎকার ব্যবহার, নিজেই আমাদের খাওয়ালেন। তারপর ক্লাব, বৌদ্ধদের প্যাগোডাসহ সব ভালো ভালো জায়গা—আমাদের দেখালেন।

যতদূর খবর নিয়ে জানলাম, ব্রহ্মদেশের অবস্থা খুবই খারাপ। বিপ্লবীরা বহুস্থান দখল করে আছে, আর মাঝে মাঝেই রেঙ্গুন শহরের পানি বন্ধ করে দেয়। আর একটা ভয়াবহ খবর পেলাম, 'ব্যান্ডিট'রা দিনে দুপুরে ডাকাতি করে। ভয়েতে দিনের বেলায়ও কেউ জানাশোনা মানুষ না হলে দরজা খোলে না।

আতাউর রহমান সাহেবের আর এক চেনা মানুষ, খুব নামকরা—রেঙ্গুনেই থাকেন, তিনি একজন ডাক্তার, তাঁর বাড়িতে আমরা যাই। তিনি বাড়ি ছিলেন না। অনেক ডাকাডাকি করলাম, দরজা খোলে না দোতালার উপর থেকে ঐ দেশি এক মহিলা কথা বললেন। তাঁকে দরজা খুলতে বলা হলো, তিনি অস্বীকার করলেন। আমরা বললাম, একটু কাগজ দেন, একটা চিঠি লিখে রেখে যাই। তিনি বললেন, কাগজ দিতে হলে দরজা খুলতে হবে। তোমাদের চিনি না। পরে চিঠি লিখে তাকে নিতে বললাম, তিনি অস্বীকার করলেন। বললেন, "ওখানে ফেলে যাও, তোমরা চলে গেলে আমি কুড়াইয়া নিব।" আমরা আজমল খাঁ সাহেবের কাছে জিজ্ঞাসা করলাম, এর কারণ কী? তিনি বললেন, "এইভাবে ডাকাত দল বাড়িতে আসে, তারপর হাত পাও

Scanned with CamScanner

বেঁধে সর্বস্ব নিয়ে চলে যায়। এটা দিনের বেলায় প্রায়ই হয়ে থাকে। পথের থেকেও টাকাওয়ালা লোক ধরে নিয়ে যায়। পরে টাকা দিলে ছেড়ে দেয়।"

যা হোক, এরপর প্যাগোডা দেখতে গেলাম। প্যাগোডা বৌদ্ধদের প্রার্থনা করার মন্দির। অনেক অর্থ দিয়ে গড়া বিরাট বিরাট মন্দির, দেখতে খুবই সুন্দর। ও দেশের লোকগুলি খুবই ধর্মভীরু বলে মনে হলো। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে এক একটা মন্দির করেছে।

রাত্রে আমরা আমাদের রাষ্ট্রদূতের সাথে দেখা করতে গেলাম। তিনি আমাদের চাকার লোক, মিষ্টভাষী সন্দেহ নাই। আমরা যেয়ে দেখি ছবি দেখছেন, সে ছবি আমাদের রাষ্ট্রদূতের অফিস থেকে তোলা হয়েছে। প্রায় সকল ছবিই আমাদের রাষ্ট্রদূতের নিজের ও তার আত্মীয় পরিবার পরিজনের। কোথায় কবে খানা খেয়েছেন, কবে 'ব্যাঙকোয়েট' দিয়াছেন, ব্রহ্মদেশের প্রধানমন্ত্রীকে রাষ্ট্রদূত অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন ইত্যাদি ইত্যাদি। সেগুলি রঙিন ছবি। কত টাকা খরচ করা হয়েছে, গোপনে খোঁজ নিতে চেষ্টা করলাম। অনেকে অনেক রকম বললো, মনে হয় যথেষ্ট খরচ হয়েছে।

রাষ্ট্রদূত অনেক জাঁকজমকের সাথেই থাকেন, বিরাট অফিস ও বহু কর্মচারী তাঁকে সাহায্য করে। দেখে মনে হলো, যাদের টাকা দিয়া এত জাঁকজমক তাদের অবস্থা চিন্তা করলেই ভালো হতো। তাদের ভাতও নাই, কাপড়ও নাই, থাকবার মতো জায়গাও নাই। তারা কেউ না খেয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘোরে। তাদেরই সামনে ছেলেমেয়েরা না খেয়ে তিলে তিলে মারা যায়। নীরবে শুধু অশ্রু বিসর্জন করে আর খোদার কাছে ফরিয়াদ জানায়। জানি না খোদার কাছে সে ফরিয়াদ পৌঁছে কি না!

ব্রহ্মদেশ সম্বন্ধে যা কিছু শুনলাম ও বুঝতে পারলাম তার কিছুটা প্রকাশ করতে চাই। অনেকেই জানেন ওদেশে গৃহযুদ্ধ চলছে। যাকে আমরা অনেকেই 'বিপ্লব' বলে থাকি। কম্যুনিস্ট ও কারেন সম্প্রদায়ের লোকেরা যুদ্ধ করছে সরকারের বিরুদ্ধে, দেশকে নিজেদের দখলে নেওয়ার জন্য। উ নু সরকারও তাদের সাথে ভীষণ যুদ্ধ চালাচ্ছে; কিন্তু ৫/৬ বৎসরেও বিদ্রোহীদের দমন করতে পারছে না। তার প্রধান কারণ এটা একটি জঙ্গলময় দেশ। বিরাট বিরাট বন, পাহাড়; নদীর সংখ্যাও খুব বেশি। কখনও বিদ্রোহীরা সম্মুখ যুদ্ধে আসে না। গেরিলারা যুদ্ধ চালায়। হঠাৎ আক্রমণ করে গভীর বনে পালাইয়া যায়। কার সাধ্য তাদের খুঁজে পায়!

Scanned with CamScanner

তবে বিদ্রোহীরা কিছু করতে পারছে না। এর কারণ কী? কারণ জনগণের সমর্থন ছাড়া বিপ্লব হয় না। সংগ্রামরত কম্যুনিস্টরা একটি সুবিধা পেয়েছে কারেন সম্প্রদায়ের সমর্থন পেয়ে। কারেন একটা জাতি। এরা ব্রহ্মদেশ সরকারের কাছে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দাবি করে, কিন্তু সরকার তা দিতে অস্বীকার করায় তারা কম্যুনিস্টদের সাথে এক হয়ে বিপ্লব শুরু করে। জাপান যখন ব্রহ্মদেশ অধিকার করে তখন এরা বহু অস্ত্র জোগাড় করে। পরে সরকারের সাথে যুদ্ধে এইগুলি কাজে লাগায়। এখন ব্রহ্ম সরকার কারেনদের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার দিতে রাজি আছে। কারেনদের যদি ব্রহ্ম সরকার হাতে নিতে পারে অথবা তাদের সঙ্গে একটা মিটমাট করতে পারে তাহলে কম্যুনিস্টরা বেশিদিন টিকতে পারবে না, হয় তাদের আত্মসমর্পণ করতে হবে, না হয় দেশ ছেড়ে পালাতে হবে।

পূর্বেই বলেছি, জনসমর্থন ছাড়া বিপ্লব হয় না। কম্যুনিস্টদের জনসমর্থন তত নাই। কারণ, তারা মাঝে মাঝে রেঙ্গুন শহরের পানি সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। যাকে তাকে ধরে নিয়ে টাকা আদায় করে, আর যে অঞ্চল তাদের অধিকারে যায় সেই অঞ্চলের জনগণের কাছ থেকে অর্থ ও খাদ্য আদায় করে। বোধ হয় গভীর জঙ্গলে থাকে তারা, তাই জোগাড় করতে পারে না খাদ্য ও অন্যান্য, যা তাদের বিশেষ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, এটুকু জানবার সুযোগ হয়েছে আমার।

অনেক রাত্রে হোটেলে ফিরে এলাম। সেখানেও অনেকের সাথে আলাপ হলো। ভোরেই আমাদের প্লেন ছাড়বে। তাই একটু ঘুমাতে চেষ্টা করলাম। খুব ভোরে আমাদের প্লেন ছাড়লো। প্রায় ৩ ঘণ্টা পরে আমরা ব্যাংককে পৌছলাম সামান্য এক ঘণ্টা বিশ্রাম করার পর আবার রওয়ানা হলাম হংকংয়ের দিকে। প্রায় ৪ ঘটিকার সময় আমরা হংকং পৌছলাম। যাবার সময় প্রশান্ত মহাসাগরের উপর দিয়ে আমাদের উড়োজাহাজ চললো, নিচে সমুদ্র। আমরা উড়ে চলেছি, মাঝে মাঝে মেঘ দেখলে মানিক ভাই ঠাট্টা করে বলতেন, "আবার বামপিং আসছে, খেয়েছে বাবা।" আমরা সাবধান হয়ে বসতাম। কারণ প্লেন মেঘের মধ্যে দিয়ে যাবার সময় নিচের দিকে নেমে পড়ে, তাতে অনেকের দম নিতে কষ্ট হয়। কারণ মেঘের মধ্যে হাওয়া থাকে না।

হংকংয়ের কাছে যখন গেলাম তখন মনে হতে লাগলো, আহা দূর থেকে দেখতে কী সুন্দর দেশ! পাহাড়ের উপর থেকে আস্তে আস্তে একটা দেশ নিচের সমুদ্র পর্যন্ত নেমে আসছে, মধ্যে মধ্যে নদী। একটা বাড়ি অনেক

Scanned with CamScanner

উপরে, একটা বাড়ি অনেক নিচে। সমুদ্রের পাড়ে জাহাজ ভিড়ে আছে, কোনো কোনো জাহাজ আবার ছেড়ে যাচ্ছে। আবার ছোট ছোট লঞ্চগুলি এদিক ওদিক ছোটাছুটি করছে।

আমি লেখক নই, আমার ভাষা নাই, তাই সৌন্দর্যটা অনুভব করতে পারছি, কিন্তু গোছাইয়া লেখতে পারি না। পাঠকবৃন্দ আমায় ক্ষমা করবেন।

হংকংয়ের কোলন হোটেলে আমাদের রাখা হলো। কিছু সময়ের মধ্যে পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ পীর সাহেব মানকী শরীফ, খান গোলাম মহম্মদ খান লুন্দখোর, ফজলুল হক সায়েদা, মি. হানিফ এবং পাঞ্জাব থেকে কয়েকজন নেতা পৌঁছালেন। তাঁদের মধ্যে পাঞ্জাব মুসলিম লীগ দলের মি. আবদুল কাইয়ুমও সদস্য ছিলেন। সেখানে বসে আমাদের নেতা ঠিক করা হলো। সকলে মিলে পীর মানকী শরীফকে পাকিস্তান ডেলিগেশনের নেতা এবং জনাব আতাউর রহমান খান ও জনাব মাহমুদুল হক কাসুরী ডেপুটি নেতা হলেন। কম্যুনিস্ট দেশে যাচ্ছি, কিন্তু আমাদের দলের মধ্যে অধিকাংশই আমরা কম্যুনিস্ট ভাবাপন্ন না। ভারতবর্ষ থেকেও কম্যুনিস্ট ছাড়া অনেকে বড় বড় কংগ্রেসী, ফরওয়ার্ড ব্লক নেতৃবৃন্দ গিয়াছিলেন। আমরা আওয়ামী লীগের লোক—সংখ্যায় বেশি হয়ে গেলাম; কম্যুনিস্টরা আমাদের 'প্রতিক্রিয়াশীল' বলে থাকে; আর মুসলিম লীগরা কম্যুনিস্ট ভাবাপন্ন বলে গালমন্দ করে থাকে।

আমরা চা খেলাম। কাগজের রিপোর্টার এসে আমাদের ফটো নেওয়া শুরু করলো। আমরা হোটেলে এসে দেখলাম যার যার মালপত্র তার তার রুমে ঠিক করে রাখা হয়েছে। কাপড়চোপড় পরিবর্তন করে তাড়াতাড়ি আমরা হংকং শহর দেখতে বের হলাম। কিছু কাপড়চোপড়ও আমাদের কিনতে হবে। আমরা আমাদের পাকিস্তানি টাকা পরিবর্তন করে হংকং ডলার করলাম। হংকংয়ে বহু দোকান দেখলাম সিন্ধু প্রদেশের হিন্দুদের। আমাদের পেয়ে তারা খুব খুশি হলো। তাদের দোকান থেকেই আমরা মালপত্র কিনলাম। তারা আমাদের কাছে দেশের কথা জানতে চাইলো। তারা বললো, "আমরা পাকিস্তানি, দেশে ফিরে যেতে পারবো কি না? আমাদের আত্মীয়স্বজন সকলেই হিন্দুস্তানে চলে এসেছে। বাড়িঘর বোধ হয় নাই।" অনেক প্রশ্ন করলেন। আমরাও তাদের সান্ত্বনা দিলাম। বললাম, দেশ সকলের, আপনারা ফিরে গেলে নিশ্চয়ই আপনাদের ঘরবাড়ি ফিরে পাবেন।

Scanned with CamScanner

এক দোকানদারের একটা যুবক ছেলে ছিল। সে দোকানেই থাকতো। আমার সাথে আস্তে আস্তে আলাপ করা শুরু করলো। জিজ্ঞাসা করলো, "আপনি কম্যুনিস্ট? বললাম, না। আমাদের স্বতন্ত্র দল আছে, দলের নাম তাকে বললাম এবং বললাম আমাদের প্রোগ্রাম আছে, ম্যানিফেস্টো আছে। আমাদের দলের নেতা জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। এঁরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন। আইন করে কারও কণ্ঠরোধ করার উদ্দেশ্য আমাদের দলের নাই। আমরা দেশের সম্পদ এবং ন্যায়ভিত্তিক আদর্শ দিয়ে দেশ গড়তে চাই। ভাড়া করে কোনো আদর্শ আমরা গ্রহণ করতে প্রস্তুত নই। আবার মিছামিছি কোনো আদর্শকে লোকের চোখে হেয় করতেও চাই না। মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতায় আমরা বিশ্বাস করি।" সে অনেক কিছু জানতে চাইল, যতটুকু উত্তর দেওয়া যায় দিলাম। যেখানে দেওয়া যায় না, হ্যাঁ, না বলেই শেষ করে দেই। কারণ দেশের ভিতরে আমাদের সরকারের অন্যায়- অত্যাচার সম্বন্ধে বললেও বিদেশে বলার পক্ষপাতী আমরা নই। কারণ এটা আমাদের ঘরোয়া ব্যাপার বলে মনে করি।

যা হোক, ভদ্রলোক যখন দেখলো আমি কম্যুনিস্ট না এবং আমার কথায় যখন তার বিশ্বাস হলো, তখন সে আমার সাথে প্রাণ খুলে আলাপ করতে আরম্ভ করলো। ভদ্রলোক কট্টর কম্যুনিস্ট-বিরোধী।

তিনি আমাকে নয়াচীন সম্বন্ধে অনেক আজগুবি গল্প বলতে শুরু করলেন। বিশেষ করে এ কথা বললেন যে, 'নয়াচীন সরকার কায়েম হওয়ার পরে অনেকের ওপর অমানুষিক অত্যাচার করেছে, অনেককে ফাঁসি দিয়েছে, অনেককে গুলি করে হত্যা করেছে। অনেকে ঘরবাড়ি ছেড়ে হংকংয়ে পালিয়ে এসেছে। আজ তাদের দুর্দশার সীমা নাই'। বুঝলাম, লোকটা ভাবপ্রবণ। সামান্যতে কাতর হয়ে পড়েছে। আজকের রাজনীতির যে এটা ধারা—যে যখন ক্ষমতায় আসে তখন বিরুদ্ধ পার্টির ওপর অত্যাচার চালায়। যেমন, রাশিয়ায় ম্যালানকভ প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরে স্ট্যালিনের প্রধান কমরেড রাশিয়ার ১০ বৎসরের হোম মিনিস্টার, লোনাভর, রাতারাতি রাষ্ট্রদ্রোহী হয়ে গেলেন এবং তাকে গুলি করে হত্যা করা হলো। আবার আমেরিকায় কম্যুনিস্ট মত পোষণ করে বলে অনেক আমেরিকানকে জেলে পচে মরতে হচ্ছে। এমনকি রোজেনবার্গ দম্পতিকে ইলেকট্রিক শক্ দিয়ে মেরে ফেলা হয়েছে। যাক, তিনি আমাকে অনেক করুণ কাহিনি শোনালেন। আমি ভাবলাম কিছুটা

Scanned with CamScanner

সত্যই হতে পারে। তিনি আরও আমায় বললেন, দেখেন যারা নয়াচীনে যায় যাবার সময় একরকম থাকে আর ফিরে আসার সময় আর এক রকম হয়ে যায়। আমি বললাম, বুঝাইয়া বলুন। তিনি বললেন, ওখান থেকে ফিরে যখন আসে তখন নয়াচীন সরকার ও জনসাধারণের খুব প্রশংসা করে। আবার বললো, এর কারণ জানেন? ওখানে গেলে সুন্দর সুন্দর মেয়ে আপনাদের কাছে আসবে, আপনাদের সকল সময় মুগ্ধ করে রাখবে। কিছু দেখতে দেবে না এবং আদর করবে এত বেশি যে আপনারা দুনিয়া ভুলে যাবেন।

আমি ভাবলাম, লোকটা অন্ধ। আমরা রাজনীতি করি, আমাদের লোভ মোহ দিয়া ভোলানো সোজা না। তাহলে পূর্ব বাংলার মুসলিম লীগওয়ালারা তা পারতো। মনে মনে ভাবলাম, 'জেলে দিয়া, মিথ্যা মামলার আসামি বানিয়ে, ইউনিভার্সিটি থেকে বহিষ্কৃত করে নানা প্রকার অত্যাচার করেও আমাদের মতের পরিবর্তন করা যায় নাই'। দেখা যায়, হংকং-এ থেকে কম্যুনিস্ট বিরোধী হওয়াটা স্বাভাবিক। কারণ, চীনের অনেক বড় বড় লোক কম্যুনিস্ট জুজুর ভয়ে হংকং-এ আশ্রয় নিয়েছে। তবে আস্তে আস্তে তাদের অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ছে। অনেকে আবার হুজুগে এসে বিপদে পড়েছে। এইভাবে, বহুলোক হংকংয়ে সামান্য জায়গায় এসে আশ্রয় নিয়েছে। যা হোক, ফেরার পথেও দুইদিন হংকংয়ে ছিলাম, তাই হংকং পর্ব শেষ করে নয়াচীনে ঢুকবো।

হংকং ইংরেজ কলোনি, ইংরেজই শাসন চালায়, তবে হংকংয়ের বাসিন্দাদেরও প্রতিনিধি থাকে। একদিকে বিরাট বিরাট দালানকোঠা আর ব্যবসাবাণিজ্য, আর একদিকে লক্ষ লক্ষ গরিব রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা করছে। সকলের চেয়ে বড় আয় নারী ব্যবসায়। তাই দিয়েই বহুলোক সংসার চালায়।

দুনিয়ার অন্যতম সুন্দর ও শ্রেষ্ঠ শহর বলে বহু লোক এখানে বেড়াতে আসে। যার কারণে ইংরেজদের ব্যবহার খুব ভালো। মিছামিছি লোককে হয়রানি বা পেরেশান করে না। তাদের ব্যবহার ও গণতন্ত্রের জন্য মানুষ হিসাবে ইংরেজ জাত শ্রেষ্ঠ, যদিও আমার এটা ব্যক্তিগত মত।

আতাউর রহমান সাহেব, মনিকভাই, ইলিয়াস ও আমি রাস্তায় বেড়াতে বেরিয়েছি। হঠাৎ ১৬/১৭ বৎসরের একটা মেয়ে আতাউর রহমান সাহেবের কোটে একটা গোলাপ ফুল লাগাইয়া দিতে অগ্রসর হয়। মেয়েটি কলারে হাতও দিয়াছে, খান সাহেব হঠাৎ যেন চমকাইয়া উঠলেন। পরে ধাক্কা দিয়া ফুল ছুড়ে ফেলে রাগে ঘোঁতঘোঁত করতে করতে এগিয়ে চললেন। মেয়েটা

Scanned with CamScanner

আশ্চর্য হয়ে দূরে দাঁড়িয়ে রইলো। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, আমাদের মতো যুবকদের দিকে নজর না পড়ে আপনার ওপর পড়ার কারণ কী? আতাউর রহমান সাহেব তো রাগে অস্থির, আর মানিকভাই তো তাঁর 'রাজনৈতিক মঞ্চের' মতো ঘুরাইয়া ফিরাইয়া ওনার পিছনে লাগলেন। আমরা খুব হাসাহাসি শুরু করলাম। বেচারা ভদ্রলোক রাগে শোকে দুঃখে কথা বলেই যেতে লাগলেন।

হংকংয়ে ফুল দেওয়াটা হলো 'প্রেম নিবেদন'। ফুলটা গ্রহণ করলেই ওরা মনে করবে আপনি তার সাথে যেতে রাজি হয়েছেন। আপনাকে হাত ধরে সাথে করে ওদের জায়গায় নিয়ে যাবে। বেচারি ভেবেছিল, আমাদের দলের নেতা মোটাসোটা ভালো কাপড় পরা, গম্ভীর প্রকৃতির–টাকা পয়সাও নিশ্চয় যথেষ্ট আছে। ঠিকই ধরেছিল কিন্তু বেচারি জানে না, আমাদের নেতা নীরস ধর্মভীরু মানুষ, 'আল্লাহ আল্লাহ' করেন আর তাঁর একমাত্র সহধর্মিণীকে প্রাণের চেয়ে অধিক ভালোবাসেন। এসবদিকে খেয়াল দেয়ার মতলব ও সময় তাঁর নাই। তবে এই মেয়েদের দোষ দিয়ে লাভ কী? এই সমাজব্যবস্থা। বাঁচবার জন্য এরা সংগ্রাম করছে, ইজ্জত দিয়ে পেটের ভাত জোগাড় করছে। হায়রে মানুষ! রাস্তায় রাস্তায় বহু মেয়েকে এইভাবে হংকং শহরে ঘুরতে দেখা যায়, অধিকাংশ চীন দেশের মোহাজেরান। জুজুর ভয়ে হুজুগে এসে এখন ফিরে যেতেও পারে না, আর কাজ করে যে খাবে সে ব্যবস্থাও নাই। অনেক দুঃখে দিন কাটছে ওদের। দেশের মালিক ইংরেজ, জনগণ না। ইংরেজ জাত, যে যায় তাকে আশ্রয় দেয়, তাই এত যুদ্ধের পরেও জাতটা বেঁচে আছে আর থাকবেও। আমাদের সাথে অনেক ইংরেজের দেখা হলো, আলাপ হলো। যখন শুনলো আমরা পাকিস্তানি, ব্রিটিশ কমনওয়েলথের একটা দেশ, খুব খাতির করতে লাগলো। ভালো ব্যবহারও করলো এবং অনেক বিষয়ে আলাপ করলো। চীন দেশে যাবো শুনে আমেরিকানদের মতো আঁতকে উঠল না। একজন বললো, বহুদিন পরে চীন দেশে একটা সত্যিকারের সরকার কায়েম হয়েছে। এখন চীন দেশে আইন-শৃঙ্খলা ফিরে এসেছে।

হংকংয়ে না পাওয়া যায় এমন কোনো জিনিস নাই। মালপত্র খুব সস্তা। সেখানে জিনিসের দামের ওপর ট্যাক্স না বসানোর জন্য জিনিসপত্র খুবই সস্তায় পাওয়া যায়–বিশেষ করে কাপড়, ঘড়ি, পেন এবং নানাবিধ 'কনজুমার্স গুড'স। পাকিস্তানি টাকার ছয় টাকায় যে হাওয়াই শার্ট পাওয়া যায় তার দাম

Scanned with CamScanner

আমাদের দেশে ৩০ টাকা। যে গরম জ্যাকেট আমি এনেছিলাম পাকিস্তানি টাকার মূল্যে ২৪ টাকায় তার দাম আমাদের দেশে কমপক্ষে ১০০ টাকা। যে স্যুট আমি ও আতাউর রহমান সাহেব ও অন্যরা ৬০ টাকায় বানাইয়া আনি, তার দাম কমপক্ষে আমাদের দেশে ২০০ টাকা। অন্য জিনিসের দাম আপনারা চিন্তা করে দেখতে পারেন এই পরিমাণে কম হবে। ঘড়ি ও পেনের দাম আমাদের দেশে হংকংয়ের থেকে ডাবল হবে। তবে, সেখানে খাদ্যের দাম প্রায় আমাদের দেশের মতোই। খাবার বিদেশ থেকে আনতে হয়। কারণ হংকং চীন দেশের মেইনল্যান্ডের পাশে ক্ষুদ্র একটা দ্বীপময় স্থান। যথেষ্ট খাবার হতে পারে না, কেননা লোক সংখ্যা খুবই বেশি। চোর ডাকাত খুব বেশি নাই। ইংরেজ সেটা দমন করেছে, তবে ৪২০-এর আমদানি কিছুটা বেশি। নতুন মানুষ দেখলে কিছুটা চেষ্টা করে বই কি! তবে আমাদের ওপর চালাতে পারে নাই। কারণ আমরা হুঁশিয়ার ছিলাম।

রাত প্রায় ৯টায় আমরা হোটেলে ফিরে এলাম। আমি ও ইলিয়াস এক রুমে ছিলাম। খাওয়া-দাওয়ার পরে খুব আরামে ঘুম হলো, কারণ ক্লান্ত ছিলাম।

সকালে উঠে আমরা গোসল করে প্রস্তুত হলাম, কারণ নয়াচীনে রওয়ানা করবো। আমাদের সকালেই খবর দিয়ে যাওয়া হলো। শান্তি কমিটির স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী আমাদের সকল কিছু দেখাশুনা করতে লাগলো। সকাল ৯টায় আমরা কোলন রেল স্টেশনে উপস্থিত হলাম। আমাদের মালপত্র পূর্বেই স্টেশনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। যেয়ে দেখি মালপত্র ট্রেনের কামরায় উঠে যাচ্ছে। ট্রেনগুলির কামরা আমাদের দেশের কামরার মতো না। দুইটা করে সিট, একটা বেঞ্চ (Bench)—গদি দেওয়া, আমরা উঠে পড়লাম। কিছু সময় পরে ট্রেন ছেড়ে দিলো।

নয়াচীন ও হংকংয়ের সীমানায় এলাম। ছোট একটা খাল দ্বারা ভাগ হয়েছে। আমরা ইংরেজের জায়গায় নামলাম। ছোট স্টেশন, অনেক বই পাওয়া যায়। আমাদের পাসপোর্ট পরীক্ষা করা হলো। ভিসা এনে দেওয়া হলো। আমাদের জন্য দোভাষী ঠিক করাই ছিল, যথাসময়ে এসে হাজির। আমাদের শরবত খাওয়ালো। আমাদের মালপত্রের জন্য চিন্তা নাই, চীনের শান্তি সেনারা (শান্তি কমিটির স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী) তার দেখভাল করেছে। পরীক্ষা করে ইংরেজ সীমানা থেকে চীন সীমানার পূর্বে নিয়ে গিয়েছে। সব মিলে এসে প্রায় দু'ঘন্টা লাগলো।

Scanned with CamScanner

আমরা ঘুরে ঘুরে দেখতে আরম্ভ করলাম। কিছুক্ষণ পরে দোভাষী এসে আমাদের জানালো, এবার আপনারা রওয়ানা করুন। গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। সকলই ঠিক হয়ে গেছে। একটা পুল পার হয়ে নয়াচীনে ঢুকতে হবে। পুলটার অর্ধেক হংকংয়ের, অর্ধেক নয়াচীনের দু'পাশেই বন্দুকধারী প্রহরী পাহারা দিচ্ছে। আমরা আবার ট্রেনে চেপে বসলাম। ট্রেন ছেড়ে দিলো। আমরা ক্যান্টন শহরে যাচ্ছি। এই শহরটা খুবই সুন্দর, অন্যতম শ্রেষ্ঠ শহর। ১৯৪৯ সালের শেষের দিকে লাল চীন সৈন্যবাহিনী এই শহর দখল করে এবং চিয়াং কাইশেক ফরমোজা দ্বীপে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়।

আমরা ট্রেনে কিছু খেয়ে নিলাম। ফলের জোগাড় যথেষ্ট তারা করেছে। এই সময়ে মানিক ভাইয়ের কথা সামান্য লেখা দরকার। 'মানিক ভাই ভালো লেখতে পারেন, কিন্তু এত যে খেতে পারেন তা আগে জানতাম না। সমানে খেতে শুরু করলেন, মনে হলো প্রায় ২/৩ ঘন্টা খেয়েই চললেন। জিজ্ঞসা করলাম, মানিক ভাই পেটে হলো কী? বললেন, দুর্ভিক্ষ হয়েছে'। মানিক ভাই দোভাষীকে নিয়ে বসলেন। প্রশ্নের পর প্রশ্ন, আর খাওয়ার পরে খাওয়া চললো। মানিক ভাইয়ের স্মরণশক্তি অস্বাভাবিক, নোট করতে হয় না। কেমন করে সব কিছু মনে রাখেন বুঝতে পারি না। যা হোক, আমিও একটি মাস্টারকে নিয়ে পড়লাম। ভদ্রলোক ইংরেজি জানেন না, দোভাষী তার কথা আমাকে বুঝাইয়া দেয়, আমার কথা তাঁকে। আলোচনাটা পরে উল্লেখ করবো।

রেলগাড়ির কথা বলি। কম্যুনিস্ট দেশ বলে সকল সমান হয়ে যায় নাই। ট্রেনে দু'রকম ক্লাস আছে, 'নরম ক্লাস আর শক্ত ক্লাস'। ভাড়ায়ও ব্যবধান আছে। প্রায় দু'গুণ। একটায় গদি আছে আর একটায় গদি নাই। হেলান দিয়ে দু'জন করে বসতে পারে বেঞ্চিতে। রাতে ঘুমাবার বন্দোবস্ত আলাদা রুমে হয়। সেখানেও দিনে থাকা যায়। নরম ও শক্ত ছাড়া সুবিধা প্রায় সমান। প্রত্যেক গাড়িতে লাউড স্পিকার ঠিক করা আছে, পথে পথে গান চলে। সাবধান হয়ে বসবার জন্য এবং ময়লা বা নোংরা না করবার অনুরোধ করে। বড় বড় নেতাদের রেকর্ড করা বক্তৃতা শোনানো হয়। কোনো খবর থাকলে বলা হয়। আর স্টেশনের নিকটে আসলে ১৫ মিনিট পূর্বেই বলে দেওয়া হয়, সামনে অমুক স্টেশন। যাত্রীদের তাতে খুবই সুবিধা হয়। চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করে বেড়াতে হয় না। অনেক সময় ঘুমাইয়া থাকার জন্যে অথবা নতুন মানুষকে জানতে না পেরে স্টেশন পার হয়ে চলে যেতে

Scanned with CamScanner

হয় না। এমনি প্রত্যেক স্টেশনে বলে দেওয়া হয়। মাঝে মাঝে এসে কামরাগুলি পরিষ্কার করে দিয়ে যায়। কোনো ময়লা পড়ে থাকলে মুছে নিয়ে যায়। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে খুবই খেয়াল। গাড়িতে খাবার ঘরও আছে। যাদের খাওয়ার দরকার খেয়ে নেয়। টিকিট চেকার সাহেব মাঝে মাঝে ঘুরে যান। তবে যতদূর জানলাম বিনা টিকিটে কেহ ভ্রমণ করে না। একজন টিকিট চেকার সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলাম, আমার দোভাষীর মাধ্যমে —আপনি টিকিট ছাড়া লোক কতদিন দেখেন নাই? সে বললো, প্রায় দেড় বৎসর। তবে যদি গাড়ি ছাড়বার সময় তাড়াতাড়ি উঠতে হয়, তবে পরের স্টেশনে আমাকে খবর দেয় আমি টিকিট দিয়ে আসি। আজকাল আর আমাদের টিকিট চেক করতে হয় না, কারণ কেহই বিনা টিকিটে গাড়িতে উঠে না। আর ফাঁকি দিতেও চেষ্টা করে না। তারা মনে করে এ পয়সা তাদের নিজেদের, রাষ্ট্র তাদের, গাড়ি তাদের, নিজেকে ফাঁকি দিয়া লাভ কী? তবুও সে বললো অন্যান্য লাইনে ২/১টা ঘটনা এখনও আছে, তবে ধরা পড়লে যাত্রীর দলই তাকে এমন শায়েস্তা করে, জীবনেও ভুলবে না। আর সরকারও ভীষণ শাস্তি দেয়।

তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি চিয়াং কাইশেকের সময় চাকরি করতেন? উত্তর, হ্যাঁ। তবে এরা আপনাকে রাখলো কেন? তিনি বললেন, আমরা অনেকেই আছি বিশেষ করে যারা ঘুষ খেতাম না। ঘুষ যারা খেতো তারা অনেকে পালিয়ে গেছে। আমাদের পূর্বেই ইউনিয়ন ছিল। আমি ইউনিয়নের সদস্য ছিলাম গোপনে। আমরা ইউনিয়নের সদস্য হয়েছি একথা জানলে চিয়াং কাইশেকের দল আমাকে তাড়াইয়া দিতো, না হয় জেলে দিতো।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনি কি মনে করেন, চোরের দল পালাইয়া গেছে আর যারা সাধু বলে পরিচিত তারা আছে?" তিনি উত্তর করলেন, "এ কথা আপনি বলতে পারেন। তবে যারা সত্যবাদী, ঘুষ খায় না, দেশকে ভালোবাসে ও কর্মঠ তারা আছে।" আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "বেতন কত পান?" উত্তর দিলেন, "বেশ পাই, চলে যায়। চিয়াং কাইশেক আমলের চেয়ে বেশি পাই। থাকবার জায়গা পাই অনেক সুবিধা আছে। তবে তাড়াতাড়ি তো কিছু হয় না, সময় দরকার।" আমি আর বাড়াবাড়ি করলাম না। কারণ বেচারাও আমার সাথে আর আলাপ করতে চান না—ভাবেসাবে বুঝলাম। আমি তাড়াতাড়ি বললাম, বোধ হয় আপনার কাজ আছে, আচ্ছা ধন্যবাদ। তিনি

Scanned with CamScanner

চলে গেলেন আমাকেও একটা ধন্যবাদ দিয়ে। দোভাষীকে বললাম, চলুন আমাদের কামরায়। যেয়ে দেখি কেহ কেহ ঘুমাচ্ছে। কেহ কেহ আলাপ করছে। ইলিয়াস এদিক ওদিক ছোটাছুটি করছে, এ কথা জিজ্ঞাসা করছে, ওটা জিজ্ঞাসা করছে। ওর জানবার আকাঙ্ক্ষা দেখে মনে হলো বোধ হয় এই মুহূর্তেই নয়াচীনের সকল বিষয় জেনে নিতে চায়।

আমি বাহিরের দিকে চেয়ে দেশটাকে ভালো করে দেখতে লাগলাম মনে হলো এ তো আমার পূর্ব বাংলার মতো সকল কিছু। সবুজ ধানের ক্ষেত, চারদিকে বড় বড় গাছ। মাঝে মাঝে মাটির ঘরের গ্রাম, ছোট ছোট নদী, ট্রেনটা পার হয়ে যাচ্ছে। অনেকে আবার কোদাল দিয়া জমি ঠিক করছে। বেশ লাগছে দেশটা। পরে চা খেলাম, দুই রকমের চা হাজির করলো। একরকম চা আমরা খেয়ে থাকি, দুধ চিনি দেয়া। আর এক রকম যাহা চীনের লোকরা খেয়ে থাকে, দুধ চিনি ছাড়া শুধু পাতার চা। সাথে কিছুটা হলদে হলদে কাঁচা পাতা দিয়ে করা, খেতে বেশ লাগলো। খুব উপকারী শুনলাম। আমি ওদের দেশের যে চা খেলাম তার নাম 'চিং চা'।

সন্ধ্যায় আমরা ক্যান্টন পৌছালাম। ট্রেন যখন থামলো তখন প্ল্যাটফরম ভর্তি মানুষ। বহু ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা লাইন করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। হাতে ফুলের তোড়া, স্লোগান দিচ্ছে। বুঝতে পারলাম না কী বলছে। দোভাষীও দূরে রয়েছে। শুধু শুনলাম তিন কি চারটা কথা সকলে বলছে। আমাদের অভ্যর্থনা করলো ক্যান্টন শান্তি কমিটির সভ্যবৃন্দ। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ছুটে এলো আমাদের পাশে, একজন একজনের হাত ধরলো আর তার ফুলের তোড়াটা আমাদের হাতে দিলো।

আমাদের হাত ধরে নিয়ে চললো। কোনো সংকোচ নাই, আমরা যেন তাদের কত আপন, কতকালের পরিচয়। চোখে-মুখে আনন্দ ধরে না। আমরাও ওদের স্নেহ করতে লাগলাম, কিন্তু দুঃখ, ওদের ভাষা আমরা বুঝি না। ওরা আমার ভাষা বোঝে না। শুধু গায়ে হাত দিয়ে বাচ্চাদের আদর করতে লাগলাম। সমস্ত বাচ্চা সুন্দর, চেহারার ভিতর পরিবর্তন, কত আশা তাদের মনে। ছেলেমেয়ে সকলের একই রকমের প্যান্ট ও শার্ট পরা, গলায় লাল রুমাল। পায়ে হাফ স্টকিং, সাদা জুতা। আমাদের সাথে সাথে গাড়ি পর্যন্ত এলো, গাড়িতে তুলে দিয়ে তারা সরে দাঁড়াল; বোধ হয়, জায়গা কম তাই তারা এলো না। আর একটা বাস বোঝাই করে আমাদের সাথে সাথে

Scanned with CamScanner

হোটেলে এলো। রাত তখন প্রায় ৮টা। সেখানেও আমাদের অভ্যর্থনা করলো। শুধু স্লোগান আর স্লোগান, আমরা হোটেলে রুম পেলাম। যার যার রুমে মালপত্র কখন এসে গেছে জানি না। রুমে যেয়ে দেখি আমার পুরান সুটকেসটা ঠিকই আছে। বিছানাটাও করা রয়েছে। চট করে হাত মুখ ধুয়ে দোভাষীকে ডেকে পাঠালাম। দোভাষী এলো, তার কাছে জিজ্ঞাসা করলাম, স্লোগানগুলি কী?

সে বললো, "দুনিয়ায় শান্তি কায়েম হউক, মাও সে তুং–জিন্দাবাদ, নয়াচীন –জিন্দাবাদ।"

এ কয়টা কথা শিখে নিলাম, চীনাভাষায় আমি বলতে পারতাম। ভাবলাম, বহু জায়গায় যেতে হবে। আমাদের যখন ওরা অভ্যর্থনা করবে আমিও ওদের কথার উত্তর ওদের ভাষায় দিবো, যদিও এই কথা কয়টাই আমার চীনা ভাষার পাণ্ডিত্য। কিছু সময় পরে ক্যান্টন শান্তি কমিটির পক্ষ থেকে আমাদের খাওয়ার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। আমাদের ডেকে নিয়ে যাওয়া হলো, পীর মানকী শরীফ, জনাব আতাউর রহমান ও আরও কয়েকজন এক টেবিলে বসলেন। তাঁদের সাথে প্রাদেশিক ক্যান্টন শান্তি কমিটির সভাপতিও বসলেন। তিনি ক্যান্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর। তিনি প্রথমেই বক্তৃতা করতে উঠলেন, দুনিয়ায় শান্তি কায়েম হোক, পাকিস্তান বেঁচে থাকুক, আমাদের বন্ধুত্ব অটুট হোক, পাকিস্তান ও চীন শান্তিপূর্ণভাবে পাশাপাশি বাস করুক, যুদ্ধের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াক। আমরা শান্তি সম্মেলনে আছি, অনেক কষ্ট হবে, দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করবেন। আমাদের স্বাধীনতা কিছুদিন হলো পেয়েছি। আপনাদের ভালোভাবে যত্ন করতে পারলাম না। অনেক কিছু বললেন, আমি অল্প কথায় শেষ করলাম। তিনি চীনা ভাষায় বক্তৃতা করলেন। দোভাষী আবার ইংরেজিতে বলে দিলেন। পীর সাহেবকে উর্দুতে একজন বুঝাইয়া দিলেন। পীর মানকী শরীফ আমাদের পক্ষ থেকে উত্তর দিতে উঠলেন। অল্প কথার মধ্যে ভালোই বললেন। তাদের আতিথেয়তার জন্য অশেষ ধন্যবাদ জানালেন।

আমাদের খাওয়া চললো। চীনদেশের ডিনার। আমরা মুসলমান বলে আমাদের যে যে জিনিস খেতে নিষেধ আছে তাহা বাদ দিয়ে করা হয়েছে; মুরগি, ডিম, তরিতরকারি, চিংড়ি মাছ ও অন্যান্য মাছও ছিল। আমাদের যা যা ভালো লাগলো খেলাম। তারপর অনেক গল্প চললো। তারাও আমাদের দেশের খবর জানতে চায় আর আমরাও তাদের খবর জানতে গিয়েছি।

Scanned with CamScanner

একটা কথা এখানে বলে নেওয়া ভালো। আমরা হংকং থাকতে সভা করে ঠিক করে নিয়েছিলাম, আমাদের দেশের ভিতরের খবর কেহ সভায় বলবো না এবং আলোচনা করবো না। আমাদের দেশের মুসলিম লীগের শাসনের কথা যদি বলি তবে দুনিয়া হাসবে। কারণ, মুসলিম লীগের গণতন্ত্রের যে রূপ তা কোনো সভ্য সমাজে না বললেই ভালো হয়। কারণ, তাতে পাকিস্তানের ইজ্জত যাবে।

ক্যান্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র আমার টেবিলে বসেছিল। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, লাল চীন বাহিনী যখন ক্যান্টন অধিকার করে তখন অবস্থা কী ছিল, বিশেষ করে জনসাধারণের মনোভাব কী ছিল? শহরের বা শিল্পের কোনো ক্ষতি করে গিয়েছে কি না? বিশেষ করে যখন চিয়াং কাইশেক সৈন্য লইয়া পশ্চাদপসরণ করেন? ছাত্রটি ইংরেজি জানে। সে বললো, চিয়াং কাইশেকের সৈন্যবাহিনী কোনো জিনিসই নষ্ট করে যায় নাই। অনেক বড়লোক এবং বড় কর্মচারী, তাহার সাথে পালাইয়া গিয়াছে। যে যাহা পারে নিয়া গিয়াছে, আর অন্য সকল জিনিসপত্র রেখে গিয়াছে। নয়াচীনের সৈন্যবাহিনী যখন শহরে এলো, আমরা ৫/৭ দিন ভয়েতে দরজা খুলি নাই। ভাবতাম বুঝি অত্যাচার করবে, কারণ অনেক অত্যাচারের কাহিনি আমরা শুনেছি। কিন্তু দেখলাম এরা এসেই ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার করতে শুরু করলো। একদল চিৎকার করে বলতে বলতে গেল, 'তোমরা নির্ভয়ে কাজ কর্ম করো, দোকান খোলো, ব্যবসাবাণিজ্য চালাও। ঘরের বাহির হও। কোনো ভয় নাই। আমরা তোমাদের ভাই, তোমাদের সেবাই আমাদের কাজ।' আস্তে আস্তে দোকান খোলা শুরু হলে, লোক রাস্তায় বেরুতে লাগলো। অনেকে সৈন্যবাহিনীদের খাবার সাহায্য করতে চাইলো। তারা গ্রহণ করলো না, যারাই বাহির হয় তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করতে শুরু করে। এসব দেখে ছয় দিন পরে আমরা দরজা খুললাম—ছেলেটা আমাকে বললো।

ছাত্রটি আরও বললো, 'আমি আস্তে আস্তে ওদের কাছে গেলাম, ওরা খুব ভালো ব্যবহার করলে আমার মনে সাহসের সঞ্চার হলো। আমরা কয়েকজন ছাত্র এক জায়গায় হলাম। দেখলাম কম্যুনিস্ট পার্টির কর্মীরা বাড়ি বাড়ি খোঁজ নিচ্ছে কী দরকার, কোনো অসুবিধা আছে কি না? কী সাহায্য করতে পারি? এ সৈন্য জনগণের সৈন্য। এরা জনগণের অংশ। ৭/৮ দিন পরে পূর্ণ নাগরিক জীবন ফিরে এলো। শহরে শান্তি রক্ষা ও অন্যান্য কাজের জন্য একটা নাগরিক কমিটি গঠন করে দিলো। যদিও তাহার মধ্যে প্রায় সকলেই কম্যুনিস্ট অথবা কম্যুনিস্ট

Scanned with CamScanner

ভাবাপন্ন ও কয়েকজন শিক্ষক এবং সম্মানি লোক। এদের অনেকের ওপরই জনসাধারণের শ্রদ্ধা ছিল। এদের কাজকর্ম, ব্যবহার দেখে আমিও এদের দিকে ঝুঁকে পড়লাম। ওরা সমস্ত লোকদের ডাক দিলো, এসো, আমরা শহর পরিষ্কার ও অন্যান্য সমাজসেবার কাজ করি। কত বেকার, কত দুঃখী, তাহার হিসাব নেওয়া শুরু করলো, নানা প্রকার গঠনমূলক কাজ আরম্ভ করলো, লোকের মনে শান্তির ছায়া ফিরে এলো। সকলেই তাদের ডাকে সাড়া দিলো। কেহ ভালোবেসে, আবার কেহ ভয়ে ভয়ে'।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কোনো লোককেই কি গ্রেপ্তার করা হলো না? সে বললো, যারা চিয়াং কাইশেকের দলে অথবা তাহাকে খুব সমর্থন করতো তারা পালাইয়া গিয়াছে। আর যদি কেহ কোনো লোকের বিরুদ্ধে প্রমাণ করতে পারে যে সে চিয়াং-এর আমলে অত্যাচার করেছে, ব্লাক মার্কেটিং করেছে এবং খারাপ কাজ করেছে তাকে গ্রেফতার করা হতো। আমার মনে হলো ছেলেটা একটু চেপে গেল, কারণ কিছু লোককে তো নিশ্চয়ই গ্রেফতার করা হয়েছে— যারা সরতে পারে নাই আর ভাবছে তাদের কাজকর্ম নয়াচীন সরকার জানতে পারে নাই।

আমরা রাত প্রায় ১০টায় রুমে ফিরে এলাম এবং যার যার বিছানায় শুয়ে পড়লাম। সকাল পর্যন্ত খুব আরামে ঘুমালাম। উঠে হাত মুখ ধুয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে কাপড় পরলাম। কারণ আমাদের রওয়ানা হতে হবে পিকিংয়ে, যেখানে আমাদের শান্তি সম্মেলন হবে। নয়াচীনের রাজধানী পিকিং শহরে ক্যান্টন থেকে যেতে রেলগাড়িতে দুই দিন দুই রাত লাগে। তাড়াতাড়ি পৌছতে হবে বলে আমাদের জন্য অ্যারোপ্লেনের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। সকাল ৯টায় অ্যারোপ্লেন ছাড়বে।

আমরা যে হোটেলে ছিলাম তা নদীর পাড়ে চারতলা একটি দালান, লিফটের বন্দোবস্ত ছিল। হোটেলের দুই পাশ দিয়ে নদী। বড় বড় নৌকা নদীর পাড়ে থেমে আছে। এরা আমাদের দেশের মতো মালপত্র আনা-নেওয়া করে। ৮টার সময় আমরা চা-নাস্তা খেলাম, তারপর সকলে মোটরে উঠে অ্যারোড্রাম-এ পৌছলাম। আমাদের জন্য ছোট দুইটা প্লেন জোগাড় করে রাখা ছিল। আমরা ভাগ ভাগ হয়ে উঠে পড়লাম। যাবার সময় আবার আমাদের তারা প্রাণভরে বিদায় সম্ভাষণ জানালো।

Scanned with CamScanner

প্লেনগুলি ছোট হলেও বেশ আরামদায়ক। ২১ জনের বসবার ব্যবস্থা আছে। আমাদের খাওয়ার বন্দোবস্ত প্লেনের মধ্যেই ছিল। আমরা মাঝে মাঝে চা ও শরবত খেতে খেতে বেলা ৫টার সময় পিকিং অ্যারোড্রামে পৌঁছলাম। সেখানেও আমাদের অভ্যর্থনা করা হলো, বাচ্চা বাচ্চা ছোট ছেলেমেয়েরা আমাদের ফুলের তোড়া উপহার দিলো। পশ্চিম পাকিস্তানের জনাব মাজাহার —লাহোরের দৈনিক পাকিস্তান টাইমস কাগজের সম্পাদক, পূর্বেই পিকিং পৌঁছেছিলেন। তিনিও আমাদের অভ্যর্থনা করার জন্য উপস্থিত ছিলেন। তাঁকে দেখে আমরা খুব আনন্দিত হলাম। পূর্ব পাকিস্তান থেকে যারা আমরা গিয়াছি তার মধ্যে আমার সাথেই তাঁর পরিচয় ছিল।

আমাদের অ্যারোড্রামেই চা খাওয়ান হলো। তারপর গাড়িতে চড়ে আমরা পিকিং শহরে চললাম। দুনিয়ার নামকরা এই শহর। বহু ঝড় গিয়াছে এর ওপর দিয়ে। বহু রাজার রাজধানী ছিল এই শহর। বহু বিদেশি এই শহরটি অনেকবার অধিকার করেছে। শেষবারের মতো জাপানিরা এই শহরটা অধিকার করে—যখন চীন-জাপান যুদ্ধ হয়। তারপর চিয়াং কাইশেকের হাতে ছিল। শেষে, নয়াচীন সরকার মাও সেতুং-এর নেতৃত্বে এই শহরটা অধিকার করে রাজধানী কায়েম করে। দেখবার আকাঙ্ক্ষা বেড়ে চললো, মনে হলো কখন পৌঁছব, আর তো দেরি সয় না! সন্ধ্যা হবে হবে এমন সময় আমরা পৌঁছলাম। আমাদের জন্য কামরা ঠিকই ছিল। পিকিং শহরের শ্রেষ্ঠ হোটেল —যার নাম 'পিকিং হোটেল' সেখানে আমাদের রাখা হলো। ভারত থেকে যারা যোগদান করতে গিয়াছেন তারাও ঐ হোটেলে আছেন। হোটেলটা পাঁচতালা, খাবার ব্যবস্থা উপর তলায় বন্দোবস্ত। আরও অনেক দেশের ডেলিগেটরা এই হোটেলে ছিলেন। পীর মানকী শরীফকে এক রুম দেওয়া হয়েছে। আর প্রায় সকলেই দুইজন করে এক রুমে। আমরা ইচ্ছা করেই তিনজন এক রুম নিলাম। আতাউর রহমান সাহেব, মানিক ভাই ও আমি। আমাদের কামরায় আমাদের মালপত্র হাজির। যার যার বিছানায় বসলাম।

রাত্রে আমাদের পাকিস্তান ডেলিগেটদের সভা হবে, খাবার পরেই। পীর সাহেব বলে দিয়াছেন মুসলমানের পাক খাবেন, তাই আমাদের জন্য এক মুসলমান হোটেলে খাওয়ার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। রাত্রে সেখানে আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো। যাওয়ার সাথে সাথে আমাদের, 'আস্‌সালামু আলাইকুম' বলে অভ্যর্থনা করলো। আমরা 'ওয়া লাইকুম আস্‌ সালাম' বলে উত্তর

Scanned with CamScanner

দিলাম। তাদের সাথে গল্প শুরু করলাম, 'মনে রাখবেন দোভাষী আমাদের সাথে আছে, না থাকলে আমরা বোবা'।

আমাদের টেবিলে সাংহাই-এর দৈনিক ইংরেজি খবরের কাগজের সম্পাদক বসলেন। তিনি আমাদের কথা ওদের বুঝায়ে দেন আবার ওরা যা বলে তাহা আমাদের বুঝায়ে দেন—এক কথায় তারা বললো, আমরা খুব ভালো আছি। এখন আর অত্যাচার হয় না। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামাও হয় না। পরে আলোচনা করা যাবে। খাবার যখন আমাদের সামনে হাজির করা হলো তখন আমাদের অবস্থা কাহিল। কী করে এগুলি খাবো! পাক প্রায় সকল সম্প্রদায়ই নিজেদের মতো করে। কেহ গরু খায়, আর কেহ শুয়োর খায়। আমাদের জন্য গরুর গোস্তের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। কিন্তু খেতে পারলাম না। যা খেলাম তার জন্য সারারাত পেটে তেল লাগাতে হলো। মাঝে মাঝে পেটের ভিতর গুড়ুম গুড়ুম শব্দ শুরু করতে আরম্ভ করলো, আর চাপা চাপা বেদনা শুরু হলো। যাহোক, ফিরে এসে টেবিলের উপর দেখি কিছু ফল আর সিগারেট। ফল ও সিগারেট খেয়ে শুয়ে পড়লাম। অনেক কষ্টে রাত কাটলো। আমাদের কনফারেন্স পরের দিন থেকে শুরু হবে।

সকালে রুমেই নাস্তা করলাম। ডিম মাখন রুটি চা, ফলফলাদি। দুপুরে আবার সেই হোটেলে নিয়ে যাওয়া হলো। আবার সেই দশা। খোঁজ নিয়ে জানলাম আমরা যে হোটেলে থাকি তার উপরেই ভারতীয়দের জন্য খাবার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। অন্যান্য দেশের লোকও সেখানে খায়। উপরে ইউরোপিয়ান খাবার দেওয়া হয়। যার জন্য যা বলা হয় তাই পাক করে দেয়। এর মধ্যে ভারতীয় প্রতিনিধিদের অনেকের সাথে আমাদের আলাপ হলো; বিশেষ করে বিশিষ্ট লেখক মনোজ বসুর সাথে। লেখক মানুষ, ব্যবহার অতি চমৎকার। কথায় কথায় 'ভাই' 'দাদা' বলে সম্বোধন করে, পরে আমার সাথে খুব ভালোবাসা হয়ে গেল। দূর দেশে বাঙালি, আবার লেখক, গুণী মানুষ, তাঁর কাছে বাংলা ভাষার মতো ভাষা দুনিয়ায় আর নাই। তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা করলাম, "দাদা, আপনারা কোথায় ভাত খান?" তিনি বললেন, "কেন, উপরে, চিংড়ি মাছ পাকাইয়া দেয়, ডিম, মুরগির মাংস, সমুদ্রের মাছ, ডাল যা বলবেন সব দেয়।" মানিক ভাই পূর্বেই বলে দিয়াছেন, আমি আর ও হোটেলে খেতে যাবো না, উপরে খাবো। আস্তে আস্তে আমরা সকলেই পীর সাহেবের কাছ থেকে কেটে পড়লাম। পরে দেখা গেল পীর সাহেব ছাড়া আমরা সকলেই উপরে খাওয়া আরম্ভ করলাম। উপরে ভারতীয় ও পাকিস্তানি পাক

Scanned with CamScanner

শুরু হয়ে গেল। ফলের অভাব নাই, যথেষ্ট জোগাড় আমাদের জন্য চীন শান্তি কমিটি করেছে।

মানিক ভাইয়ের কথা কিছু না বললে অন্যায় হবে। মানিক ভাই যে এত খেতে পারেন সে ধারণা আগে আমার কোনো দিন ছিল না হয়তো কোনোদিন একটা মুরগিই খেয়ে ফেলে, সাথে সাথে ডিম, মাছ, ফলফলারি, বসে বসে শুধু খায় আর খায়। মানিক ভাই বলেন, "বেশি কথার কাম নাই। খাবার সময় গোলমাল করো না। চুপচাপ খাও, সময় পাওয়া গেছে। দেশে লীগ আমলে কী খেতে পাই মনে নাই।" রুমে ফিরে এসে আমি, আতাউর রহমান সাহেব ও মানিক ভাই খুব হাসাহাসি করতাম, মানিক ভাইয়ের খাওয়া নিয়া। আমি আর আতাউর রহমান সাহেব মানিক ভাইয়ের পিছনে লেগেই থাকতাম।

শান্তি সম্মেলন শুরু হলো। প্রথমেই অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি ম্যাডাম -সেন তাঁর বক্তৃতা পড়ে শোনালেন। নয়াচীনের পিতা সান ইয়াৎ-সেনের নাম আপনারা জানেন, যিনি দেশকে পরাধীনতার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সারাজীবন সংগ্রাম করেন। বিদেশিদের দেশ থেকে তাড়াইয়া দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু গড়ে যেতে পারেন নাই। তার পূর্বে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। ম্যাডাম সান ইয়াৎ-সেন তাঁরই স্ত্রী।

চিয়াং কাইশেকের নাম আপনারা সকলে জানেন—যিনি সান ইয়াৎ-সেনের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। এবং দুই নেতা দুই বোনকে বিয়ে করেছিলেন। ম্যাডাম সান ইয়াৎ-সেন, চিয়াং কাইশেকের স্ত্রীর বড় বোন। দুঃখের বিষয় দেশের সাথে স্বামী-স্ত্রী বেইমানি করেছিল বলে আর দেশে যেতে পারে না। জনগণ তাড়িয়ে দিয়েছে, তাই ফরমোজা দ্বীপে আমেরিকান সাহায্য নিয়ে কোনো মতে বেঁচে আছে। মাঝে মাঝে হুঙ্কার ছাড়ে, কিন্তু কেহ গ্রাহ্য করে না। কারণ, সকলেই জানে দেশের থেকে বিতাড়িত আমেরিকার দালাল।

ম্যাডাম আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। তিনি জানালেন, আমরা শান্তি চাই। বহু ঝড়ঝাপটা আমাদের দেশের ওপর দিয়ে গেছে। লক্ষ লক্ষ লোক যুদ্ধে মারা গেছে। সোনার দেশ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। আরও বললেন যে, আপনাদের জন্য বিশেষ কিছু করতে পারি নাই। সেজন্য ক্ষমা করবেন। আরও অনেক কিছু বললেন।

আমি ভাবলাম, এত যত্ন তবু যদি 'কিছু' না হয় তবে আবার কী?

Scanned with CamScanner

জন পর্যবেক্ষক, ২৫ জন আন্তর্জাতিক সংগঠনের প্রতিনিধি ৩৭টা দেশের থেকে সেখানে যাই। কিন্তু এত লোকের থাকার জায়গা হঠাৎ দেওয়া কষ্টকর মনে করে চীন সরকার জনসাধারণকে অনুরোধ করলো যে, বিদেশ থেকে তোমাদের অতিথি আসবে তাদের জন্য একটা চারতলা দালান করতে হবে। সমস্ত লোক ঝাঁপাইয়া পড়লো, ৭০ দিনে বিরাট চারতলা এক দালান করে ফেললো। তা দেখে তো আমাদের চক্ষু চড়ক গাছ! আমরা দেখি সরকারি কাজ কন্ট্রাক্টটার সাহেবরা আস্তে আস্তে করেন। অনেক কিছু কারুকার্য হয়। যত অল্প পয়সায় কাজ হবে ততই তাদের লাভ হবে ইত্যাদি।

আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, জনসাধারণ ঝাঁপাইয়া পড়লো কেন? জানলাম, জনগণ ভাবে এটা তাদের কাজ। তাই তারা যে যতদিন পারে খেটে দেয়, কারো ওপর জোর নাই। আমাদের রাষ্ট্রদূত বললেন যে ৭ দিন তার কোনো চাকর ছিল না। কারণ জাতীয় সরকার ডাক দিয়েছে, দেশের কাজে তাদের সাহায্য করা কর্তব্য। তাই তারা রাষ্ট্রদূতকে বলে চলে গেল। রাষ্ট্রদূতের বেগম সাহেবার নিজেরই পাক করে খেতে হয়েছে।

কনফারেন্সে ম্যাডাম সান ইয়াৎ-সেনের বক্তৃতার পরে চীন শান্তি কমিটির সভাপতি কমরেড কোঃ মোঃ জোঃ লেখা বক্তৃতা পড়লেন। আমাদের 'কানফোন' ছিল। তিনি যদিও চীনা ভাষায় বক্তৃতা করছেন আমরা কিন্তু ইংরেজিতে শুনছি। তাঁহার বক্তৃতার সারাংশ হলো, 'যুদ্ধ চাই না, শান্তি চাই। সাম্রাজ্যবাদীরা যুদ্ধ করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। কোরিয়া, ইন্দোচীন, মালয়, জাপান সকল জায়গায় জাতীয় আন্দোলনকে দমন করার জন্য সৈন্যবাহিনী দিয়ে যা-তা অত্যাচার করছে।

আরও বললেন, যুদ্ধ চাই না, তবে যদি কেহ যুদ্ধ করতে আসে তবে যুদ্ধের সাধ আমরা মিটাইয়া দেওয়ার ক্ষমতা রাখি। চীনের ৬০ কোটি জনসাধারণ আজ শান্তি চায়। আর যে সমস্ত দেশ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করছে তাদের ওপর আমাদের সহানুভূতি আছে। কোরিয়া যুদ্ধ সম্বন্ধেও অনেক কিছু বললেন, জীবাণু যুদ্ধে কীভাবে সাধারণ মানুষ শৃগাল কুকুরের মতো রাস্তাঘাটে অসুস্থ অবস্থায় মরছে তারও করুণ কাহিনি শোনালেন।

তারপর অনেক রিপোর্ট, বক্তৃতা আর বক্তৃতা চললো। চারটা সাব কমিটি প্রস্তাব লেখার কাজে লেগে গেল। আমরা সকলেই ভাগ ভাগ হয়ে সাব কমিটিতে যোগদান করলাম।

Scanned with CamScanner

আলাপ করে জানা গেল যে, প্রায় অর্ধেকের বেশি ডেলিগেট কম্যুনিস্ট নহে। আমাদের স্বতন্ত্র মতবাদ। সেভাবেই প্রস্তাব করা হলো। এক পয়েন্টে আমরা সকলে একমত, শান্তি চাই। ভারত থেকে কংগ্রেস, কম্যুনিস্ট পার্টি, ফরওয়ার্ড ব্লক ও বহুদলের লোক প্রায় ৬০ জন গেছে। আমাদের দলের মধ্যে ২/৪ জন কম্যুনিস্ট থাকলেও ৩০ জনের মধ্যে প্রায় ২৫ জন আমরা কম্যুনিস্ট নই। চীন শান্তি কমিটি নিজেদের ইচ্ছামতো প্রস্তাব পাশ করাতে চেষ্টা করেন নাই, আমরা আলোচনা, ডিবেট করেই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি।

কাশ্মীর প্রস্তাব আমরা উত্থাপন করতে চাইলাম, কারণ ভারত জোর করে কাশ্মীর দখল করে রেখেছে। কাশ্মীর নিয়ে ভারত ও পাকিস্তান যুদ্ধ হলে বিশ্বযুদ্ধ লেগে যেতে পারে। গণভোট হলে কাশ্মীরের জনগণ নিশ্চয় পাকিস্তানে যোগদান করবে। ভারতীয় ডেলিগেটদের মধ্যে একদল কাশ্মীর সম্বন্ধে আলোচনা করতে প্রথমে রাজি হলো না, তারপর অন্যান্য দেশের চাপে পড়ে রাজি হলো। ডা. সাইফুদ্দিন কিচলু যিনি ভারতবর্ষের ডেলিগেটদের নেতা, তিনিও চেষ্টা করলেন। আমরা দু'দেশের ডেলিগেটরা এক জায়গায় হয়ে আলোচনা করে সর্বসম্মতিক্রমে একটা প্রস্তাব নিলাম। তার সারাংশ, কাশ্মীরে গণভোটের দ্বারা ঠিক হবে তারা কোন দেশে যোগদান করবে! কোন বিদেশি সৈন্যবাহিনী সেখানে থাকতে পারবে না। চীনের শান্তি কমিটি প্রস্তাব পাশ করতে খুবই সাহায্য করেছিল। এই প্রস্তাবে দুনিয়ার কাছে প্রমাণ হয়ে গেল ভারত জোর করে কাশ্মীর দখল করে রেখেছে। কারণ পাকিস্তান বারবার গণভোটের দাবি করেছে। ভারত বাহানা করে গণভোট হতে দেয় নাই। এই প্রস্তাবও সভায় পাশ হলো। আমাদের পক্ষ থেকে পীর মানকী শরীফ, আতাউর রহমান খান ও আরও কয়েকজন দস্তখত করলেন। ওদিক থেকে ডা. কিচলু ও অনেকে দস্তখত করলেন। সভায় বেশ ভালো ভাবের সৃষ্টি হলো। কারণ এই নিয়ে খুব আলোচনা চলছিল। এও হতে পারতো, আমরা এক প্রস্তাব ও ভারত আর এক প্রস্তাব হাজির করলে সভায় খুবই হৈ চৈ হতো। যা হোক, দুই দেশের ডেলিগেট একমত হয়ে প্রস্তাব করাতে সকলেই আনন্দের সঙ্গে প্রস্তাবটা গ্রহণ করলো। এইভাবে প্রস্তাবগুলি এক এক করে পাশ হয়ে গেল। যদিও প্রত্যেক প্রস্তাব নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে। কারণ নানা মতের লোক সেখানে গিয়াছে। কেউ কম্যুনিস্ট, কেউ কংগ্রেস, কেউ মুসলিম লীগ, কেউ আওয়ামী লীগ, কেউ সোশ্যালিস্ট। কেউ আবার ডেমোক্রাট, কেউবা ইমপ্যারিয়ালিস্ট।

Scanned with CamScanner

আমাদের দেশ থেকে অনেকেই বক্তৃতা করলো, অনেক দেশের লোক তাদের দেশের অবস্থা সম্বন্ধে জানালো। অনেক করুণ কাহিনিও বললো—কী করে সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের দেশকে শোষণ করছে। তুরস্ক থেকে দুনিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি নাজিম হিকমতও সভায় উপস্থিত হয়েছেন। তিনি প্রথমেই একটা কবিতা শোনালেন, তারপর বক্তৃতা শুরু করলেন। তুরস্কের অবস্থা আমরা যা জানতে পারি, তার চেয়ে অনেক খারাপ। শতকরা ২৫ জন লোক যক্ষ্মা রোগে ভোগে। আরও নানা বিষয়ে জানালেন।

ইরানের থেকে ৩/৪ জন যোগদান করেছিলেন। একজন বক্তৃতায় বললেন যে, সমস্ত ইরানের সম্পত্তির মালিক এক হাজার ফ্যামিলি। আর সকলে দিনমজুর। দেশের অবস্থা ভয়াবহ। সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের দেশকে শোষণ করে শেষ করে দিয়েছে।

এমনিভাবে ইন্দোনেশিয়া, ব্রহ্মদেশ, সিংহল, থাইল্যান্ড, ইন্দোচীন, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ফিলিপাইন, আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলি, কানাডা, জাপান যার যার দেশের অবস্থা জানালেন। এও জানালেন যে, তারা শান্তি চান। বাঁচবার জন্য শান্তি চান। নর্থ কোরিয়ার ডেলিগেটরা জানালো, কীভাবে তাদের ওপর জীবাণু বোমা ছেড়েছে আমেরিকানরা। জাপান বললো, 'লক্ষ লক্ষ জারজ সন্তান পয়দা করেছে আমেরিকানরা। তাদের হাতে আমাদের মা-বোনদের ইজ্জত পর্যন্ত নষ্ট হয়ে গিয়েছে। আজ পর্যন্ত আমেরিকান সৈন্য আমাদের দেশে পড়ে আছে, আমাদের দেশকে রক্ষা করার নামে আমেরিকানদের যাবতীয় খরচ জাপানি জনসাধারণকে বহন করতে হয়। ঘরে বাইরে যাবতীয় কাজে আমেরিকানরা হস্তক্ষেপ করবে। যত সৈন্য জাপানে আছে তাদের প্রত্যেকের জন্য গড়ে পাঁচশত টাকা মাসে আমাদের খরচ করতে হয়। আমরা সাম্রাজ্যবাদীদের হাত থেকে বাঁচতে চাই, তাই শান্তি চাই'। জাপানিদের পাসপোর্ট দেওয়া হয় নাই। তারা নৌকায় সমুদ্র পার হয়ে পালিয়ে এসেছে, তাও আবার ৫০ জনের মতো। আর ফিরে যাওয়ার উপায় নাই। গেলেই জেলে পচতে হবে, তবুও তারা বললো আমরা যাবো। দেশেই মরবো। বীরের জাত আজ বিপদে পড়েছে। দুঃখ হয়।

ভিয়েতনাম থেকে যারা এসেছিল তার মধ্যে একটা মেয়েও ছিল। তার পরিচয় করিয়ে দেয়া হলো। এই মেয়েটি 'মেয়ে গেরিলা বাহিনী'র একজন ক্যাপ্টেন।

Scanned with CamScanner

একাই ৮০ জন ফ্রান্সের সৈন্যকে গুলি করে হত্যা করেছিল। দেখতে মনে হলো কত নিরীহ বেচারি। মেয়েটা যখন বক্তৃতা করলো তখন বললো, দেশের স্বাধীনতার জন্য ইন্দোচীনের প্রত্যেকটা নরনারী আজ ক্ষেপে উঠেছে; যে পর্যন্ত ফ্রান্স আমাদের দেশ ছেড়ে না যাবে সে পর্যন্ত আমাদের বিশ্রাম নাই।

আমেরিকা থেকে প্রায় ৩০ জন এসেছিলেন। তাদের নেতা ছিলেন একজন নিগ্রো। কেমন করে সাদা চামড়াওলারা নিগ্রোদের অত্যাচার করে তার কাহিনি প্রকাশ করলেন তবে একজন সাদা চামড়া আমেরিকান এও বললেন, দেশের লোক আস্তে আস্তে বুঝতে পারছে যে এটা কত বড় অন্যায়। নিগ্রো ছেলেমেয়েরা সাদা চামড়ার ছেলেমেয়েদের সাথে মিশতে পারে না, এক স্কুলে পড়তে পারে না, বিবাহ তো দূরের কথা! চিন্তা করুন, 'স্বাধীন দুনিয়ার নেতার' দেশের এই অবস্থা! তিনি দুনিয়ায় গণতন্ত্র কায়েম রাখার জন্য ব্যস্ত হয়ে কোরিয়ায় সৈন্য পাঠান, চিয়াং কাইশেককে সাহায্য দেন। ইরানে ইংরেজকে সাহায্য করেন'।

নিগ্রো নেতা বললেন যে, 'আমেরিকার জনসাধারণ আজ আর যুদ্ধ চায় না, তবে শাসকগোষ্ঠী নিজেদের স্বার্থের জন্য যুদ্ধ বাঁধাতে ব্যস্ত। কিন্তু আমরা দেশের মধ্যে শান্তির পক্ষে এমন আন্দোলন করবো যাতে সরকার বাধ্য হয় শান্তি চাইতে। এ কথাও বললেন, যদি সরকার জানতে পায় যে, আমরা এরা শান্তি চাই তবে ছলে-বলে-কৌশলে খতম করে দেবে বিচারের নামে প্রহসন করে।

ভারতীয় দল থেকে ডা. কিচলু, কম্যুনিস্ট নেতা মি. গোপালন বক্তৃতা করলেন। প্রত্যেকেই তাঁদের নেতা মি. জওহরলাল নেহরুর প্রশংসা করলেন এবং বললেন, ভারতের জনসাধারণ শান্তি চায়। বর্তমান কংগ্রেস সরকারও শান্তি চায়। পণ্ডিত নেহরু দুনিয়ার শান্তির জন্য সংগ্রাম করবেন। কোনো ব্লকেই তিনি তাঁর দেশকে যোগদান করতে দেবেন না।

কম্যুনিস্ট নেতা মি. গোপালন বললেন, আমেরিকা বা কোনো সাম্রাজ্যবাদী সরকার যদি চীন দেশের ওপর আক্রমণ করে, তবে ৩০ কোটি ভারতবাসী চীনকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসবে। আরও অনেক কিছু বললেন, যা এখন আমার মনে নাই। কংগ্রেসীদের মধ্যে থেকেও অনেকেই বক্তৃতা করলেন। মনে হলো, একই সুরে গাঁথা। অনেকে আবার মহাত্মা গান্ধীরও প্রশংসা

Scanned with CamScanner

করলেন। মহাত্মা গান্ধীর এক শিষ্য গিয়েছিল ঐ নেথটি পরে। তিনিও বক্তৃতা করলেন, খবর নিয়ে জানলাম তিনি দাক্ষিণাত্যের এক বিখ্যাত নেতা।

সকল দেশের নেতারা বক্তৃতা করলেন। কয়েকদিন শুধু বক্তৃতাই হলো। মাঝে মাঝে রাতে থিয়েটার, নাচ হতো আমরা দেখতে যেতাম। ভারতীয়রা প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। তারা গায়ক, নৃত্যশিল্পী নিয়ে গিয়েছিল। মানিক ভাইয়ের এক বন্ধু পিরোজপুর বাড়ি, তখন কলকাতায় থাকেন, তিনি খুব ভালো গায়ক —মাঝে মাঝে গান গেয়ে মুগ্ধ করে দিতেন। একজন মহিলা গিয়েছিলেন; তিনি নেচে নাম করেন। সত্যই তিনি খুব ভালো নাচতে পারেন। ভারতীয়রা অনেক জিনিসপত্র উপহার দেবার জন্য নিয়ে গিয়েছিলেন, তার মধ্যে আমাদের আব্বাসউদ্দীন সাহেবের কয়েকখানা রেকর্ডও ছিল। সে-সব চীন শান্তি কমিটিকে উপহার দিয়েছিলেন।

আমরা পাকিস্তানিরা কিছুই নেই নাই। কী করবো? পীর সাহেবকে বললাম। তাঁর সাথে পরামর্শ করে কয়েকখান পাকিস্তানের পতাকা বানিয়ে তাই উপহার দিলাম। পাকিস্তান থেকে পীর মানকী শরীফ, আতাউর রহমান সাহেব, সরদার শওকত হায়াত, খান গোলাম মহম্মদ খান লুন্দখোর ও আমি বক্তৃতা করলাম। মহিলাদের পক্ষ থেকে বেগম মাজহার এবং শওকত হায়াত খানের বোনও বক্তৃতা করলেন। চমৎকার বক্তৃতা করেন ভদ্র মহিলা। সকলেই মুগ্ধ হয়ে তাঁর বক্তৃতা শুনলেন। আমি বক্তৃতা করলাম বাংলা ভাষায়, আর ভারত থেকে বক্তৃতা করলেন মনোজ বসু বাংলা ভাষায়।

বাংলা আমার মাতৃভাষা। মাতৃভাষায় বক্তৃতা করাই উচিত। কারণ পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলনের কথা দুনিয়ার সকল দেশের লোকই কিছু কিছু জানে। মানিক ভাই, আতাউর রহমান খান ও ইলিয়াস বক্তৃতাটা ঠিক করে দিয়েছিল। দুনিয়ার সকল দেশের লোকই যার যার মাতৃভাষায় বক্তৃতা করে। শুধু আমরাই ইংরেজি ভাষায় বক্তৃতা করে নিজেদের গর্বিত মনে করি।

পাকিস্তানের কেহই আমরা নিজেদের ঘরোয়া ব্যাপার বক্তৃতায় বলি নাই। কারণ মুসলিম লীগ সরকারের আমলে দেশের যে দুরবস্থা হয়েছে তা প্রকাশ করলে দুনিয়ার লোকের কাছে আমরা ছোট হয়ে যাবো। অনেকেই আমাদের জিজ্ঞাসা করলো, ভারত থেকে একজন বাংলায় বক্তৃতা করলেন, আর পাকিস্তান থেকেও

Scanned with CamScanner

একজন বক্তৃতা করলেন, ব্যাপার কী? আমি বললাম, বাংলাদেশ ভাগ হয়ে একভাগ ভারত আর একভাগ পাকিস্তানে পড়েছে। বাংলা ভাষা যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষা এ অনেকেই জানে। ঠাকুর দুনিয়ায় 'ট্যাগোর' নামে পরিচিত। যথেষ্ট সম্মান দুনিয়ার লোক তাঁকে করে। আমি বললাম, পাকিস্তানের শতকরা ৫৫ জন লোক এই ভাষায় কথা বলে। এবং দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ ভাষার অন্যতম ভাষা বাংলা। আমি দেখেছি ম্যাডাম সান ইয়াৎ-সেন খুব ভালো ইংরেজি জানেন, কিন্তু তিনি বক্তৃতা করলেন চীনা ভাষায়। একটা ইংরেজি অক্ষরও তিনি ব্যবহার করেন নাই।

চীনে অনেক লোকের সাথে আমার আলাপ হয়েছে, অনেকেই ইংরেজি জানেন, কিন্তু ইংরেজিতে কথা বলবেন না। দোভাষীর মাধ্যমে কথা বলবেন। আমরা নানকিং বিশ্ববিদ্যালয় দেখতে যাই। সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ইংরেজি জানেন, কিন্তু আমাদের অভ্যর্থনা করলেন চীনা ভাষায়। দোভাষী আমাদের বুঝাইয়া দিলো। দেখলাম তিনি মাঝে মাঝে এবং আস্তে আস্তে তাকে ঠিক করে দিচ্ছেন যেখানে ইংরেজি ভুল হচ্ছে। একেই বলে জাতীয়তাবোধ। একেই বলে দেশের ও মাতৃভাষার উপরে দরদ।

আমাদের সভা চললো, বক্তৃতা আর শেষ হয় না। এত বক্তৃতা দেওয়ার একটা কারণ ছিল। প্রত্যেক দিন সভায় যে আলোচনা হয় এবং যারা বক্তৃতা করেন তাদের ফটো দিয়ে বুলেটিন বাহির হয়। এই লোভটা অনেকেই সংবরণ করতে পারেন নাই। 'আর আমার বক্তৃতা দেওয়া ছিল এই জন্য যে, বাংলা ভাষায় বক্তৃতা দিব'।

যে হলে আমাদের সভা হয় তাহা বড় চমৎকার। কলকাতা কাউন্সিল হাউসের মতো, বুঝি একটু বড়ই হবে। একদিকে সভাপতিমণ্ডলীরা বসেছেন, আর সামনে ডেলিগেটরা বসেছেন। সভাপতিমণ্ডলীদের ঠিক পিছনে ৩৭টা দেশের পতাকা একইভাবে উড়ছে। হলের গেটেও ৩৭টা পতাকা লাগাইয়া দেওয়া হয়েছে। আমাদের পাকিস্তানের পতাকাটা খুব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। সিল্কের কাপড় দিয়ে করা ভারতের ও আমাদের পতাকা পাশাপাশি। হলের ভিতর ফ্ল্যাশ লাইট মাঝে মাঝে জ্বলে ওঠে—যখন ফটো নেওয়া হয়। ১০/১৫ জন ফটোগ্রাফার অনবরত ফটো নিচ্ছে। পাশ দেখাইয়া হলে ঢুকতে হয়। পাশের রুমে চা খাবার বন্দোবস্ত আছে। দরকার হলেই যেয়ে খেতে পারেন। পিছনে ফুলের বাগান ও মাঠ রয়েছে, রয়েছে বসার জায়গা। যখন বিশ্রামের জন্য

Scanned with CamScanner

সভাপতি সময় দেন, তখন একে অন্যের পাশে বসে আলাপ করে ঐ ফুলের বাগানে যেয়ে।

সম্মেলন ১১ দিন চলে। সকাল বিকাল এইভাবে চলতে থাকে। অনেক দেশের প্রতিনিধির সাথে আলাপ হয়। অস্ট্রেলিয়ার এক প্রতিনিধি আমার সাথে আলাপ করতে করতে বললেন, "তোমার দেশের রাষ্ট্রদূতরা মনে করে দুনিয়ার মানুষ আহাম্মক।" আমি বললাম, "কেন এ কথা বলছেন?" তিনি উত্তর করলেন যে, "রাষ্ট্রদূত ও কর্মচারীরা যেভাবে থাকেন, আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রীও সেভাবে থাকতে পারে না। অন্যান্য যে সকল দেশের জনগণের অবস্থা খুব ভালো, খায়ও অনেক এবং পরিমাণে বেশি—আমেরিকা, গ্রেট ব্রিটেন, রাশিয়া ও অন্যান্য দেশের রাষ্ট্রদূতরা যে অবস্থায় থাকে, তার চেয়েও অনেক ভালো অবস্থায় থাকে এবং যা-তা ভাবে অর্থ ব্যয় করে। আমাদের বোঝাতে চায় যে, তোমরা কত ভালো আছ। আমরা রাজনীতি করি, দেশ-বিদেশের খবর রাখি তোমাদের দেশের মাথাপ্রতি আয় কত? দেশের লোক না খেয়ে মরে, কাপড় পর্যন্ত জোগাড় করতে পারে না। এ সব খবর আজ দুনিয়ার শিক্ষিত সমাজ ভালো করেই জানে। দেশের মানুষ না খেয়ে মরে আর সেই দেশের কর্মচারী অথবা রাষ্ট্রনায়করা যেভাবে বাজে খরচ করে তা ভাবলে আমাদেরও লজ্জা করে।" আপনারা বুঝতেই পারেন কী উত্তর আমি দিবো! হ্যাঁ-না করে কেটে পড়লাম। লজ্জা হয়। যারা দুনিয়ায় ঘুরে বেড়ায়, আমেরিকা অথবা গ্রেট ব্রিটেনের রাষ্ট্রদূতদের সাথে পাল্লা দিয়া খরচ করে—আর তাদের কাছে আবার ভিক্ষা চায়, "আমাদের সাহায্য দেও, আমাদের মিলিটারি সাহায্য দেও"—যা বলব তাই শুনবো। তোমাদের অস্ত্র তোমাদের মত ছাড়া ব্যবহার করবো না। কাঁচামাল আছে তোমাদের দেবো। তারপর যাহা থাকবে অন্যকে দেবো। সেসব দেশের মানুষ আমাদের নেতাদের বাহাদুরি দেখলে হাসবে না কেন?

দক্ষিণ আমেরিকার একটা দেশের ডেলিগেটের সাথে আলাপ হলো। তিনি বললেন, পাকিস্তান কি একটা স্বাধীন দেশ না ভারতের একটা প্রদেশ? আমি আশ্চর্য হয়ে চেয়ে রইলাম। ভাবলাম, বোধ হয় লোকটা দলে পড়ে এসেছে। রাজনীতি বা দুনিয়ার খবর খুব রাখে না। তবে এ কথাও মনে হলো, পাকিস্তান সম্বন্ধে দুনিয়ায় কোনো বিশেষ প্রোপাগান্ডা হয় নাই। এটার প্রমাণ আমি ঢাকায় পেয়েছি। এক বন্ধুর বাড়িতে যাই। তার শালা আমাকে একটা চিঠি দেখালো, আমেরিকার একজন স্কুল মাস্টার লিখেছেন, উপরে ঠিকানা

Scanned with CamScanner

লেখা : 'পাকিস্তান-ইন্ডিয়া'। এতেই বোঝা যায়, আমাদের দূতেরা কি প্রোপাগান্ডাই না করেছে বিদেশে পাকিস্তান সম্বন্ধে! দুনিয়ার মানুষ জানে আমাদের লোকসংখ্যা কত? আর বাজেট কত? মাথাপিছু গড় আয় কত? আমাদের দেশের গ্রামে একটা কথা আছে, 'মিঞার বাড়ি খাবার নাই, বাহির বাড়ি বড় কাচারি', দশা হয়েছে তাই।

তবে এই কনফারেন্সে যোগদান করে ৩৭টা দেশের প্রতিনিধিরা পাকিস্তান সম্বন্ধে অনেক কিছু জেনে গিয়েছে। কাশ্মীর যে ভারতবর্ষ জোর করে দখল করে রেখেছে এ খবরটাও ভালোভাবে জানতে পেরেছে। কারণ আমাদের দেশের প্রতিনিধিরা কোনো দেশের প্রতিনিধিদের চেয়ে বুদ্ধি, কথা ও বক্তৃতায় কম ছিল না। আনন্দের ভিতরই আমাদের কনফারেন্স শেষ হয়ে গেল।

কনফারেন্স যখন চলছিল মাঝে মাঝে আমরা বিখ্যাত জায়গা, বিশ্ববিদ্যালয়, কৃষি স্কুল, মসজিদ, শ্রমিকদের অবস্থা, কৃষি ব্যবস্থা দেখতে যেতাম। আমি তো প্রায়ই রিকশা একখানা নিয়া বেরিয়ে পড়তাম। পিকিং শহরে আমার এক বন্ধুর সাথে দেখা হলো। আমরা এক ক্লাসে ল' পড়তাম। আমার সাথে পড়ার সময়ই খুব খাতির ছিল। বেচারি কাগজে আমার নাম দেখে আমাকে খুঁজতে এলো। কিন্তু আমাদের পায় নাই। সে যখন আসতো আমি তখন বাহিরে থাকতাম।

'লিবারেশন ডে'—নয়াচীনের স্বাধীনতা দিবসে আমরা জনগণের মিছিল এবং সামরিক কুচকাওয়াজ দেখতে গিয়েছি। উপরে দাঁড়াইয়া আছি। হঠাৎ দেখি আমার মতো কালো আচকান, সাদা পায়জামা পরে সাথে একজন শাড়ি পরা মহিলাসহ এক ভদ্রলোক যাচ্ছেন। চেয়ে রইলাম, কে যায়? হঠাৎ দেখি মাহবুব ও তার স্ত্রী। মাহবুব পাকিস্তান দূতাবাসের থার্ড সেক্রেটারি। ও যে এ চাকরি কবে পেয়েছে, এ খবর আমার জানা ছিল না। আমি নিজেকে সামলাতে না পেরে, নাম ধরে ডাকতে শুরু করলাম।

তিন-চার ডাক দেওয়ার পর ওর স্ত্রী ওকে ধাক্কা মেরে আমাকে দেখিয়ে দিলো। ও আমাকে বললো, "বেলা ৪টায় তোর হোটেলে যাবো।" বিদেশে একটা বন্ধুকে পেয়ে বড় আনন্দ হলো। ঠিক চারটায় মাহবুব ও তার বিবি উপস্থিত হলো। আমাদের ওর বাসায় খেতে দাওয়াত করলো। আমি ওর স্ত্রীকে বললাম, আপনি যদি ঝাল দিয়া মাছ পাক করে খাওয়ান তবে এক্ষুণি

Scanned with CamScanner

আপনার বাসায় যাবো। উনি বললেন, আজ তো আর বাজারে মাছ পাওয়া যাবে না। আজ এমনি বেড়াইয়া আসুন, কাল খাওয়াব। আমি বললাম, ঠিক আছে চলুন। আমরা ওর বাসায় গেলাম। নাস্তা খেলাম, দেশের কথা বললাম। ওর স্ত্রী আমাদের খুব আদর-যত্ন করলেন। মনে হলো তিনি আমাদের পেয়ে হাতে চাঁদ পেয়েছেন। এর কারণ প্রায় দুই বৎসর ওরা দেশে যায় নাই। ওর স্ত্রী দেশের কথা জানতে পাগল হয়ে উঠলো। এ প্রশ্ন ও প্রশ্ন, ঢাকার অবস্থা কী? পরিবর্তন কিছু হয়েছে কি না? রাজনীতির সাথে তাদের সম্বন্ধ নাই। ঐ প্রশ্নই আমাদের করলো না। আমরা তাদের সাথে রাজনীতি আলোচনা করলাম না। সময় পেলেই আমরা ওদের ওখানে যেতাম।

পাকিস্তান ডেলিগেটদের একদিন আমাদের রাষ্ট্রদূত রাত্রে খাওয়ার দাওয়াত করলেন। আমরা সকলেই সেখানে গেলাম। পিকিংয়েও আমাদের নিজেদের জায়গা আছে। রাষ্ট্রদূত সকল কর্মচারীর সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। নিজেই আমাদের যত্ন করতে আরম্ভ করলেন : 'আপনি এটা খান, ওটা খান—সবই পাকিস্তানি খাবার তৈরি করেছি'। খবর নিয়ে জানলাম, রাষ্ট্রদূতের স্ত্রী নিজেই আমাদের জন্য পাক করেছেন সকাল থেকে আর পাকের ঘর ছেড়ে বাইরে আসেন নাই। বোধ হয় দেশি মানুষ বহুদিন পান নাই, তাই আমাদের পেয়ে খুবই আনন্দিত হয়েছেন। আমাদের রাষ্ট্রদূতের নাম মেজর রেজা। পূর্বে মিলিটারিতে ছিলেন। লোকটাকে দেখে আমার খুব ভালো লাগলো, কত অমায়িক ব্যবহার। বেশি আড়ম্বরের সাথে থাকে না, আর টাকাও বেশি খরচ করেন না বলে মনে হলো। লোকটার দেশের জন্য অত্যধিক দরদ—কথায় বুঝলাম রাষ্ট্রদূত এই রকম লোক হলেই দেশের ইজ্জত বিদেশে বাড়ে। তাঁর সাথে আমাদের আলাপ হলো অনেকক্ষণ ধরে। নিজের বাড়িতে এসেছি মনে হলো, তাই উঠতে ইচ্ছা হয় না। রাত প্রায় ১১টা পর্যন্ত আমরা সেখানে রইলাম। পরে সবাইকেই গাড়িতে করে পাঠিয়ে দিলেন—আমরা যে হোটেলে থাকি সেই হোটেলে।

আমি ২/৩ দিন পরে আবার রিকশা নিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রদূতের অফিসে যাই। অফিসের সাথেই আবার মাহবুবের বাড়ি। অফিসে একজন ডিউটি অফিসার ছিলেন। ভদ্রলোক পাঞ্জাবি, খুবই অমায়িক ব্যবহার। অনেকক্ষণ পরে যখন মাহবুবের বাসায় এলাম, দেখলাম মাহবুব ও তার বিবি বেরিয়ে যাচ্ছেন। তাদের সাথে আর একজন সেক্রেটারি আছেন। বেচারা মোটর থেকে নেমে

Scanned with CamScanner

আমাকে বললো, বেরিয়ে যাচ্ছি, বড়ই দুঃখিত, কাল এসো অথবা রাতে এসো আমি গাড়ি পাঠিয়ে দেবো। আমি বললাম, মোটরের প্রয়োজন নাই। আমি একাই রিকশায় বেড়াই দেখতে চাই কী অবস্থায় এদেশের লোক আছে। আর কীভাবে এরা বাস করে! কাল যদি সময় পাই তবে নিশ্চয়ই আসবো। এই বলে আমি বিদায় নিলাম।

হোটেল থেকে যখন আসি তখন আমার দোভাষী আমাকে বলেছিল, রিকশা ভাড়া আমার দেশের টাকায় আট আনা হয়, ওদের প্রায় দুই হাজার 'ইয়ান' (চীনা টাকার নাম) আমি তাই ওকে দিয়া দিলাম বেচারা খুশি হয়ে নিয়ে গেল। এখন যাবার সময় তো আর দোভাষী নাই। কে আবার দাম ঠিক করে দেবে, আবার কোথায় যাবো বললে ওরা বুঝবে কি না? মহা বিপদ! ভাবলাম এক মাইল পথের বেশি তো হবে না, আস্তে আস্তে হেঁটে যাবো। যদি ঠিক করে বলতে না পারি যদি রিকশাআলারা আমার কথা না বোঝে? রাস্তায় এলাম। কিছুদূর হেঁটে দেখি একটা রিকশা দাঁড়াইয়া আছে। তাকে বললাম, পিকিং হোটেল। পিকিং হোটেল ও বুঝলো, বললো : আসো, কথা না—মাথা নেড়ে। উঠে বসে পড়লাম। ভাবলাম, চিন্তা কি! কোথায় নিয়ে যায় দেখা যাক। দেখি ঠিক হোটেলেই নিয়ে এসেছে। আমার মনে একটা কথা উঠলো, দেখি বিদেশি লোক পেলে, কেমন লুট করে। আমি হঠাৎ পকেটে হাত দিয়ে প্রায় ১০ টাকা পরিমাণ হাতে করে ওর সামনে ধরলাম। ভাবেসাবে বুঝাইয়া দিলাম, যাহা তোমরা নিয়ে থাকো তাই নেও। রিকশাওয়ালা আমার হাত থেকে ঠিক আট আনা পয়সা গুনে নিয়ে চলে গেল।

এদের চরিত্রের এই পরিবর্তনের কারণ কী? দোভাষীকে ডেকে পাঠালাম হোটেলে যেয়ে। আসলে তাকে বললাম, তোমাদের দেশের রিকশাআলা তো, "চোর" আমি একটু চালাকি করলাম, দেখি ওর মুখচোখ লাল হয়ে গেছে লজ্জায় ও রাগে। আমায় জিজ্ঞাসা করলো, "ব্যাপার কী?" আমি বললাম, "বসুন বলছি।" বেচারা ব্যস্ত হয়ে পড়লো, শুধু বারবার জিজ্ঞাসা করে—পরে আমি তাকে সত্য ঘটনাটা খুলে বললাম। তোমরা কী করে এদের চরিত্রের পরিবর্তন এত তাড়াতাড়ি করতে পারলে? তখন সে হেসে উঠে বলতে লাগলো, দেখো এদের 'ট্রেড ইউনিয়ন' আছে। এরা যা উপার্জন করে যতটুকু এদের দরকার তা রেখে যতটুকু সম্ভব ইউনিয়নে জমা দেয়। সেই টাকা দিয়ে ওদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া, ওদের জন্য থাকার বাড়ি, রিকশা মেরামত,

Scanned with CamScanner

চিকিৎসার বন্দোবস্ত ও অন্যান্য কাজ করে দেওয়া হয়। আমি বললাম, "কড়া শাসনও বোধ হয় করা হয়?" দোভাষীটা ছেলে মানুষ, বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি পড়ে। হঠাৎ হেসে দিয়ে বললো, আপনারা বোধ হয় শুনেছেন আমাদের সরকার খুব অত্যাচার করে এবং বেশি শাস্তি হয়। সে বললো, "কথাটা কিছু সত্য। যখন ওদের কেউ ঠকাতে পারবে না, খাওয়া থাকার বন্দোবস্ত করে দেওয়া হচ্ছে, ভালো ভালো থাকার বাড়ি করে দেওয়া হচ্ছে, তখন যদি ওরা কাউকে ধোঁকা দিয়ে অথবা ফাঁকি দিয়ে অর্থ উপার্জন করতে চেষ্টা করে তবে কেন ভীষণ শাস্তি দেওয়া হবে না?"

দোভাষী আমাকে বললো, দেখুন, নয়া সরকার গঠন হওয়ার পূর্বে যে সমস্ত মহাজনের কাছ থেকে ওরা রিকশা ভাড়া নিত—দিনভর যা উপার্জন করতো তা সকলই প্রায় মহাজনদের দিয়ে দিতে হতো। ওরা দিন রাত পরিশ্রম করেও ভাত জোগাড় করতে পারতো না। যাকে ইচ্ছা রিকশা ভাড়া দিতো। কিছু বললে বা প্রতিবাদ করলে আর তাকে রিকশা চালাতে দেওয়া হতো না। এখন আর মহাজনরা তা পারে না। তারা তাদের ন্যায্য ভাড়া পায়, আবার ওদেরও যা থাকে তাতে সংসার চলে যায়। মহাজনরা ইচ্ছামতো তাড়াতে পারে না। যদি কেহ খারাপ কাজ করে, ট্রেড ইউনিয়নে জানাতে হবে। তারা খোঁজখবর নিয়ে বিচার করবে। আপনারা মনে করবেন না, কম্যুনিস্ট দেশ—তাই মহাজনদের রিকশা সব কেড়ে নিয়ে রিকশা চালকদের দিয়ে দেওয়া হয়েছে। মহাজনরা রীতিমতো ভাড়া পাচ্ছে। রিকশার মালিক-মহাজনদের অত্যাচার আর খামখেয়ালি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে; এদিকে রিকশা চালকদের ব্যবহারেও পরিবর্তন হয়েছে। আমাকে বললো, রিকশা চালকদের নূতন বাড়ি দেখতে যাবেন? আমি বললাম, "নিশ্চয় যাবো"।

একদিন বিকালে আমাকে নিয়ে গেল দেখাবার জন্য। দেখলাম ছোট দুই কামরা করে ঘর করে দেওয়া হয়েছে। স্কুল করে দেওয়া হয়েছে, বেশ ভালোই আছে। আমাকে বললো, দেখুন আমাদের নূতন স্বাধীনতা, আমরা আস্তে আস্তে সকলই করবো। দেখলাম, সরকারকে কত ভালোবাসে এই লোকটা।

মাঝে মাঝে আমি ও ইলিয়াস বেরিয়ে পড়তাম। স্কুল দেখতে যেতাম, মসজিদ দেখতে যেতাম। এক মুসলমান পাড়ায় যাই। তখন নামাজের সময় একটা মসজিদে কয়েকজন মুসলমান নামাজ পড়ছে। নামাজ শেষ হওয়ার পরে আমার দোভাষী ওদের কাছে যেয়ে বললো, দেখ ইনি মুসলমান, শান্তি

Scanned with CamScanner

সম্মেলনে এসেছেন পাকিস্তান থেকে। ২/৩ জন আমার কাছে এলো, এসে আমাকে 'আস্‌সালামু আলাইকুম' দিয়া দাঁড়ালো। কী যেন জিজ্ঞাসা করলো, আমি বুঝলাম না। দোভাষীর দিকে তাকালাম। দোভাষী আমাকে বললে, কেমন আছেন? আপনাদের দেশ কেমন? আমি বললাম, খুব ভালো। তারা বললো, "আপনাদের দেশের লোক নামাজ পড়ে?" আমি বললাম, "খুব পড়ে। সকলেই প্রায় নামাজ পড়ে।" আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনারা সকলেই নামাজ পড়েন? ওরা বললেন, "কেহ কেহ পড়ে, সকলে তো পড়ে না।" "আপনাদের কম্যুনিস্ট সরকার নামাজ পড়তে দেয়?" ওরা খেপে বললো, "সব মিথ্যা কথা আপনারা শুনেছেন, আমরা নামাজ পড়ি, কোরআন পড়ি। ছেলেমেয়েদের কোরআন শিখাই। কেউ আমাদের বাধা দেয় না। আমরা খুব ভালো আছি।" দোভাষী আমাকে বুঝাইয়া দিলো। ভাবলাম, বোধ হয় ভয়েতে বললো। আরও খোঁজ নিতে হবে। তারপর প্রায় একা বেরুতাম। কী করবো? কথা বোঝে না, ভাবেসাবে যতদূর বোঝা যায় ও জানা যায়।

আমরা প্রায়ই বাজারে মালপত্র কিনতে যাইতাম। জিনিসপত্রের দাম স্বাভাবিক। খুব বেশিও না, খুব কমও না। মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যেই জিনিসের দাম। একজোড়া জুতা কিনলাম, আমাদের দেশের দামের চেয়ে কিছু কম হবে, কিন্তু খুব টেকসই। কোনো দোকানেই আপনার দাম করতে হবে না। যাবেন, দাম লেখা রয়েছে, যেটা পছন্দ হবে দামটা দিয়ে নিয়ে আসবেন। সকলের চেয়ে চমৎকার জিনিস হলো সরকারি স্টোর নামের দোকানগুলি। প্রত্যেক বড় বড় শহরে চারটা-পাঁচটা এবং বেশি ছোট শহরে একটা অথবা দুইটা, প্রত্যেক মহকুমায় একটা, এমনি করে সরকারের দোকান আছে। যাবতীয় মালপত্র সেখানে পাওয়া যায়।

এমন কোনো জিনিস নাই যা পাওয়া যায় না। যদি হঠাৎ ফুরাইয়া যায়, বলে দিবে চার পাঁচ দিন পরে আসবেন—পাবেন। এবং সমস্ত জিনিসের দাম লেখা রয়েছে। আমি কিছু কিছু জিনিস কিনে এনেছিলাম। একটা সুতার কাজ করা চাদর কিনেছিলাম ১৫ টাকায়, অন্ততঃপক্ষে আমার দেশে তার দাম হবে ২৫ টাকা।

২/১টা জিনিসের দাম সস্তা। আর সকল কিছুর দামই স্বাভাবিক। চীনের থেকে হংকং-এ মালপত্র অনেক সস্তা। একটা আশ্চর্য জিনিস আপনাদের বলতে চেষ্টা করবো। যতগুলি শহরে আমি গিয়াছি তার সকল জায়গায়

Scanned with CamScanner

বাজারে ঘুরেছি। জিনিসপত্রের দাম দেখবার জন্য, আর পছন্দ হলে ২/১টা মাল কিনতাম। পিকিং, তিয়ানজিং, নানকিং, ক্যান্টন, হ্যাংচো শহরে ঘুরেছি, কিন্তু কোথাও একটা বিদেশি জিনিস দেখি নাই। কাপড়, জুতা, সাইকেল, ঘড়ি, কলম, স্নো, পাউডার, পুতুল, যাহা কিছু মানুষের প্রয়োজন কিছুই বিদেশ থেকে আনা হয় না, এবং দেখলামও না। সিগারেটও নিজেরা করে, ফ্যাক্টরি আছে। আমার একটা অভ্যাস আছে। নিজের দাড়ি নিজেই শেভ করি, কোনোদিন সেলুন বা কোথায়ও শেভ করি না। আমার যে ব্লেড ছিল তাহা হঠাৎ ফুরিয়ে গেল। আমি বাজারে গেলাম ব্লেড কিনতে। সমস্ত দোকান খুঁজলাম ব্লেড পেলাম না। এক দোকানে তিন চার বৎসরের একটা পুরানো ব্লেড বের করলো তার উপরে জং পড়ে গেছে। দাড়ি তো দূরের কথা 'চাড়ি'ও (নখ) কাটবে না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ভাই সমস্ত পিকিং শহরে একটা ব্লেড পেলাম না, কারণ কী? দোকানদার ভাঙা ভাঙা ইংরেজি জানে। আমাকে বললো, বিদেশ থেকে এই সমস্ত জিনিস আমরা আনি না। আমাদের নিজেদের ঘরে যে ক্ষুর তৈরি হয় তা দিয়েই শেভ করি। যে পর্যন্ত আমরা ব্লেড ফ্যাক্টরি করে নিজেরা তৈয়ার করতে না পারবো, সে পর্যন্ত ব্লেড কেউই ব্যবহার করবে না। আমরা বিদেশকে কেন টাকা দিবো? দেশে বসে শুনতাম, চীনদেশ রাশিয়ার হুকুমে চলে। তবে রাশিয়ার কোনো 'ব্যবহারী দ্রব্য' ইংরেজিতে 'কনজ্যুমার গুডস' এ দেশে পাওয়া যায় না। কোনো জাপানি পুতুল নাই। আমেরিকার স্নো, পাউডার, ব্লেড, দাঁতের মাজন কিছু নাই। ভারতের কাপড়, ইংরেজের ব্লেড, কলম, সুইজারল্যান্ডের ঘড়ি, কিছুই এদেশে নাই। ভাবলাম বেরসিক দেশ। আমার দেশে সব পাওয়া যায়। আমেরিকা, ইংরেজ, জাপানি সব পাওয়া যায়।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম রাশিয়া এ সমস্ত জিনিস আপনাদের দেয় না? দোকানদার পিকিং শহরের লোক। বহু ঘাত-প্রতিঘাত ওর ওপর দিয়ে গেছে বলে মনে হলো। বললো, দেখুন চিয়াং কাইশেকের আমলে আমেরিকানরা এসব বহু দিত। সেগুলি কেবল শেষ হয়ে গেছে। রাশিয়ায় শুনেছি এগুলি বেশি হয় না, তাই আমরা শিল্প গড়তে যে কলকব্জা দরকার তাই আনি। রাশিয়া কাউকেও এই সমস্ত জিনিস দেয় না। আর দিলেও আমরা আনি না। আমাদের দেশ আমরা গড়বো, যারা শিল্প গড়তে সাহায্য করবে তারাই আমাদের বন্ধু। মনে মনে বললাম, 'বাবা সবাই রাজনীতিবিদ!' দরকার নাই বেশি কথা বলে। আবার কম্যুনিস্ট দেশ কী বলতে কী বলি, জান নিয়

Scanned with CamScanner

টানাটানি। হেঁটে হেঁটে হোটেলে এলাম। কারণ বাজার খুব দূরে না, কাছেই হবে। আবার রিকশা নেবো কিন্তু কথা বোঝে না, কী মুশকিল?

একদিন রাতে আমাদের চীন সরকারের পক্ষ থেকে দাওয়াত দিলো। যেতে হবে। স্বয়ং মাও সে তুং উপস্থিত থাকবেন। সাথে নিশ্চয়ই চৌ এন লাই, চ্যুতে, জিং এবং অন্যান্য বড় নেতা থাকবেন, যাঁদের জীবনী এক একটা ইতিহাস। এঁরা দীর্ঘ ৩০ বৎসর সংগ্রাম করেছেন। কেউবা ফাঁসির হুকুমে পালাইয়া আত্মরক্ষা করেছেন। কারও মাথার মূল্য কোটি কোটি টাকা ঘোষণা করেছে চিয়াং কাইশেক। সত্যই তাঁদের দেখার জন্য মনটা ব্যস্ত হয়ে পড়লো। আজ রাত্রে ওদের একবার চোখের দেখা দেখবো। বিশেষ করে মাও সে তুংকে, যাঁর নেতৃত্বে ৫০ কোটি লোক স্বাধীন হয়েছে; যাঁর নেতৃত্বে চীনের জনগণের সম্পূর্ণ আস্থা রয়েছে, যাঁকে দেখার জন্য লক্ষ লক্ষ লোক জমা হয়, যাঁর কথা শোনার জন্য দুনিয়া চেয়ে থাকে, তাঁকে দেখবো। কী আনন্দ!

ঠিক আটটার সময় আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো। আমাদের নেতা পীর সাহেবও আমাদের সাথে আছেন। ৩৭ দেশের প্রতিনিধি দলের নেতারা সামনের দিকে থাকলেন। আর আমরা লাইন ধরে টেবিলের ২ পাশে দাঁড়িয়ে গেলাম। আমাদের দাঁড়িয়েই খেতে হবে আমাদের সামনে টেবিলে খাবার প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে। যাওয়ার ১৫ মিনিট পরেই মাও এলেন, ব্যান্ড বেজে উঠলো। চারদিক থেকে 'মাও জিন্দাবাদ' ধ্বনি উঠলো। মাও হাসতে হাসতে ঢুকলেন। প্রায় ১ হাজার লোক আমরা সেখানে। সকলেই তাঁকে দেখতে যেন পাগল হয়ে উঠলো। প্রথমেই আমাদের প্রত্যেক দেশের নেতাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হলো। তারা হাতে হাত মিলাইয়া এক এক করে যার যার জায়গায় চলে গেলেন। মাও সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে খাওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন।

আমরা যে টেবিলে ছিলাম সেটা ভারত ও পাকিস্তানিদের জন্য আর আমাদের টেবিলে সিং কিয়াং প্রদেশের গভর্নর বোরহান শহীদ আছেন। প্রত্যেক টেবিলেই এক একজন করে বড় নেতা ছিলেন, তাঁরা আমাদের সাথে খাবেন। আমি ঠিক বোরহান শহীদের কাছে দাঁড়িয়েছিলাম। তিনি আমাকে পাকিস্তানি জেনে 'আস্‌সালামু আলাইকুম' বলে সংবর্ধনা করলেন। আমি যথারীতি ইসলামি কায়দায় উত্তর দিলাম। আমাদের খাওয়া এবং কথা শুরু হলো। ভদ্রলোক চীনা প্যান্ট ও চীনা কোট ও গোলটুপি মাথায় দিয়েছেন।

Scanned with CamScanner

আমাদের পিছনেই দেখলাম প্রায় ২৫/৩০ জন মুসলমান লম্বা জামা, গোলটুপি পরে দাঁড়াইয়া আছে। কাহারো কাহারো দাড়িও আছে, কিন্তু খুব অল্প।

আমি মি. বোরহান শহীদকে জিজ্ঞাসা করলাম, এরা কারা? তিনি বললেন, এঁরা বড় বড় মসজিদের ইমাম। এঁরা বড় বড় সভায় এবং খাওয়ার সময় দাওয়াত পেয়ে থাকেন। খাওয়া চললো। আমাদের টেবিলে মুরগি, আন্ডা, মাছ, ফল-ফলাদি রাখা হয়েছিল। আমরা বেশ খেলাম।

বোরহান শহীদকে তাঁর পরিচয় চাইলাম। তিনি অতি নম্রভাবে বললেন, আমি সিং চিয়াং প্রদেশের গভর্নর। আপনাদের সভায় যোগদান করার জন্য এসেছি। আরও কয়েকজন মুসলমানও এসেছেন, পরে আপনার সাথে পরিচয় করিয়ে দেবো। তবে তারা ইংরেজি জানে না, আমিও বেশি জানি না। তবে বুঝতে পারি, ভালো বলতে পারি না। আমি বললাম যা পারেন তাতেই আমার চলবে। তাঁকে অনেক প্রশ্ন করলাম, পরে মুসলমান ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কথা যখন লেখবো তখন সে-সব আলোচনা করতে চেষ্টা করবো। খাওয়ার পরে আমি আস্তে আস্তে ইমামদের কাছে যেয়ে 'আস্সালামু আলায়কুম' বললাম। তাঁরা সকলেই একসাথে আমাকে 'ওয়ালাইকুম আস্সালাম' বললেন। হাবেভাবে আলাপ হলো। তাঁরা চোখের মুখের ইশারায় জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন আছেন? আমিও হাত মুখ চোখ নেড়ে বোঝালাম, খুব ভালো। আপনারা কেমন? তারাও হাবভাবে বোঝালো, খুব ভালো। আমি সকলের সাথে হাত মোছাবা করলাম, ঠিক মুসলমানি কায়দায় বুকে হাত দিলো। আবার নিজ জায়গায় ফিরে এলাম।

এর মধ্যে দেখি হৈচৈ পড়ে গেছে। একদিকে চৌ এন লাই সকলের সাথে আলাপ করার জন্য বের হয়েছেন। আর একদিকে চ্যু তে বের হয়েছেন। চ্যু তে আস্তে আস্তে আমাদের কাছে এলেন। আমি হঠাৎ ঢুকে পড়ে তাঁর হাতের গ্লাসের সাথে আমার কমলালেবুর রসের গ্লাসের একটা ধাক্কা লাগিয়ে কমলালেবুর রসের লেমনেড খেয়ে নিলাম। এর অর্থ চীন দেশের সাথে আমার দেশের বন্ধুত্ব কামনা করলাম। আমি ফিরে আসছি। দেখি ইলিয়াস একজনের বগলের নিচ দিয়ে চ্যু তে'র কাছে যাবার চেষ্টা করছে। কিছুক্ষণ পরে দেখি ইলিয়াস একেবারে তাঁর কাছ ঘেঁষে দাঁড়াইয়া গ্লাসে গ্লাসে ধাক্কা মেরে ঢকঢক করে যাহা গ্লাসে ছিল খেয়ে নিলো। ও দারুণ পাজি, সকল জায়গায় থাকে কী করে? এত ভিড় ঠেলে কী করে কাছে গেল ভাববার কথা!

Scanned with CamScanner

আমি তো পারতাম না, আর যাইতামও না। চ্যু তে বেচারাকে যেভাবে সকলে ঘিরে ফেলেছে মনে হলো মেরে ফেলবে। কিন্তু তাঁর মুখে হাসি। সকলের সাথেই মিশছে। মিলিটারি হাত কি না! শক্ত হাড়। কিছুক্ষণ পরে সব শেষ হয়ে গেল, আমরা চলে এলাম। আগেই মাও চলে গিয়েছেন। তাঁর মুখেও হাসি দেখলাম। মনে হলো প্রাণখোলা হাসি। আমরা হোটেলে ফিরে এলাম।

এই মাও সে তুং! ৬০ কোটি লোকের নেতা। দেশের লোক এত ভালোবাসে এঁকে! হবেই তো, ত্যাগী, দেশকে ও জনগণকে তিনি ভালোবাসেন বলে জনগণও তাঁকে ভালোবাসে ও বিশ্বাস করে।

১লা অক্টোবর নয়াচীনের 'স্বাধীনতা দিবস' পালন করা হবে। আমাদের সকলকে দাওয়াত করা হয়েছে। চীনে এই দিনটাকে 'লিবারেশন ডে' বলা হয়। ৬০ কোটি মানুষ এই দিনে অত্যাচার অবিচার জুলুম শোষণের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করেছিল, তাই এটা ওদের অতি পবিত্র দিন। এই দিন সমস্ত চীনের লোক কাজকর্ম ছেড়ে আনন্দ করে। দিন দিন যেন আনন্দ বেড়ে চলেছে এদের। এইদিনে প্রত্যেকে তাদের কাজের হিসাব নেয় ও দেয়। দেশের জন্য কী করেছে এক বৎসরে কী কী ভালো কাজ করেছে। দেশ কতদূর অগ্রসর হয়েছে? রাস্তা কত বেড়েছে, শিল্প কতগুলি বেড়েছে। কৃষক জমি পেয়ে কত বেশি ফসল উৎপাদন করেছে? এই দিনে তারা তার হিসাব করে। যার যা ভালো কাপড় আছে তা বের করে পরে মাও কে দেখবে, তাঁদের বাণী শুনবে। মানুষ যেন পাগল হয়ে গেছে। সমস্ত রাস্তায় রাস্তায় গাড়িতে গাড়িতে বাড়িতে বাড়িতে দোকানে দোকানে শুধু সুন্দর সুন্দর লাল পতাকা। রুম থেকে যখন জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চাইলাম, মনে হলো সমস্ত পিকিং শহর যেন জেগে উঠেছে। শুধু লাল, লাল আর লাল। লাল পতাকা দিয়ে ঢাকা সুন্দর পিকিং শহরটা। আমরা তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে নাস্তা খেয়ে কাপড় পরে প্রস্তুত হলাম। ৯টায় গাড়ি এলে আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো। আমরা এক পাশে শান্তি সম্মেলনের ডেলিগেটরা দাঁড়ালাম, আর এক দিকে রাষ্ট্রদূত ও তাদের অফিসের কর্মচারীবৃন্দ। আমাদের কাছাকাছি একটু পিছনে প্রাসাদের সম্মুখভাগে মাও সে তুং, চৌ এন লাই, চ্যু তে ও অন্যান্য মন্ত্রীগণ এসে দাঁড়ালেন। মাও যখন এসে দাঁড়ালেন তখন জনতা চিৎকার করে মাওকে অভ্যর্থনা জানালো। প্রথমেই মিলিটারি প্যারেড হলো, নৌ বাহিনী এলো, তারপর বিমান বহর, তারপর পদাতিক, অশ্বারোহী,

Scanned with CamScanner

এমনি করে বিরাট সেনাবাহিনী ও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী প্যারেড করে মাও'কে সালাম জানিয়ে চলে গেল।

তারপর শুরু হলো শোভাযাত্রা, পূর্ব দিক থেকে আসছে আর পশ্চিম দিকে চলে যাচ্ছে। মহিলা ন্যাশনাল গার্ড এলো, যেভাবে প্যারেড করছে মনে হচ্ছে যেন পুরুষের বাবা আর কি! শান্তির জন্য শোভাযাত্রা এলো একটা—কত হাজার লোক হবে বলা যায় না! প্রত্যেকের হাতে শান্তির পতাকা আর কবুতর। প্রত্যেকে পা মিলিয়ে প্যারেড করতে করতে যাচ্ছে। আর স্লোগান দিচ্ছে দুনিয়ায় শান্তি কায়েম হোক, মাও সে তুং জিন্দাবাদ, নয়াচীন জিন্দাবাদ। আমাদের কাছ দিয়ে যখন যাচ্ছিল, তখন তারা সমস্ত কবুতর ছেড়ে দিলো। মনে হলো সমস্ত আকাশ কবুতরে ভরে গেছে। দু'একটা এসে আমাদের কাছে পড়লো। আর একটা মাত্র কবুতর ঠিক মাও সে তুংয়ের কাছাকাছি দেওয়ালে বসলো। আমাদের কাছে যে কবুতরটা পড়লো তাকে ধরার জন্য আমাদের মধ্যে ২/১ জন পড়েই গেলেন, মনে হলো বোধ হয় অস্ট্রেলিয়ার ডেলিগেটদের থেকে একজন ধরেছিল।

তারপর শুরু হলো কৃষকদের শোভাযাত্রা—যার যার ইউনিয়নের পতাকা, যে যে জিনিস তারা বেশি উৎপাদন করেছে তাও সকলের হাতে হাতে আছে। কারও হাতে ধান, কারও হাতে অন্য ফল-ফলাদি, কাহারো হাতে কাস্তে-কোদাল। এইভাবে মাঝে মাঝে আবার সান ইয়াৎ-সেনের ছবি বিরাট আকারে কয়েকজন মিলে, মাও সে তুংয়ের ফটো কয়েকজনে, স্ট্যালিনের ফটো, মার্কস এঙ্গেলস লেনিন, আরও অনেক মনীষীর ফটো নিয়ে চলেছে। তবে সকলে পা মিলিয়ে চলেছে। যখন মাও সে তুংয়ের কাছে শোভাযাত্রা উপস্থিত হয় তখন মনে হয় যেন আকাশ ফেটে যাচ্ছে, শুধু মুহুর্মুহু জিন্দাবাদ। মনে হলো যে লোকগুলি যেন পাগল হয়ে গেছে। একদম শেষে এলো ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের দল। তারা আর এগিয়ে গেল না, একেবারে মাও সে তুংয়ের মুখোমুখি দাঁড়াল এবং চিৎকার শুরু করলো। সকলেরই সাদা প্যান্ট সাদা শার্ট আর গলায় লাল রুমাল। হাতে তাদের জাতীয় পতাকা। প্রথমে এসেই সালাম জানালো তাদের নেতাদের, তারপর শুরু হলো জিন্দাবাদ। পাঁচ ঘণ্টা পুরা এই শোভাযাত্রা চললো। একথা মনে করবেন না মিছিল চওড়ায় ৪/৫ জন নিয়া—অন্ততপক্ষে একশত দেড়শত লোক চওড়াভাবে শোভাযাত্রা করে যাচ্ছে। মনে হলো কোটি লোক হবে। পাঁচঘণ্টা পর্যন্ত মাও সে তুং দাঁড়াইয়া আছেন এবং সালাম গ্রহণ

Scanned with CamScanner

করছেন, এক মুহূর্তের জন্য বসলেন না। আশ্চর্য ধৈর্য! আমি মাঝে মাঝে তাঁর দিকে তাকাইয়া দেখতাম। হাসি হাসি মুখ, কোনো ক্লান্তি নাই। একটু নড়ছেন বলেও আমার মনে হলো না।

আমাদের মধ্যে আলোচনা শুরু হলো কত লোক হবে। কেউ বলে ৫০ লক্ষ, কেহ বলে ৪০ লক্ষ, কেহ বলে এককোটি। ৪০ লক্ষের কম কেউ বললো না। আতাউর রহমান সাহেব বললেন, ৩০ লক্ষ তো হবেই। আমি কিন্তু ১৫ লক্ষ বললাম। সকলেই আমার ওপরে ক্ষেপে উঠল। আতাউর রহমান সাহেব আমাকে বললেন, আপনার ধারণাই নেই। কী করবো! শেষ পর্যন্ত ২৫ লক্ষ লোক শোভাযাত্রা করেছে বলে ধরে নেওয়া গেল। আমিও ভয়েতে ভয়েতে মেনে নিলাম, ভাবলাম যেমন গাদাগাদি করে গেছে হতেও পারে! আর আমরা অনেক নন-কম্যুনিস্ট এসেছি আমাদের দেখাবার জন্যও লোক জোগাড় করে থাকবে! যাহা হোক, কাল সকালে দেখা যাবে—খবরের কাগজে কত লেখা হয়! আমাদের দেশের অভ্যাস, সরকারি কাগজে যদি এক লক্ষ লেখা হয় তবে আমরা ধরে নিব ২৫ হাজার। কারণ, তার বেশি তো হবেই না। ওটা আমাদের দেশের কাগজআলারা লেখেই থাকে। আমাদের দেশের সরকারি প্রেসনোটেই মাঝে মাঝে লেখে। আর কাগজআলারা কেন লেখবে না? ভাবলাম, এদেশে সরকারি কাগজগুলিও বোধ হয় একই রকম। আর কম্যুনিস্টরা তো একটু বাড়াবাড়ি করেই থাকে। পাঁচ হলে পঞ্চাশ করা তাদের অভ্যাস।

সকালে উঠে দেখি, হায় হায়! কম্যুনিস্ট দেশের সরকারি কাগজ সত্য কথা লেখে! একটু আশ্চর্য হয়ে গেলাম। লিখেছে ৫ লক্ষ লোকের শোভাযাত্রা। কোথায় আমরা বলি ২৫ লক্ষ! আর সরকারি কাগজ লেখে পাঁচ লক্ষ। আশ্চর্য হলাম মিছাই কি এদেশের জনসাধারণ সরকারকে ভালোবাসে?

আমরা ২টায় ফিরে এলাম হোটেলে। খেয়ে নিয়ে বিশ্রাম করলাম। মানিক ভাই তো কম্বল গায় দিলো। এটা তাঁর অভ্যাস, দুপুরে এক পেট খেয়ে একটু ঘুমাইয়া নেয়। যদিও ইত্তেফাকের সম্পাদক হয়ে দুপুরবেলা বিশ্রাম করা তো দূরের কথা, রাত্রেই ঘুমাতে পারে না।

আমরা বিকালে এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করলাম। সন্ধ্যার সময় এলাম বাজি পোড়ান দেখতে। ওটার মধ্যে বেশি কিছু বাহাদুরি দেখলাম না। কারণ ওরকম বাজি আমাদের দেশে গ্রামের লোকে অনেক করে থাকে। যা হোক, দেখলাম প্রায় লাখ খানেক লোক নাচানাচি, গান, বাজনা, ফুর্তি ও হুড়াহুড়ি

Scanned with CamScanner

খুব আরম্ভ করেছে সমস্ত জায়গাটায়। কেহ কেহ হাত ধরাধরি করে নাচছে, কেহ উপরের দিকে লাফাচ্ছে। মনে মনে বললাম, পেটে খাবার পড়েছে কি না তাই নাচন এসেছে। চিয়াং কাইশেকের সময় তো এত নাচো নাই? তখন তো ইয়া নফ্‌ছি ইয়া নফ্‌ছি ডাক ছাড়তে! যা হোক, দেখলাম, তারপর ফিরে এলাম—কারণ ভীষণ ঠান্ডা। গরম কাপড় তো খুব ছিল না। আমার জান যায় যায় অবস্থা!

গোটা দুই কম্বল গায়ে দিয়া ঘুমাইয়া পড়লাম। পরের দিন সকালবেলা দোভাষীকে জিজ্ঞাসা করলাম, প্রত্যেক বৎসর কি এইভাবে স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয়? দোভাষী বললো, "জানি না, আপনারা কী ভাবেন। গত বৎসর এর চেয়ে অনেক ভালোভাবে 'লিবারেশন ডে' পালন করা হয়েছিল। এবার সকলেই কোরিয়ার যুদ্ধ ও শান্তি সম্মেলনের জন্য ব্যস্ত ছিল।" আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম, "চিয়াং কাইশেকের আমলে স্বাধীনতা দিবস পালন করা হতো কি না?" বললো, "হতো। মিলিটারির কুচকাওয়াজ, পতাকা উত্তোলন ও সভা এবং বড় বড় বক্তৃতা হতো। এখন আর বেশি বক্তৃতা হয় না।"

নয়াচীনের লোকের স্বাধীনতা দিবস পালন করা যখন দেখতেছিলাম, তখন ১৯৪৭ সালের 'পাকিস্তান দিবসে'র কথা মনে পড়লো। আমরা কলকাতা থেকে ছুটে এলাম। কুঁড়েঘর থেকে আরম্ভ করে প্রাসাদ পর্যন্ত শুধু আনন্দ। মানুষের মুখে হাসি ধরে না। হাজার হাজার লোক শোভাযাত্রা করেছিল, আকাশ বাতাস মুখরিত করে 'কায়েদে আজম জিন্দাবাদ'—'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' ধ্বনি উঠেছিল। সেই দিন দেখেছি মানুষের আনন্দ, আর নয়াচীনে দেখলাম মাও সে তুংকে লোকে যেভাবে ভালোবাসে, কায়েদে আজমকেও লোক সেইভাবে ভালোবাসতো। হায়! মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ আজ আর নাই। তাঁর সাধের পাকিস্তানের জনগণের অবস্থা যদি দেখতেন তবে বোধ হয় নীরবে অশ্রু বিসর্জন করতেন।

আমাদের সম্মেলন চলছিল। আমি রাতে মাহবুবের ওখানে মাছ ভাত খাবো বলে ফোন করে জানিয়ে দিলাম। বলে দিলাম, কাঁচা মরিচ, পিঁয়াজ, মাছ, ভাত আর যেন কিছু করা হয় না। ফোন ধরেছিলেন মাহবুবের স্ত্রী। আমি বললাম, বাবুর্চি দিয়া পাকান চলবে না, নিজেই চিটাগাংয়ের মতো ঝাল দিয়ে পাক করবেন। বেচারা বললেন, আমিই নিজ হাতে পাক করবো। নিজেই আপনাদের খাওয়াবো। সকাল সকাল আসবেন নাকি মাহবুবকে, গাড়ি দিয়ে পাঠাইয়া দিবো। আমি বললাম, তাই ভালো হবে।

Scanned with CamScanner

ঠিক সন্ধ্যার পরে মাহবুব এলো। বেগম সাহেবাকে নিয়ে আসেন নাই, কারণ তিনি পাকে ব্যস্ত আছেন। আমরা তাড়াতাড়ি গেলাম, যেয়ে দেখি মাছ ভাত তো করেছেই, সাথে কিছু গোস্তও পাকাইয়াছে। কী করা যায়! খাওয়া শুরু হলো। আমি কি আর দাঁড়াই, তাড়াতাড়ি ভাজা মাছের থালাটা টেনে নিলাম, সাথে কাঁচা মরিচ আর টমেটো'র সালাদ। মানিক ভাইয়ের দিকে চেয়ে দেখি, হায় হায়! খাওয়া শুরু আমার পূর্বেই করে দিয়েছেন। আমি তো জানি মানিক ভাইয়ের সাথে খেয়ে পারবো না, তবে আজ চেষ্টা করে দেখা যাবে। আতাউর রহমান সাহেব ভদ্রলোক, আস্তে আস্তে খাচ্ছেন। আর ইলিয়াস, সর্বনাশ! এটা ধরে ওটা ধরে আর শুধু খায়। যাহোক, মাহবুব ও তার বেগমও আমাদের সাথে খেলেন তারপর গল্পটল্প করে বিদায় নিলাম।

কত আর খাওয়া যায়! আবার পরের দিন পিকিং করপোরেশন থেকে আমাদের খাওয়ার দাওয়াত। পুরান রাজপ্রাসাদের ভিতরে বন্দোবস্ত করা হয়েছে। আমরা পাকিস্তানিরা এক জায়গায় বসলাম, পীর সাহেব আমাদের টেবিলেই বসলেন। আমরা খাওয়া-দাওয়া করলাম। খাওয়ার পরে সে কী আনন্দ। আমাদের সম্মেলনও শেষ হয়ে গেছে। শীঘ্রই যার যার দেশের দিকে ফিরবে। সকলের কাছ থেকে সকলে বিদায় নিবে। খাওয়ার পরে গান শুরু হলো, ফুর্তি শুরু হলো, কেউ লাফায়, কেউ হৈচৈ করে, কেহ দীর্ঘায়ু কামনা করে। এদেশ ও দেশকে ধন্যবাদ দেয়। সকলে শুভেচ্ছা জানায়।

বের হয়ে দেখি এলাহি কাণ্ড! হাত ধরাধরি করে ঘুরে ঘুরে নাচের আসর জমেছে। ভারতের নৃত্যশিল্পীরা ভিতরে নাচছে, একদম মাতিয়ে দিয়েছে, হাততালি পড়ছে খুব। কিছুক্ষণ এইভাবে চলার পরে আমরা বিদায় হবো, চেয়ে দেখি রাস্তার দু'পাশে হাজার হাজার ছেলেমেয়ে দাঁড়াইয়া আমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছে, তাদের জাতীয় সংগীত গাইছে। সকলে এক সাথে মাঝে মাঝে 'মাও সে তুং জিন্দাবাদ', 'নয়াচীন জিন্দাবাদ'—'দুনিয়ায় শান্তি কায়েম হউক' ধ্বনি দিচ্ছে। আর হঠাৎ কেহ জিজ্ঞাসা করছে তোমরা কোন দেশ, আমি একজনকে বললাম, 'পাকিস্তান'। তখনই আবার শুরু হলো ওদের ভাষায়, 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ'। এই রকম প্রায় আধা মাইল পথ আমাদের আসতে হলো। কোনো কোনো জায়গায় ছেলেরা আমাদের কোলে করে উঁচা করে আবার ছেড়ে দিচ্ছে, মনে হচ্ছে কী আনন্দ এদের! আধা মাইল পার হতে আমাদের এক ঘণ্টার ওপরে লেগে গেল। আমরা আস্তে আস্তে হোটেলে এলাম। হেঁটেই এলাম,

Scanned with CamScanner

গাড়িরও জন্য আর দেরি করলাম না। আতাউর রহমান সাহেব, আমি আর বোধ হয় ইলিয়াস ছিল। মানিক ভাই গাড়িতেই চলে গেছেন।

পরের দিন আতাউর রহমান সাহেব ও মানিক ভাই দেশে চলে যাবেন। প্লেনে জায়গা ঠিক করে দেওয়ার জন্য বলে দেওয়া হয়েছে। সে দিন আর হলো না, পরের দিন দুইজন একসাথেই রওয়ানা হলেন। মানিক ভাইয়ের ইত্তেফাক কাগজ বন্ধ হয়ে যাবে। টাকাপয়সা দিয়ে আসতে পারেন নাই। তাই তিনি ছুটলেন দেশের দিকে। আর আতাউর রহমান সাহেবের কথা নাই বললাম। কারণ, ভাবির শরীর খুবই খারাপ দেখে এসেছিলেন। আর এটা না বললেই ভালো হয়, তবে বলা যায়, ভাবিকে আতাউর রহমান সাহেব খুব ভালোবাসেন। না দেখে বোধ হয়—থাকতেই পারেন না। কারণ, যত দিন পিকিং ছিলেন সময় পেলেই শুধু 'ভাবি আর ভাবি'। আমি মাঝে মাঝে ঠাট্টা করতাম। রাগ করতেন না আমার ওপরে। আপনারা তো জানেন, মনটা তাঁর খুবই ভালো।

যে-দিন সকালবেলা আতাউর রহমান সাহেব ও মানিক ভাই কামরা থেকে চলে গেলেন তখন আমার মনের অবস্থা আপনারা বুঝতেই পারেন। তবে একদিকে এতদূরে এলাম; নয়াচীন সম্বন্ধে এত কথা শুনলাম, না দেখে চলে যাবো? আবার কবে আসবো, জীবনে আর নাও তো আসতে পারি! আর অন্যদিকে দু'জন ঘনিষ্ঠ মানুষ চলে যাচ্ছেন, তাঁদের সাথে শুধু রাজনীতির সম্বন্ধ নয়, তাঁদের প্রাণের চেয়ে অধিক ভালোবাসি ও শ্রদ্ধা করি। তাঁরা চলে যাচ্ছেন—বুঝতেই পারেন কী অবস্থা আমার মনের। কামরাটা আমার খালি হয়ে গেল। আর ঘরে থাকতে পারলাম না। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লাম। আজ হাসপাতাল, বিশ্ববিদ্যালয়, আরও কয়েকটা জায়গা দেখবো। ইলিয়াস অন্য কোথাও চলে গেল। আমি হাসপাতাল দেখতে গেলাম। স্বাস্থ্যসেবা খাবার এর মধ্যেই যথেষ্ট উন্নতি করেছে। আমাদের বললো, রোগ অনেক কমে গিয়েছে। আমরা রোগ হওয়ার পরে চিকিৎসার চেয়ে রোগ যাতে না হয় তার দিকেই নজর বেশি দিয়েছি। প্রত্যেক বৎসরেই রোগীর হিসাব নিই। তাতে দেখা যায় আস্তে আস্তে, রোগ কমে আসছে। পেটে খাবার পড়েছে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে—রোগ বেশি হবে কেন? হাসপাতালটা আধুনিক ধরনের এবং যথেষ্ট উন্নতমানের যন্ত্রপাতি আছে।

সেখান থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলাম। বিরাট বিশ্ববিদ্যালয়। আমাদের দেশের মতো কেরানি পয়দা করার শিক্ষাব্যবস্থা আর নাই। কৃষি শিক্ষা, শিল্প,

Scanned with CamScanner

ইঞ্জিনিয়ারিং, টেকনিক্যাল শিক্ষা দেওয়ার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। সেখানে আমার সাথে আলাপ হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর মি. হালিমের। তাঁর একটা চীনা নামও আছে, সেটা আমার মনে নাই। ভদ্রলোক ইংরেজি জানেন। তাঁর সাথে প্রায় এক ঘণ্টা আলাপ হলো। তিনি আমাকে বললেন, বাধ্যতামূলক ফ্রি শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছি। প্রত্যেক ছেলেমেয়েকে স্কুলে দিতে হয়। সরকার তাদের যাবতীয় খরচ বহন করে। কৃষকদের জন্য কৃষি স্কুল করা হয়েছে। আমাকে একটা কৃষি স্কুল দেখানো হয়েছিল। সেখানে যুবক কৃষকদের কিছুদিনের জন্য শিক্ষা দিয়ে খামার জমিতে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। শ্রমিকদের জন্য স্কুল করা হয়েছে। প্রত্যেক শিল্পকেন্দ্রের কাছে স্কুল আছে। বড়দের শিক্ষা দেওয়া হয় কাজের ফাঁকে, আর তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য আলাদা বন্দোবস্ত আছে। সকল দিকে খোঁজ নিয়া জানা গেল যে, মাত্র চার বৎসরে তারা শতকরা ৩০ জন লোককে লেখাপড়া শিখিয়ে ফেলেছে। গর্ব করে আমাকে আবার বললো, '১০ বৎসর পরে যদি চীনে আসেন তবে দেখবেন একটা অশিক্ষিত লোকও নাই।'

একটা বিষয় দেখে সত্যই আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। এক এক দেশে এক এক প্রকারের 'স্বার্থ সংশ্লিষ্ট শ্রেণি' ('প্রিভিলেজড ক্লাস') আছে—যেমন আমাদের দেশে অর্থশালী জমিদাররা 'প্রিভিলেজড ক্লাস', অন্য দেশে শিল্পপতিরা 'প্রিভিলেজড ক্লাস'; কিন্তু নতুন চীনে দেখলাম শিশুরাই 'প্রিভিলেজড ক্লাস'। এই প্রিভিলেজড ক্লাসটা সরকারের নানা সুযোগসুবিধা পেয়ে থাকে। নয়াচীন সরকারের হুকুম, প্রত্যেক ছেলেমেয়েকে স্কুলে দিতে হবে, একটা পরিমাণ ঠিক করে দিয়েছে, সেই পরিমাণ খেতে দিতে হবে। পোশাক ঠিক করা আছে, সেইভাবে পোশাক দিতে হবে। যাদের দেবার ক্ষমতা নাই তাদের সরকারকে জানাতে হবে। সরকার তাদের সাহায্য করবে। নতুন মানুষের একটা জাত গড়ে তুলছে নয়াচীন। ১৫/২০ বৎসর পরে এরা যখন লেখাপড়া শিখে মানুষ হয়ে দেশের জন্য কাজ করবে তখন ভেবে দেখুন নয়াচীন কোথায় যেয়ে দাঁড়াবে? এইভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি দেখে ফিরে এলাম। খাওয়া-পরা পেয়ে নয়াচীনের ছেলেমেয়েদের চেহারা খুলে গিয়েছে। মুখে তাদের হাসি, বুকে তাদের বল, ভবিষ্যতের চিন্তা নাই। মনের আনন্দে তারা খেলছে। প্রত্যেক ছেলেমেয়েকে খেলতে হয়, প্যারেড করতে হয়। বিকালে ছোট ছেলেমেয়েদের একটা মাঠে বেড়াতে গেলাম। যেয়ে দেখি প্রায় ২ হাজার

Scanned with CamScanner

ছেলেমেয়ে সমবেত হয়েছে। মেয়ে শিক্ষক তাদের সাথে আছেন। একটা ইউরোপিয়ান মেয়ে শিক্ষকও দেখলাম। প্রথমে প্যারেড করলো, তারপর দৌড়াদৌড়ি শুরু হলো। কিছুক্ষণ দেখে চলে এলাম। আসতে আসতে ভাবলাম, আমার দেশের হতভাগা ছেলেমেয়েদের কথা। এরা স্বাধীন হয়েছে ১৯৪৯ সালে। এ কথাটি আমাদের সকলের মনে রাখতে হবে। প্রফেসর হালিম আমাকে বললেন, আমাদের প্রধান কাজ হলো শিক্ষা ও খাদ্য। আর একজন প্রফেসরের সাথে আমার আলাপ হলো। তিনি আমাকে বললেন, কী করে পিকিং শহর কম্যুনিস্টরা দখল করলো। তিনি বললেন যে, আমি শহরে ছিলাম। কম্যুনিস্ট বা অন্য কোনো রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলাম না। আমার কোনো শত্রুও নাই, লেখাপড়া করি আর লেখাপড়া করাই—এই হলো আমার ধর্ম।

লালচীন সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক রেডিওতে ঘোষণা করলো, 'আমরা ইলেকট্রিক সরবরাহ কেন্দ্র ও পানি সরবরাহ কেন্দ্র দখল করেছি। জনসাধারণকে কষ্ট দিবার জন্য আমরা সংগ্রাম করছি না। আমাদের সংগ্রাম জনগণের সংগ্রাম, আমাদের সৈন্যবাহিনীর নাম জনগণের সৈন্যবাহিনী। জুলুমের ও অত্যাচারের হাত থেকে দেশবাসীকে বাঁচাতে চাই। আমরা ইলেকট্রিসিটি ও পানি বন্ধ করলাম।' এদিকে তো পালানো শুরু হয়েছে। হাজার হাজার লোক ঘরবাড়ি ছেড়ে দিয়ে পালাচ্ছে—বিশেষ করে শোষক বড়লোক, অর্থশালী আর অত্যাচারী, অনেক গরিবও পালাতে চেষ্টা করলো। কিন্তু গরিবদের পালাবার উপায় নাই। চিয়াং কাইশেকের উড়োজাহাজ বড় লোকদের নিয়ে যাচ্ছে। এক একটা ফ্যামেলি পার করতে বহু অর্থের প্রয়োজন হয়। ২/১ দিনের মধ্যেই পিকিং শহরের পতন হবে। কারণ তিন দিক দিয়ে আক্রমণ হবে। একদিক খোলা, সে পথ দিয়ে চিয়াংয়ের সৈন্যবাহিনী আর স্বৈরাচারীরা পালাতে আরম্ভ করলো। সমস্ত শহরে হৈচৈ পড়ে গেল।

প্রফেসর বললেন, রাস্তায় বের হলাম, দেখি সস্তায় জিনিসপত্র বিক্রি করছে ধনীলোকেরা। অল্প টাকায় বাড়িও বিক্রি করছে, কেউ দোকান, কেউবা দোকান বা অন্য কিছু। আমি বইয়ের দোকানের কাছে গেলাম, দেখি সকলের চেয়ে বড় যে দোকান তার বই বিক্রি করবে বলে ঘোষণা করছে। খদ্দের কোথায়? সকলেরই তো ইয়া নফছি ইয়া নফছি। আমি ভাবলাম, সারা

Scanned with CamScanner

জীবনভর যে সামান্য অর্থ জমা করেছি তা দিয়ে এই সুযোগে বই কিনে রাখি। আমি বই বাছতে আরম্ভ করলাম।

দোকানদার বললেন, "বেছে লাভ নাই, সমস্ত বই কত টাকা দিবেন বলেন?" আমি বললাম, "আপনি কত চান তাই বলুন।" তিনি উত্তর করলেন, "আমার এমনিই ফেলে যেতে হবে। এই জালেম কম্যুনিস্টদের রাষ্ট্রে আমি থাকবো না। আজই আমি পালাবো, ছেলেমেয়ে পাঠাইয়া দিয়াছি। আপনার যাহা ইচ্ছা হয় দিয়ে বইগুলি নিয়ে নেন।" সামান্য অর্থে বইগুলি আমি পেলাম। আরও ঘুরে কিছু বই কিনলাম। আজ সমস্ত পিকিংয়ের মধ্যে আমার লাইব্রেরিটি বড়। আমি বই বিক্রি করি না। ওটা আমার নিজস্ব পড়বার লাইব্রেরি এখন পাবলিক আমার লাইব্রেরিতে এসে লেখাপড়া করতে পারে এবং অনেকে পড়েনও। আর যত ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার বই ছিল, "আমি গরিব শিশুদের বিলিয়ে দিয়েছি।" তিনি আরও বললেন, বিপ্লবে আমার জীবনের একটা আশা পূর্ণ হয়েছে, সে হলো লাইব্রেরি। বহুদিন থেকে ভাবতাম, আমার একটা নিজস্ব বড় লাইব্রেরি চাই। সে আশা পূর্ণ হলো।

আমি একটু হাসলাম দেখে বেচারা বললেন, দেশের উত্থান পতনের সময় অনেক ঘটনা এ রকম হয়ে থাকে। আমি বললাম, দেশের এইরকম ঘটনার সময় অনেকেরই সুযোগ জুটে যায়। বেচারা এ কথার আর উত্তর দিলেন না। আমিও একটু লজ্জা পেলাম।

পিকিং শহরে একটা জায়গায় আমাদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, যেখানে কোরিয়ার যুদ্ধে আমেরিকাই যে জীবাণু বোমা ছেড়েছে তাতে যে ক্ষতি হয়েছে তার কিছু প্রমাণ জোগাড় করে রাখা হয়েছে। অনেকগুলি ফটো, কিছু জীবাণু, কিছু অসুস্থ মানুষের ছবি, কিছু লাশের ছবি আর আমেরিকার কয়েকজন সৈন্যের স্বীকারোক্তি রেকর্ড করা এবং হাতের লেখা—কী করে তারা জীবাণু বোমা ব্যবহার করেছে, চীন ও কোরিয়ার বর্ডারে। আমাদের অনেকেরই বিশ্বাস হলো যে, এ রকম বোমা ছেড়ে থাকতেও পারে! কারণ আমেরিকাই একদিন যুদ্ধে জয়লাভ করার জন্য জাপানের দুইটা শহর—হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে এটম বম ছেড়ে লক্ষ লক্ষ লোককে মেরে ফেলেছিল। এখন তারা যুদ্ধের জন্য হাইড্রোজেন বোমা তৈয়ার করছে। এটা তো আর এটম বোমার চেয়ে শক্তিশালী বেশি না, তবে এটম বোমার ধ্বংস দেখা যায়, আর এ বোমা মারার পরে আস্তে আস্তে জনসাধারণ নানা রকম রোগে আক্রান্ত হয়।

Scanned with CamScanner

যাক বাবা, আমেরিকার বিরুদ্ধে সত্যকথা লিখে বিপদে পড়তে চাই না, কারণ আজ আমেরিকা পাকিস্তানের 'একমাত্র বন্ধু' এক মুসলিম লীগের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বলেই প্রত্যেক বৎসর জেল খাটি। আবার এদের বিরুদ্ধে বলে কি ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলবো? দরকার নাই বাবা আর যা দেখেছি তাই লেখি।

আগামী দিন সকালেই আমাদের পিকিং ছাড়তে হবে, আমরা তিয়ানজিং রওয়ানা হবো। সন্ধ্যায় আমার দোভাষী মিস ফু-কে ডেকে বললাম, যাবার ব্যবস্থা ঠিক হয়েছে কি না? মিস ফু বললেন, কাল সকালে আপনারা ট্রেনে তিয়ানজিং যাবেন, মাত্র ৫ ঘণ্টা লাগবে। আমরা একটা দল ঠিক করেছিলাম। সে দলটির নেতা পীর মানকী শরীফ, খান গোলাম মহম্মদ খান লুন্দখোর, সিন্ধুর জি এম সৈয়দ, ইলিয়াস, আমি ও আরও অনেকে—বলতে পারেন নন-কম্যুনিস্ট দল।

যাবার আগের দিন সন্ধ্যায় মাহবুবের বাসায় যাই। সকলের সাথে বিদায় নিতে হবে। আমাদের রাষ্ট্রদূতের অফিসের অনেকের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। মাহবুবের স্ত্রী তো ভেবেই অস্থির। বেচারির চেহারার অবস্থা দেখে খুবই দুঃখ হলো। বোধহয় দূরদেশে থাকে, আমাদের পেয়েছিল—ছাড়তে ইচ্ছা হয় না খুব শীত পড়েছে। আমার গরম কাপড় বেশি নাই দেখে বেচারি তার স্বামীর সমস্ত কাপড় বের করে আমাকে বললেন, "মুজিব ভাই যে কাপড় আপনার গায়ে লাগবে, নিয়ে যান।" আমি বললাম, মাহবুব আমার চেয়ে লম্বায় প্রায় ৪ ইঞ্চি ছোট ওর কাপড় আমার লাগবে কেন? সে কি আর শোনে, এটা গায় দেওয়ায় ওটা গায় দেওয়ায়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল একটাও লাগে না। বেচারির মুখ কালো হয়ে গেল। যাহোক, না খেয়ে আর আসতে দিবে না। যাই খেয়ে নিলাম ওখানেই। তারপর বিদায়ের পালা। মাহবুবের স্ত্রী তো কেঁদেই ফেললো। আমাকে বললো, আমাকে পৌঁছার সংবাদ দিবেন। আমরা একসাথে ফটো তুলেছিলাম তা আমাকে পাঠিয়ে দিবে বলে কথা দিলো। আমিও দেশে এসে চিঠি দিয়াছিলাম, আর উনিও দয়া করে ফটো পাঠিয়ে দিয়াছেন।

ফিরে এসে একটা দু'টার বেশি চিঠি লেখি নাই। কারণ মাহবুব চাকরি করে, আর আমি জেল খাটি। ব্যক্তিগত বন্ধুত্বও লীগ আমলে রাখা উচিত না। বিপদের সম্ভাবনা থাকে এজন্য যে সে বেচারা চাকরি করে। কোনো লীগবিরোধী দলের নেতা বা কর্মীর যদি আত্মীয় চাকরি করে, আর সে যদি

Scanned with CamScanner

খুব ভালো, সত্যবাদী কর্মচারীও হয়, তবু তার ওপরও অত্যাচার করার নজির লীগ আমলে আছে। তাই ওদের কাছে আর চিঠি লেখি নাই।

বড় কষ্ট হলো ওদের কাছ থেকে বিদায় নিতে। কী করবো, দেশে ফিরে যে আসতেই হবে! যে দেশের মা-বোনরা না খেয়ে মরে সেই আমার জন্মভূমিতে।

রাত ৮টায় হোটেলে ফিরে এলাম। সেখানে একটা গানের জলসা ছিল—বসে গান শুনলাম, নাচ দেখলাম। তারপরে রুমে যেয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। সকালে উঠে হাতমুখ ধুয়ে নাস্তা খেয়ে প্রস্তুত হলাম। সকলের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। পিকিং শান্তি কমিটি বহু উপহার দিয়াছিল, সেগুলি সব বাক্সের ভিতর ঠিকঠাক করে নেওয়া হলো। ৪টার সময় গাড়ি হাজির, আমরা রেলস্টেশনে গেলাম; যেয়ে দেখি চীন জাতীয় সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী মি. বোরহান শহীদ, প্রফেসর হালিম ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ আমাদের বিদায় সংবর্ধনা দেবার জন্য উপস্থিত। আমরা তাঁদের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। বোরহান শহীদ ও প্রফেসর হালিম আমাকে বললেন, দেশে সকলকে আমাদের কথা বলবেন। আমাদের শুভেচ্ছা রইলো। নয়াচীন সরকার জনগণের সরকার। আমরা খুব সুখেই আছি।

আমরা যথারীতি বিদায় নিয়ে গাড়িতে উঠে পড়লাম বোরহান শহীদ চীনের মুসলমানদের পক্ষ থেকে আমাদের একটা বই উপহার দিলেন। তার মধ্যে মুসলমানদের মসজিদ, স্কুল, কলেজ ও অনেক বিষয়ের ফটো আছে আমার মনটা সত্যই খুব খারাপ লাগলো। এদেশের লোকের মনে অহংকার নাই। সকলকেই আপন করতে চায়। সকলেই মনে করে 'রাষ্ট্র আমাদের', একে গড়ে তুলতে হবে। গাড়ি ছেড়ে দিলো। আমরা অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলাম। মনে হলো সকলেই আমার মতো বেদনা অনুভব করছে।

আমরা তিয়ানজিং শহরে পৌঁছলাম, তখন বেলা প্রায় ১টা। আমাদের ঐভাবেই সংবর্ধনা করলো এবং ভালো হোটেলে নিয়া গেল। আমরা তাড়াতাড়ি খেয়ে নিলাম, তারপর বেরিয়ে পড়লাম শহর ও শিল্প দেখতে এই শহরটা একটা শিল্পশহর এবং এর কিছু দূরেই একটা বিরাট পোর্ট রয়েছে। এটা চীনের নামকরা শিল্পনগরী। অনেক বড় বড় প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে এখানে বহুদিন থেকে। এবং এর ওপর দিয়া ঝড়-ঝাপটা বহুত গিয়াছে। জাপানিরা এটা দখল করে নিয়েছিল। চিয়াং কাইশেকের হাতেও এ শহর বহুকাল ছিল। কিন্তু

Scanned with CamScanner

কেউই যুদ্ধে হেরে শহর ত্যাগ করে যাওয়ার সময় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে ধ্বংস করে যায় নাই। জাপানি অধিকারের সময় কিছুটা ক্ষতি হয়েছিল, তবে খুব বেশি না। এখানে কাপড়ের সুতা, লোহা, ঔষধের বহু শিল্প প্রতিষ্ঠান আছে। শ্রমিকদের জন্য ভালো ভালো থাকার বাসস্থান করা হয়েছে। আলাদা হাসপাতাল করা হয়েছে আমরা শ্রমিকদের জন্য যে হাসপাতাল করা হয়েছে সেটা দেখতে যাই। এই হাসপাতালটা ঠিক করতে ২ বৎসর লেগেছে। আমি যখন দেখি তখন কিছু কিছু কাজ বাকি আছে। আমাকে বললো, আরও তিনমাস সময় আমাদের লাগবে। আমরা প্রত্যেক কামরা দেখেছি সাধারণ ব্যারাম থেকে আরম্ভ করে কলের ও বসন্ত ডিপার্টমেন্ট দেখলাম। আমাদের একজনের দাঁতের বেদনা হয়েছে। আমরা সামান্য অপেক্ষা করে তার দাঁতটা দেখিয়ে নিলাম। ঔষধ লাগিয়ে দিলো এবং কিছু ঔষধ সাথে দিয়া দিলো। দাঁতের রোগটা ভালো হয়ে গেল দুই-তিন দিনের মধ্যে। আমরা কয়েকটা শিল্প প্রতিষ্ঠান দেখতে গেলাম। সেদিন শ্রমিকদের ছুটির দিন, কারখানা বন্ধ। সপ্তাহে একদিন শ্রমিকরা ছুটি পায়। এখানে একজন রাশিয়ার Expert-কে দেখতে পাই। ইনি লোকাল শিল্প প্রতিষ্ঠানকেও শিল্পের যাতে উন্নতি হয় তার পরামর্শ দেন। আমরা সন্ধ্যার পরে ফিরে আসি হোটেলে। বেশি সময় এখানে ছিলাম না। শিল্প সম্বন্ধে আমি পরে আলোচনা করবো। রাতে আমরা হোটেলে রইলাম। খুব ঠান্ড বলে ১০টার পরে আর বের হতে পারলাম না।

এখানকার শান্তি কমিটি আমাদের একটা ভোজ দিলো আর সেই সঙ্গে কিছু জিনিসপত্র উপহার। চীনে খাওয়া আর উপহার এটা আপনাদের গ্রহণ করতেই হবে। আমাদের পক্ষ থেকে পীর সাহেব ধন্যবাদ দিলেন। এখানে জামে মসজিদের ইমাম সাহেব, আমাদের যে ভোজসভা দেওয়া হয়েছিল—সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ছোটখাটো লোকটা, মাথায় টুপি, অল্প কয়েকগাছা দাড়ি, চীনা প্যান্ট কোট পরা। 'আস্‌সালামু আলাইকুম' দিয়া উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি পীর সাহেবের পাশে বসলেন। ফারসি জানেন, দু'জনেই ফারসিতে আলাপ করলেন। কী আলাপ করলেন তখন বুঝতে পারলাম না। পরে পীর সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি বললেন, অনেক কথা বললো। তার মধ্যে মূল কথাটুকু হলো যে, ধর্ম কাজে এরা কোনো বাধা দেয় না। আমরা আমাদের ইচ্ছামতো নামাজ রোজা করতে পারি। ছেলেমেয়েদের কোরআন হাদিস পড়াতে পারি, কোনো অসুবিধা নাই। আমি বললাম, তাহলে আমরা যা শুনেছি তা মিথ্যা। পীর সাহেব হেসে বললেন, "সত্য মিথ্যা খোদা জানেন"।

Scanned with CamScanner

পরদিন সকালে আমরা নানকিং রওয়ানা হলাম। নানকিং শহর চীনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শহর। পূর্বে এটা চিয়াং সরকারের সময় রাজধানী ছিল। শহরটা অনেক পুরাতন এবং অনেক স্মৃতি এর সাথে জড়িত। এখানে চীনের জাতীয়তাবাদী নেতা সান ইয়াৎ-সেনের কবর আছে। চীনারা একে পুণ্যস্থান বলে মনে করে। বহু রাস্তা ঘাট পার হয়ে আমরা নানকিং-এ পৌছলাম। আমাদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে যাওয়া হলো হোটেলে। আমরা খেয়ে বিশ্রাম নিলাম, কারণ রাতে সেখানে পৌছেছি।

সকালে আমরা বের হলাম দর্শনীয় স্থান দেখতে–যা দেখার যোগ্য। প্রথমেই আমরা গেলাম চীনের জাতীয়তাবাদী নেতা সান ইয়াৎ-সেনের কবর দেখতে এবং তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে। আমরা ফুল কিনে নিলাম। সকলে তাঁর কবরে ফুল দিলাম। কবরটা শহর থেকে ২/৩ মাইল দূরে। অনেক উঁচু করে পাহাড়ের উপর কবরটা দেওয়া হয়েছে। প্রায় ২ শত সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠতে হয় চারিদিকে ফুলের বাগান ছোট ছোট গাছ প্রায় ১ মাইলের ভিতর বাড়ি ঘর নাই। উপরে দাঁড়াইয়া এত সুন্দর মনে হয় যে তা ভাষায় প্রকাশ করা আমার পক্ষে কষ্টকর। কারণ আমি লেখক নই; অনুভব করতে পারি মাত্র, লেখার ভিতর দিয়া প্রকাশ করার মতো ক্ষমতা খোদা আমাকে দেন নাই। আমরা অনেকক্ষণ সেখানে রইলাম, তারপর তাঁর মৃত আত্মার জন্য শান্তি কামনা করে বিদায় হলাম। মনে হলো সারাদিন যদি ওখানে থাকতে পারতাম তবে প্রাণভরে সেই প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখতে ও উপভোগ করতে পারতাম।

ওখান থেকে একটা কৃষি ফার্ম দেখতে গেলাম। চীন সরকার কৃষির উন্নতি করছে–মাথাভারী ব্যবস্থার ভিতর দিয়া নয়, সাধারণ কর্মীদের দিয়া। বিরাট ফার্ম, সেখানে বীজ তৈয়ার করা হয় এবং দেশের ভিতর সেই ভালো বীজ ব্যবহার করার জন্য পাঠানো হয়। কৃষি শ্রমিকদের সুবিধাও অনেক। আমাদের দেশের সরকারি কৃষি ফার্মগুলিতে আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি হয় মাথাভারী ব্যবস্থার ফলে। বিরাট জায়গা নিয়ে এই ফার্মটা করা হয়েছে। সেটা দেখার পরে অনেক পুরানো স্মৃতি আমাদের দেখালো। আমার কিন্তু পুরানো আমলের ভাঙা বাড়ি দেখার ইচ্ছা ছিল না। কারণ আমি দেখতে চাই কৃষির উন্নতি, শিল্পের উন্নতি, শিক্ষার উন্নতি, সাধারণ মানুষের উন্নতি। তবু মাঝে মাঝে দেখতে হয়। কারণ অনেক স্মৃতির সাথে পুরানো আমলের মুসলমান সম্রাটদের স্মৃতি জড়িত আছে। মোগল পাঠান আমলের যে সব স্মৃতি আমরা

Scanned with CamScanner

দেখতে পাই আগ্রা, আজমীর, দিল্লী, ফতেপুর সিক্রি, সেকেন্দ্রা, লাহোরে– তার সাথে চীনের অনেক পুরানো কারুকার্যের মিল আছে।

নানকিং শহর নদীর পাড়ে। এখানে জাহাজে করে প্যাসেঞ্জার ট্রেন পার করা হয়। নামতে হয় না প্যাসেঞ্জারদের। ট্রেনটা এপার থেকে জাহাজে ওপারে চলে যায় আমরা দেখতে পেলাম। পীর সাহেব ও পশ্চিম পাকিস্তানের ভাইরা নদীর পাড়, বিরাট নদী, নদীর পাড়ে কারখানা, নদীর ঢেউ দেখতে ভালোবাসে। কারণ পাঞ্জাব ও সীমান্তের ভাইদের কপালে এ সমস্ত কম জোটে। আমরা পূর্ব বাংলার লোক নদীর পাড়ে যাদের ঘর, নদীর সাথে যাদের বন্ধুত্ব, ঢেউয়ের সাথে যাদের কোলাকুলি, তারা কি দেখতে ভালোবাসে এগুলি? তাই পীরসাহেবকে বললাম, চলুন, বিশ্ববিদ্যালয় দেখতে যাই। খাবার সময় প্রায় হয়ে এলো। আমরা হোটেলে ফিরে এসে খেলাম, তারপর আবার বেরিয়ে পড়লাম নানকিং বিশ্ববিদ্যালয় দেখতে।

বিশ্ববিদ্যালয় তখন বন্ধ ছিল। ভাইস-চ্যান্সেলর ও কয়েকজন প্রফেসর এবং কিছু ছাত্র–যারা খোঁজ পেয়েছিল, উপস্থিত হয়েছিল। খাওয়ার জোগাড়ও করেছিল খুব। আমরা ক্লাসরুম দেখলাম, বিজ্ঞান শাখা দেখলাম, বিদেশি এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট দেখলাম। আমাদের একটা হলে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে ফুল-ফলে টেবিলটা বোঝাই। প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর আমাদের বক্তৃতায় ধন্যবাদ দিলেন এবং বললেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা কত, প্রফেসর কত, সরকার কীভাবে সাহায্য করছে, কয়টা নতুন ডিপার্টমেন্ট খোলার জন্য দালান করা হতেছে ইত্যাদি। আমরা 'দয়া করে' এসেছি সেজন্য যথেষ্ট কৃতার্থ হয়েছেন। পাকিস্তান ও চীন পাশাপাশি দাঁড়াইয়া শান্তি প্রতিষ্ঠিত করুক। দুনিয়ায় শান্তি কায়েম হউক ইত্যাদি অনেক কিছু বললেন।

আমাদের দলনেতা পীরসাহেব বক্তৃতা করলেন : "আমরা পাকিস্তানি, ইসলাম ধর্মে অধিকাংশ লোক বিশ্বাসী, ইসলাম অর্থ শান্তি, আমরাও চাই দুনিয়ায় শান্তি কায়েম হউক। অত্যাচার, অবিচার দুনিয়া থেকে মুছে যাক। আমরা যে স্নেহ ও ভালোবাসা আপনাদের কাছ থেকে পেলাম তা কখনও ভুলবো না। যে কষ্ট করে আপনারা আমাদের সকল কিছু দেখালেন, সে জন্য আমি আমার ডেলিগেটদের পক্ষ থেকে আপনাদের অশেষ ধন্যবাদ জানাই। পাক-চীন বন্ধুত্ব কায়েম থাকুক।" পীর সাহেব উর্দুতে বললেন, সীমান্ত আওয়ামী লীগের সম্পাদক ফজলুল হক সায়েদা, যিনি তা ইংরেজি করে দিলেন।

Scanned with CamScanner

ভাইস চ্যান্সেলর চীনা ভাষায় বললেন, দোভাষী ইংরেজি করে দিলেন। এখানেই আমি দেখলাম যে, দোভাষী যখন ২/১ জায়গায় ভালোভাবে ইংরেজি করতে পারছে না, সেখানে ভাইস চ্যান্সেলর নিজেই ওকে ইংরেজি করে দিচ্ছে। ভদ্রলোক ভালো ইংরেজি জেনেও ইংরেজি বলেন না। জাতীয় ভাষায় কথা বলেন। আমরা বাঙালি হয়ে ইংরেজি আর উর্দু বলার জন্য পাগল হয়ে যাই। বলতে না পারলেও এদিক ওদিক করে বলি।

আমরা যখন ইউনিভার্সিটি দেখা শেষ করে বিদায় নিলাম, রাস্তার বড় ছেলেমেয়ে, ছোট ছোট ছেলেমেয়ে—প্রায় সকলেই ছাত্র, আমাদের 'হোপিন ওয়ানশোয়ে' বলে বিদায় সংবর্ধনা জানালো। আমরা 'দুনিয়ায় শান্তি কায়েম হউক' বলে বিদায়ের উদ্যোগ নিতেই, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা আমাকে জড়িয়ে ধরলো। কারণ, ওদের আমি একটু ঠাট্টা করেছিলাম, মুখ ভেঙচিয়া দিয়াছিলাম। ওরা মনে করলো, 'পেয়েছি মনের মতো লোক।' তাই আমাকে জড়িয়ে ধরলো। আমি ওদের সাথে কিছু খেলা করে রওয়ানা হলাম। আমার বন্ধু-বান্ধবরা আগেই গাড়িতে উঠে বসে রয়েছে। মনে মনে বিরক্ত হলো বলে আমার মনে হলো। কিন্তু কী করবো? ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের আনন্দময় সঙ্গ যেন হুট কর ছেড়ে আসা যায় না, আর আমার স্বভাবও সে রকম না। ছেলেমেয়েদের সাথে মিশতে আমি ভালোবাসি।

পরে আরও কয়েকটা ভালো ভালো জায়গা, এবং বাজারের অবস্থা দেখে আমরা রাতে হোটেলে ফিরে এলাম। শহরবাসীর পক্ষ থেকে আমাদের খাওয়ার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। মেয়র ও বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি যথাসময়ে উপস্থিত হলেন। আমরা আমাদের জায়গামতো ঠিক হয়ে বসলাম। আমি কখনই পীর সাহেবের টেবিলে বসতাম না, কারণ বড় বড় নেতারা সেখানে তাঁর কাছে বসবেন। কিন্তু তিনি আমাকে সকল সময় তাঁর পাশে বসতে অনুরোধ করতেন। আমি তাঁকে একদিন বুঝাইয়া দিলাম যে, আমার আলাদা টেবিলে বসা উচিত। কারণ আমি সাধারণ লোকদের কাছে বসলে বেশি কিছু জানতে পারবো। তাদের কাছে ওকালতি করে কিছু বের করতে পারবো। সত্য কথা বলতে কি আমি সকল সময় তাদের দোষত্রুটি ধরবার চেষ্টা করতাম। তাদের কাছ থেকে কথার পর কথা জিজ্ঞাসা করে কিছু বের করতে চেষ্টা করেছি।

খাবার আগে যথারীতি বক্তৃতা শুরু হলো। শহরবাসীর পক্ষ থেকে মেয়র বক্তৃতা করলেন। আমাদের পীর সাহেব উত্তর দিলেন। বক্তৃতার বিষয় আর লেখলাম না। কারণ উপরে আরও দুই একটাতে কিছু কিছু লিখেছি, তাতেই

Scanned with CamScanner

আপনারা বুঝতে পারবেন। একই কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলা ছাড়া উপায় নাই। পীর সাহেব আমাকে ডেকে বললেন, "কিছু বলো।" আমি বললাম, "মাফ করবেন। বিদেশে কী বলতে কী বলে ফেলি ঠিক নাই আমার বক্তৃতার কাজ নাই। মনে মনে ভাবি পল্টন ময়দান হলে, আমি পারি।" অনেক কষ্টে বক্তৃতা দেওয়ার লোভটা কাটাইয়া উঠলাম। আমাদের পরে অনেক জিনিস উপহার দেওয়া হলো। চীনের লোক শুধু উপহার দেয়ার জন্য ব্যস্ত। এত ভদ্রতা এই জাতটার—আগে জানতাম না।

পরের দিন আমরা সাংহাই রওয়ানা হলাম। সাংহাই শহর দুনিয়ার দ্বিতীয় শহর নামে পরিচিত লোকসংখ্যা ৬০ লক্ষ। চীনের শ্রেষ্ঠ শহর। আমরা এখানে দুইদিন থাকবো। বহু পথ ঘাট পার হয়ে আমরা সাংহাই পৌছলাম। আমাদের শ্রেষ্ঠ হোটেল কিংকং-এ রাখা হলো। প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা রুম। ওখানে যেয়ে আমরা ভারতীয় ডেলিগেট কয়েকজনকে পেলাম, তার মধ্যে মি. ফরিদীর সাথে আমার খুব ঘনিষ্ঠতা হলো। মি. ফরিদী আমাদের পূর্ব বাংলার বার্মা শেলের জেনারেল ম্যানেজার মি. ফরিদীর ভাই। দুইজনই 'ফরিদী' নামে পরিচিত। তিনি আমাকে বললেন, "শীঘ্রই আমি ভাইয়ের কাছে ঢাকায় যাবো।" আমি তাঁকে অনুরোধ করলাম, যখন যাবেন আমাকে দয়া করে খবর দিবেন। আমার ঠিকানা পেতে বেশি অসুবিধা হবে না।" আওয়ামী লীগের অফিস-ঠিকানা তাঁকে দিয়াছিলাম। ফেরার পথে আমরা একসাথেই হংকং পর্যন্ত এসেছিলাম।

সাংহাইতে দেখার জিনিস অনেক আছে। আমরা প্রোগ্রাম ঠিক করে নিয়ে সকাল সকাল বেরিয়ে পড়লাম। প্রথমেই আমরা দেখতে গেলাম চীনের বড় এক কাপড়ের কল। চীনারা দাবি করে এই কলটা এশিয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আমি জানি না বলে মতামত দিতে পারবো না, তবে খুব বড় কারখানা সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নাই। দেখতে প্রায় তিন ঘণ্টা সময় লেগেছিল। এই মিলটা একটা কোম্পানির, ম্যানেজিং ডিরেক্টর সমস্ত কিছু দেখাশোনা করেন। আমরা যে শুনেছিলাম, চীনে সমস্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, এটা দেখে তা মিথ্যা প্রমাণিত হলো।

মালিক ও শ্রমিকদের পক্ষ থেকে আমাদের সংবর্ধনা জানানো হলো। ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি পাশাপাশি বসেছেন। যিনি শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি তিনিও একজন শ্রমিক। মিলগুলি জাতীয়করণ না করেও এমন বন্দোবস্ত করা হয়েছে যে, ইচ্ছামতো লাভ করা চলে না। সরকারকে

Scanned with CamScanner

হিসাব দাখিল করতে হয়। যে টাকা আয় হবে তা শ্রমিকদের বেতন, তাদের বাসস্থানের বন্দোবস্ত, চিকিৎসার ব্যবস্থার জন্য ব্যয় করতে হবে। আর যা বাঁচবে তা দিয়ে মিলের উন্নতি করতে হবে। আর যারা মালিক তাদের লভ্যাংশের কিছু অংশ দেওয়া হয়।

শ্রমিক নেতৃবৃন্দ ও মালিকদের একমত হয়ে এসব ঠিক করতে হয় আমরা দেখে আনন্দিত হলাম, মেয়ে শ্রমিকরা যখন কাজে যায় তখন তাদের ছেলেমেয়েদের দেখাশোনা করার জন্য মিলের সাথে নার্সিং হোম আছে। কাজে যাওয়ার সময় ছেলেমেয়েদের সেখানে দিয়ে যায় আর বাড়ি যাবার সময় নিয়ে যায়। যে-সমস্ত শ্রমিক বিবাহ করে নাই তাদের জন্য বিরাট বিরাট বাড়ি আছে। সেখানে আমাদের দেশের ছাত্ররা যেমন এক রুমে তিন চার জন থাকে, তেমনি অবিবাহিত যুবকরাও থাকে। যুবতিদের জন্যও একইরকম ব্যবস্থা আছে। একটা দালানে মেয়ে শ্রমিকরা থাকে, তাদের বাড়িটা আমরা দেখতে গেলাম। এক রুমে তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সিট দেখলাম। অনেক ঘরে আবার ট্রেনের প্রথম শ্রেণির ওপরে নিচে যেমন সিট থাকে তেমনিই আছে। বলতে পারেন কোনোমতে চলে যায়, তবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আছে।

শ্রমিকদের জন্য আলাদা হাসপাতাল আছে। অসুস্থতার সময় বেতনসহ ছুটি দেওয়া হয়। বৎসরে তারা একবার ছুটি পায়। যারা বাড়ি যেতে চায় তাদের বাড়িতে যেতে দেওয়া হয়, আর যারা স্বাস্থ্যনিবাসে যেতে চায় তাদেরও ব্যবস্থা করা হয়। শ্রমিকদের ছেলেমেয়েদের জন্য স্কুল আছে।

মিলটা দেখে যখন আমরা বিদায় নিবো তখন শ্রমিক ও মালিকদের পক্ষ থেকে আমাদের জন্য একটা সভার আয়োজন করা হলো। ম্যানেজিং ডিরেক্টর বক্তৃতা করলেন, শ্রমিক প্রতিনিধিও বক্তৃতা করলেন। তারা উভয়েই বললেন, "আমরা শ্রমিক ও মালিক পাশাপাশি দেশের কাজ করছি। মিলটা শুধু মালিকের নয়, শ্রমিকের ও জনসাধারণেরও। আজ আর আমাদের মধ্যে কোনো গোলমাল নাই। আমরা উভয়েই লভ্যাংশ ভাগ করে নেই। শ্রমিকের স্বার্থও আজ রক্ষা হয়েছে, মালিকের স্বার্থও রক্ষা হয়েছে। চিয়াং কাইশেকের আমলে আমাদের মধ্যে তিক্ততা ছিল। মাঝে মাঝে মিল বন্ধ রাখা হতো। আমাদেরও ক্ষতি হতো আর শ্রমিকদেরও ক্ষতি হতো।" এখানে পীর সাহেব বক্তৃতা করলেন। আর আমাকে বললেন, কিছু বলতে। বাধ্য হয়ে আমিও কিছু বললাম, তাদের ধন্যবাদ দিলাম। বললাম তারা যে সুখে আছে সে জন্য আমরা খুবই সন্তুষ্ট। আমাদের যে দেখতে সুযোগ দেওয়া হয়েছে তার জন্যও

Scanned with CamScanner

তাদের ধন্যবাদ দিয়ে চা, ফলফলাদি খেয়ে আমরা বিদায় নিলাম। আমাদের দোভাষী চীনা ভাষার বক্তৃতা বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।

আমরা হোটেলে ফিরে এলাম। দুপুর বেলা খেয়ে আবার বেরিয়ে পড়ি, শ্রমিকদের জন্য যে কলোনি করা হয়েছে তা দেখবার জন্য। দু'মাইল লম্বা বিরাট কলোনি করা হয়েছে, আরও অনেকগুলি হচ্ছে। তার মধ্যে স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল করা হয়েছে। আমরা যখন গেলাম তখন স্কুল চলছিল। একটা ক্লাসে ঢুকলাম, ছেলেমেয়েরা দাঁড়িয়ে আমাদের সম্মান দেখালো। আমরা ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হাসপাতাল দেখতে গেলাম।

তারপর গেলাম শ্রমিকদের বাজার দেখতে। যাবতীয় মালপত্র সেখানে আছে, দাম করতে হয় না। যার যা প্রয়োজন টাকা দিয়ে নিয়ে চলে আসে। দেখলাম, বহুলোক বাজার করছে। পুরুষ মেয়ে একসাথেই বাজার করে, জিনিসপত্র বিক্রি করে। সে দেশে পুরুষ কাজ করে আর মেয়েরা বসে খায় না। পুরুষ ও মেয়ে সমান, এই তাদের নীতি। হাজার হাজার শ্রমিক পুরুষ ও শ্রমিক মেয়ে রয়েছে। প্রায়ই শ্রমিকদের মধ্যেই বিবাহ হয়। বিবাহ হলেই তারা থাকার মতো বাড়ি পায় এবং কিছু দিনের জন্য ছুটি পায় আমোদ করার জন্য। তারপর আবার কাজ শুরু করে। বিবাহের পরেই যদি ছুটি দিতে না পারে তবে একসাথে বৎসরের ছুটির সময় দিয়া দেয়। আমরা শ্রমিকদের ছেলেমেয়েদের খেলার মাঠে গেলাম। দেখলাম বহু ছেলেমেয়ে খেলছে, তাদের সাথে মাস্টারও আছেন। আমি যেই সেখানে গেলাম আর যায় কোথায়! শুরু হলো স্লোগান। আমার ক্যামেরা দিয়া যখন ফটো নিতে চাইলাম তখন সমস্ত ছেলে মেয়েরা লাইন বেঁধে দাঁড়াইয়া গেল। কেউ কেউ সামনে দাঁড়াবার জন্য চেষ্টা করছে যাকে বলা হয় ঠেলাঠেলি করে আগে আসা।

তারপর নতুন বাড়িগুলি দেখতে লাগলাম। আমার একটা খেয়াল হলো, শুধু ওপরে ওপরে দেখা না, একটু ভিতরে দেখতে হবে। ইলিয়াস, ফজলুল হক সাহেদা আর আমি একসাথে ছিলাম। আর পীর সাহেব ও অনেকে অন্য দলে ছিলেন। আমি কলোনির একটি বাড়ির কাছে যেয়ে আমাদের দোভাষীকে বললাম, "দেখুন এ বাড়ির ভিতরটা আমরা দেখতে চাই।" পূর্বে যদি বলতাম, বাড়ির ভিতর দেখব তবে কোনো একটা ঘর ঠিকঠাক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে রাখতো হয়তো। তাই আগে কিছুই বলি নাই।

দোভাষী আমাকে বললেন, "একটু দয়া করে আপনারা বাইরে দাঁড়ান, আমি ভিতরে খবর দিয়ে আসি।" কথা ঠিক, কারণ যার বাড়ি যাবো তাকে খবর না

Scanned with CamScanner

দিয়ে ঢুকে পড়ি কী করে? কয়েক মিনিটের মধ্যে ফিরে এলেন এবং আমাদের নিয়ে ভিতরে গেলেন। যাবার সময় দোভাষী মিস লী আমাদের বললেন, দেখুন যে বাড়িতে আমরা যাচ্ছি সে বাড়ির পুরুষ কারখানায় কাজ করতে গেছে, তার স্ত্রী আছেন। এদের দু'জনের ৩/৪ দিন হলো বিবাহ হয়েছে। দু'জনেই শ্রমিক। আমরা বললাম যে, তা হলে বিয়ে বাড়িতে এলাম! বলতে বলতে ঢুকে পড়লাম। ভদ্রমহিলা আমাদের সাদরে গ্রহণ করলেন। আমাদের বসতে দিলেন ঘরটা দেখে আমাদের বিশ্বাস হতে চায় না। কারণ, শ্রমিকদের থাকবার ঘরে এত ভালো ভালো আসবাবপত্র। একটা খাট, একটা টেবিল, দুইখানা চেয়ার, একটা আলমারি, কয়েকটা বাক্স। একটা চেয়ার কম ছিল বলে একটা মোড়া এনে দিলো।

ভদ্রমহিলা লাজুক হয়ে পড়েছেন, কারণ তার স্বামী বাড়িতে নাই। দুঃখ করে বললেন, আপনারা এলেন আমাদের গরিবের বাড়িতে আমি কী করবো কিছুই তো বাড়িতে নাই? কাকে দিয়ে আনাই। তারপর আমাদের জন্য চিং চা বানাইয়া দিলেন। ওটা চীনাদের সকল বাড়িতেই থাকে। আমরা চা খেতে খেতে আলাপ করলাম। তাদের সংসার খুব সুখের হবে বলে আশা করেন বিবাহের কথা যখন ট্রেড ইউনিয়নকে জানিয়েছিল তখনই তারা এই ঘরটা দিয়েছে। কয়েকদিন হলো এ ঘরে তারা এসেছে। এখনও ভালো করে সংসার পাততে পারে নাই। আমার তো শ্রমিকের ঘরের আসবাবপত্র দেখে একটু আশ্চর্যবোধ হলো। কারণ, আমাদের দেশের শ্রমিকদের যে অবস্থা তাহা কল্পনা করলে আর ওদের অবস্থা দেখে আশ্চর্য হওয়া ছাড়া উপায় কী?

আমরা এক মুশকিলে পড়ে গেলাম, বিবাহ বাড়িতে গিয়েছি কিছু উপহার না দিয়ে কী করে ফিরে আসি আমাদের এত যত্ন করেছে চীনের জনসাধারণ, খাওয়া-দাওয়া থাকা যাবতীয় বন্দোবস্ত করেছে আমাদের। ইলিয়াসকে জিজ্ঞাসা করলাম, তোর কাছে কিছু আছে? বললো, না। ফজলুল হককে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার কাছে কিছু? বললো, না। একটু সুবিধা ছিল বাংলা ও উর্দুতে কথা বললে বোঝার উপায় নাই। আমি ভাবছিলাম, হঠাৎ আমার হাতের দিকে খেয়াল পড়লো—দেখি আমার তো একটা আংটি আছে। আমি খুলে সেই শ্রমিকের স্ত্রীকে উপহার দিলাম। দোভাষীকে বললাম, পরাইয়া দিতে। কিছুতেই গ্রহণ করতে চায় না, তারপর নিলো। আমরা ফিরে এলাম

সন্ধ্যার সময় আমরা বাজারে গেলাম কিছু জিনিসপত্র কিনবো। সাংহাই শহরে নিশ্চয়ই জিনিসপত্র সস্তা। সরকারি দোকানে গেলাম, বিরাট চারতলা দালান।

Scanned with CamScanner

যা দরকার সব ওখানেই পাবেন। আমি একটা সুটকেস কিনলাম, কারণ যা উপহার পেয়েছি, তা নিতে হলে একটা সুটকেসের দরকার। কিছু কিছু সস্তা জিনিস কিনলাম। পকেটের অবস্থা তো খারাপ, হংকং-এ কিছু কিনতে হবে। কেনার তো ইচ্ছা না। দাম যাচাই করে দেখা যাক কেমন অবস্থায় আছে দেশটা কম্যুনিস্ট শাসনে।

রাতে ফিরে এলাম হোটেলে। আমাদের জন্য খাওয়ার বন্দোবস্ত করেছে সাংহাই করপোরেশনের সদস্যবৃন্দ। সেখানেও বক্তৃতা হলো। ঐ একই বক্তৃতা। এখানে যথেষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তারা অনেকেই বক্তৃতা করলেন। আমাদের পীর সাহেব তার সাধারণ ভঙ্গিতে বক্তৃতা করে সকলকে ধন্যবাদ দিলেন। আমাদের বহু উপহার মিললো। খাওয়ার পরে বেরিয়ে পড়লাম রাতের সাংহাই শহরের অবস্থা দেখতে। অনেক জায়গা ঘুরলাম, তারপর ফিরে ঘুমিয়ে পড়লাম।

সকালে উঠে ভাবলাম, চুলটা কাটিয়ে নেই। হোটেলেই সেলুন ছিল। বেচারা সেলুনআলা খুবই ভদ্রলোক, ইংরেজি কিছু বোঝে। আমার সাথে আলাপ করলো। এখন পর্যন্ত পাকিস্তানের নাম শোনে নাই। ভারতবর্ষ জানে। তাকে যখন বুঝাইয়া বললাম তখন সে বললো, শুনেছি ইংরেজ চলে যাওয়ার সময় ভারতকে ভাগ করে দুই দেশ করে দিয়ে গেছে, তার নামটা আমার স্মরণ ছিল না। আমার কাছে পরিচয় জিজ্ঞাসা করলো আমার আবার পরিচয় কী? কী বলতে পারি? বললাম, এমনি ঘুরে বেড়াই, দেশ বিদেশ দেখি। মনে মনে বলি, 'আমার আবার পরিচয়? পথে পথে ঘুরে বেড়াই, বক্তৃতা করে বেড়াই। আর মাঝে মাঝে সরকারের দয়ায় জেলখানায় পড়ে খোদা ও রসুলের নাম নেবার সুযোগ পাই। এই তো আমার পরিচয়।'

সেলুনআলাকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "তোমাদের অবস্থা কী? এখন কেমন আছো? নতুন সরকারের ব্যবহার কেমন? কোনো অত্যাচার করে কি না?" বললো, "ভালো আছি, দেশের অবস্থা অনেক পরিবর্তন হয়েছে। চুরি ডাকাতি ভিক্ষা বন্ধ হয়ে গেছে, তবে আমার আয় একটু কম হয়েছে। এখন বিদেশ থেকে খুব বেশি লোক আসে না। আগে অনেক দেশের লোক আসতো, টাকা পয়সা আয় যথেষ্ট হতো। তবে আয় বেশি না হলেও যা আয় হয় তাতে বেশ চলে যায়। কারণ, জিনিসপত্রের দাম স্বাভাবিক। আগে হঠাৎ কোনো জিনিসের দাম বেড়ে গিয়ে সকল টাকা বেরিয়ে যেত ঘর থেকে।" এর বেশি কিছু বলতে চায় না, কারণ বোধ হয়, ভয়।

Scanned with CamScanner

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "নয়া সরকার শহর দখল করবার পরে অত্যাচার করেছে কি না?" বললো, "কিছুটা তো করেছেই—যারা পূর্বে চিয়াং কাইশেকের সাথে হাত মিলাইয়া নিরীহ কর্মীদের ওপর অত্যাচার করেছে তাদের ওপর।" আমি বললাম, "কর্মী কাদের বলেন?" বললেন, "কেন? যারা গরিবের কথা বলতো, অত্যাচারের বিরুদ্ধে কথা বলত, কালোবাজারির বিরুদ্ধে, আমেরিকার বাজারের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের দাবিদাওয়ার কথা বলতো, তাদের কর্মী বলি।" উত্তরটা একটু কড়াভাবেই বললো। আমি বললাম, "যে সমস্ত সরকারি কর্মচারী অত্যাচার করেছে তাদের তো আর পায় নাই?"

আমাকে বললো, "বড় বড়গুলি পালাইয়া গেছে, তবে অনেকগুলিকে পাওয়া গেছিল, তাদের জনগণের কোর্টে বিচার করে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে আর কাউকে কাউকে ছেড়েও দেওয়া হয়েছে।"

আমি বললাম, "যারা অন্যায়ভাবে কালোবাজারি করে ব্যবসা করেছে তাদের কী হয়েছে?" বললো, "অনেকের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে আর অনেককে বিচার করে জেল দিয়েছে।"

আরও কিছু কিছু জিজ্ঞাসা করলাম, কিন্তু উত্তর দিতে চায় না। পট করে আমার দেশের কথা জিজ্ঞাসা করলো। বললাম, "বহু বছর পরাধীন ছিলাম, কয়েক বৎসর হলো স্বাধীন হয়েছি। এখন পর্যন্ত বেশি কিছু করতে পারি নাই, তবে অনেক কিছু করবার পরিকল্পনা হয়েছে। আর সম্ভাবনাও আছে। আশা করা যাইতেছে।"

বেচারা বোধ হয় আমার কথা বুঝতে পারলো না। মাথা নত করে চুপ করে রইল। আমার চুল কাটা হলে যখন বিদায় নিতে চাইলাম, তখন সে আমাকে একটা খাতা বের করে দিয়ে বললো, কেমন চুল কাটলাম লিখে দিয়ে যান। খাতাটা খুলে দেখলাম অনেকেই লিখে দিয়ে গিয়েছেন। অনেক দেশের অনেক নেতা। আমি বললাম, আমার লেখাতে কী হবে, আমি তো নেতা নই। কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায় না, যা হোক লিখে দিতে বাধ্য হলাম। রুমে এসে গোসল করে নিলাম, কারণ, আবার বের হতে হবে। মিউজিয়াম ও লাইব্রেরি দেখতে যাবো।

একটু পরেই দেখি, আমার দোভাষী আমাকে এসে খবর দিলেন, "গাড়ি প্রস্তুত, চলুন।" আমি ইলিয়াস ও দোভাষী মিস লী একই গাড়িতে চললাম। ভদ্রমহিলা খুব ভালো ইংরেজি জানেন এর ইংরেজি পরিষ্কার, সকলেই

Scanned with CamScanner

বুঝতে পারে। অন্য যে সমস্ত দোভাষী আমাদের দেওয়া হয়েছিল, তারা চীনা কায়দায় ইংরেজি বলে বলিয়া বোঝা অনেক সময় কষ্ট হয়।

আমি মিস লীকে জিজ্ঞাসা করলাম, "কোথায় লেখাপড়া করেছেন?" তিনি বললেন, "সাংহাইতে আমেরিকার দ্বারা পরিচালিত কয়েকটা স্কুল ছিল, আমি এর এক স্কুলে লেখাপড়া করেছি।" আরও বললেন, "সমস্ত মাস্টারই আমেরিকান ও ইংরেজ ছিল।" মিস লী এখনও লেখাপড়া করেন। আমাদের দেশের মানে বিএ পড়ছেন। আমি বললাম, আমেরিকানরা তো চলে যেতে বাধ্য হয়েছে, এখন সেখানে কে লেখাপড়া করায়? উত্তর দিলেন, সরকার সমস্ত ভার নিয়েছেন এবং জাতীয়করণ করেছেন। এখন ২/১টা স্কুল আছে যেখানে শুধু ইংরেজি শিক্ষা দেওয়া হয়, আর সব শিক্ষা মাতৃভাষার মাধ্যমে করা হয়। আমি তাকে অনেক প্রশ্ন করলাম, কিন্তু ভদ্রমহিলা শুধু কথা এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করেন।

আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনি কম্যুনিস্ট কি না?" উত্তর দিলেন এক কথায়, "না। তবে যুব সমিতিতে আছি।" আমি বললাম, "ওটা তো কম্যুনিস্টদের দ্বারা পরিচালিত।" বললেন, "হ্যাঁ, কিছুটা।"

আমি তাকে পরিষ্কার ভাষায় প্রশ্ন করলাম যে, "নয়া সরকার গঠন হওয়ার পূর্বে সাংহাইয়ের অবস্থা কী ছিল, এবং এখনই বা কেমন হয়েছে?" এক কথায় উত্তর দিলেন, "এখন অনেক ভালো আছি।"

এখানে একটা বিষয় আলোচনা করা দরকার, চীনা শান্তি কমিটি ও সরকার ঠিক বুঝতে পেরেছিলেন যে, আমরা পাকিস্তান থেকে যারা গিয়াছি তারা কম্যুনিস্ট না এবং কম্যুনিস্ট ভাবাপন্নও না। অনেকে এর মধ্যে কম্যুনিস্ট বিরোধীও আছেন। তাই বোধ হয় প্রাণ খুলে আমাদের সাথে আলাপ করছেন না অনেকেই। ইলিয়াসও মাঝে মাঝে প্রশ্ন করছে। ২/১টা কথার উত্তর মাঝে মাঝে দিয়েছেন।

আমরা মিউজিয়ামে পৌঁছলাম। অনেক নিদর্শন বস্তু দেখলাম। উল্লেখযোগ্য বেশি কিছু দেখেছিলাম বলে মনে হয় না। তবে অনেক পুরানো কালের স্মৃতি দেখা গেল।

পরে আমরা লাইব্রেরি দেখতে যাই। শুনলাম সাংহাই শহরের মধ্যে সকলের চেয়ে বড় পাবলিক লাইব্রেরি। খুবই বড় লাইব্রেরি সন্দেহ নাই, ব্যবস্থাও খুব ভালো। রিডিং রুমগুলি ভাগ ভাগ করা রয়েছে। ছোট ছোট

Scanned with CamScanner

ছেলেমেয়েদের পড়ার জন্যও একটা রুম আছে। সেখানে দেখলাম ছোটদের পড়বার উপযুক্ত বইও আছে বহু, ইংরেজি বইও দেখলাম।

লাইব্রেরির সাথে ছোট একটা মাঠ আছে, সেখানে বসবার বন্দোবস্ত রয়েছে। মাঠে বসে পড়াশোনা করার মতো ব্যবস্থা রয়েছে। আমার মনে হলো কলকাতার ইমপেরিয়াল লাইব্রেরির মতোই হবে। খোঁজ নিয়ে জানলাম, লাইব্রেরিটা বহু পুরানো। চিয়াং কাইশেক সরকারও এর কিছু উন্নতি করেছিল।

সেখান থেকে আমরা অ্যাকজিবিশন দেখতে যাই। আমাদের জন্য বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। নতুন চীন সরকার কী কী জিনিসপত্র তৈয়ার করেছেন তা দেখান হলো। কত প্রকার ইনস্ট্রুমেন্ট করেছে, তাও দেখালো। আমরা ফিরে এলাম হোটেলে।

এক ঘন্টা পরে আবার বেরিয়ে পড়লাম সাংহাই শহরের পাশে যে নদী বয়ে গেছে তা দেখবার জন্য। আমাদের দেশের মতোই নৌকা, লঞ্চ চলছে এদিক ওদিক। নৌকা বাদাম দিয়ে চলে। পরে ছেলেদের খেলার মাঠে যাই, দেখি হাজার তিনেক ছেলেমেয়ে খেলা করছে। শিক্ষকরাও তাদের সাথে আছেন। আমাদের যাওয়ার সাথে সাথে কী একটা শব্দ করলো, আর সকল ছেলেমেয়ে লাইন বেঁধে দাঁড়াইয়া গেল এবং পরে আর একটা শব্দ হওয়ার পরে আমাদের সালাম দিলো, আমরা সালাম গ্রহণ করলাম। তারা স্লোগান আরম্ভ করলো। আমরা বিদায় নিয়ে চলে এলাম।

দোভাষীকে বললাম, "চলুন যেখানে সকলের চেয়ে বড় বাজার, সেখানে নিয়ে চলুন।" সেখানে পৌঁছিয়াই একটা সাইকেলের দোকানে ঢুকলাম। সেখানে চীনের তৈরি সাইকেল ছাড়াও চেকশ্লোভাকিয়ার তৈরি তিন চারটা সাইকেল দেখলাম। তাতে দাম লেখা ছিল। চীনের তৈরি সাইকেল থেকে তার দাম কিছু কম। আমি বললাম, "বিদেশি মাল তা হলে কিছু আছে?" দোকানদার উত্তর দিলো, "আমাদের মালও তারা নেয়"। আমি বললাম, "আপনাদের তৈরি সাইকেল থেকে চেকশ্লোভাকিয়ার সাইকেল সস্তা। জনসাধারণ সস্তা জিনিস রেখে দামি জিনিস কিনবে কেন?"

দোকানি জানায় : আমাদের দেশের জনগণ বিদেশি মাল খুব কম কেনে। দেশি মাল থাকলে বিদেশি মাল কিনতে চায় না, যদি দাম একটু বেশিও দিতে হয়"। সাংহাইয়ের অনেক দোকানদার ইংরেজি বলতে পারে।

Scanned with CamScanner

জিনিসপত্রের দাম বাড়তে পারে না, কারণ জনসাধারণ খুব সজাগ হয়ে উঠেছে। যদি কেউ একটু বেশি দাম নেয়, তবে তার আর উপায় নাই! ছেলে বাপকে ধরাইয়া দিয়েছে। স্ত্রী স্বামীকে ধরাইয়া দিয়েছে, এরকম বহু ঘটনা নয়াচীন সরকার কায়েম হওয়ার পরে হয়েছে। তাই দোকানদারদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার হয়েছে। সরকার যদি কালোবাজারি ও মুনাফাখোরদের ধরতে পারে তবে কঠোর হস্তে দমন করে। এরকম অনেক গল্প আমাদের দোভাষী বলেছে। রাতে হোটেলে ফিরে এলাম। আগামীকাল সকালে আমরা রওয়ানা করবো।

হোটেলে এসে শুনলাম, আমাকে কে বা কারা অনেক খোঁজ করেছেন। আমি ভাবলাম, এদেশে আমায় কে খোঁজ করবে? আরও শুনলাম, তারা চীনদেশীয় লোক। কিছুতেই বুঝতে পারলাম না, ব্যাপার কী? খাওয়ার পরে শান্তি কমিটির সভাপতি আমাকে বললেন, "কাল আপনি যে শ্রমিক মেয়েটিকে আংটি উপহার দিয়েছিলেন, তারা স্বামী-স্ত্রী উভয়ে আপনার সাথে দেখা করতে এসেছিলেন এবং বহুক্ষণ বসে থেকে আমার কাছে এই কলমটা উপহার দিয়া গেছেন। এই কলমটার নাম 'লিবারেশন পেন'। ক্ষমা চেয়ে গেছেন, কারণ তারা থাকতে পারেন নাই, তাদের বিশেষ কাজ আছে। সকালেও একবার এসে গেছেন।" আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, "আমাদের দেশে তো এ নিয়ম নাই যে একজন উপহার দিলে তাকে আর একটা উপহার দিতে হয়।" শান্তি কমিটির সভাপতি বললেন, "এটা চীনদেশ। এদেশের নিয়ম, উপহার দিলে সেই মুহূর্তে যিনি উপহার দিলেন তাকে একটা উপহার দিতে হয়। আপনি চীন দেশে এসেছেন, চীনের নিয়মই আপনাকে মানতে হবে।" আমার খুব লজ্জা হলো। আমি আরও বাধা দিলাম, কিন্তু কিছুতেই শুনলো না। আমাকে শেষ পর্যন্ত গ্রহণ করতে হলো।

যতগুলি উপহার পেয়েছিলাম, তার মধ্যে এইটাই আমার কাছে বেশি মূল্যবান। শ্রমিকের উপহার, দিনমজুরের উপহার, পরিশ্রম করে অর্থ উপার্জন করে তা দিয়ে যে উপহার দেওয়া হয় সেটাই সকলের সেরা এবং মূল্যবান। অর্থ মূল্য দেখে উপহারের বিচার করতে হয় না।

আমরা সাংহাই থেকে ট্রেনে হ্যাংচো যাবো। আমাদের দোভাষী এবং শান্তি কমিটির প্রতিনিধিরা তুলে দিতে আসলো। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এসেছে আমাদের ফুল উপহার দিতে। চীনের যেখানেই যাই শুধু ফুল আর ফুল।

Scanned with CamScanner

ফুলের তোড়া, ফুলের মালা। এত ফুলের দেশ এই চীন, কত রকমের ফুলের মালাই না আমাদের দিয়েছিল। এত ফুল কোথায় পায় বুঝতে পারি না। তবে কি কম্যুনিস্ট দেশেও ফুলের আদর হয়! আগে তো জানতাম না।

ট্রেনে খুব ভিড় ছিল না। আমাদের জন্য রিজার্ভ করা হয়েছিল দুইটা কামরা। প্রত্যেক কামরায় চারটা করে সিট, পাশে আর একটা কামরা ছিল যাতে ভারতের কয়েকজন প্রতিনিধিও ছিলেন। ট্রেনেই আমাদের যাবতীয় খাওয়ার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। ১৩/১৪ ঘণ্টা ট্রেনে থাকতে হবে। আমাদের সাথে দোভাষী ছিল একটা কলেজের ছেলে। কোনোমতে ইংরেজি বলতে পারে। আর কয়েকজন কর্মচারীও ছিল। একজন বড় অফিসার ছিলেন বলে মনে হলো। কিন্তু সাধারণ পোশাক পরা, চেনা কষ্টকর।

আমাদের সীমান্ত আওয়ামী লীগ নেতা খান গোলাম মহম্মদ খান লুন্দখোরকে নিয়ে মাঝে মাঝে মসিবত হতো। বেচারা হুঁকা ছাড়া এক মুহূর্ত চলতে পারে না। আমরা এক কামরায়ই ছিলাম, ঘণ্টায় ঘণ্টায় হুঁকা ধরায় আর এক দুইটা টান দিয়া কাশতে শুরু করে। পূর্ববাংলার লোক এ তামাক খেলে বোধ হয় বেহুঁশ হয়ে পড়বে—এত রাফ। হুঁকাটা ও তামাক তিনি করাচি থেকেই নিয়ে গিয়েছিলেন।

উড়োজাহাজে বসেও তামাক খেতেন, আবার যখন নামতেন ওটা হাতে নিয়েই নামতেন। যেখানে যেতেন হুঁকাটা হাতে নিয়ে যেতেন। সাদা মনের পাঠান, যা কিছু করে সাদা মনে করে। সোজাভাবে চলে, কেউ কিছু মনে করলো কি না, তাতে সে ভ্রূক্ষেপও করতো না। তামাক কমে এসেছিল, একদিন সিগারেট ছিঁড়ে তামাকের পাতার সাথে মিশাইয়া খাওয়া শুরু করলো। কোনো ভাবনা নাই, চিন্তাও নাই। খান সাহেব প্রায় পাঁচ বৎসর সীমান্তে যেতে পারেন না। কারণ, সরকারের হুকুম নাই। তাঁকে কাছুম খানের লীগ সরকার রাজনীতি করার জন্য দেশ থেকে বহিষ্কার করে দিয়েছেন। বহুদিন লাহোরে আছেন। ইংরেজ আমলেও প্রায় ৭ বৎসর জেল খেটেছেন। যাহোক, তার সাথে বহু গল্প করে গান গেয়ে ট্রেনের সময় কাটাতাম। ইলিয়াসের সাথে লুন্দখোরের খুবই খাতির ছিল।

আমরা হ্যাংচো পৌঁছলাম। এখানে আসার আমাদের উদ্দেশ্য হলো কো-অপারেটিভ ফার্মিং দেখবো। এই শহরটা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য সমস্ত চীনের মধ্যে বিখ্যাত একটা স্বাস্থ্য নিবাসও বটে। সত্যই দেখে মুগ্ধ

Scanned with CamScanner

হলাম। একটা বিরাট লেকের চার পার্শ্বে শহরটা। পাশে ছোট ছোট পাহাড়, তার গা ঘেঁষেই বড় বড় বাড়ি গড়ে উঠেছে। লেকের গা ঘেঁষেই আমাদের হোটেলটা। হোটেল থেকে জানলা দিয়ে সমস্ত লেকটাকে দেখা যেতো।

ছোট ছোট নৌকা বিদেশিদের নিয়ে লেকের ভিতর ঘুরে বেড়াচ্ছে। সকলের চেয়ে মধুর হলো যখন চাঁদ উঠলো। আমরা রাত্রেই পৌঁছেছিলাম বলে জ্যোৎস্নায় দেখে নিলাম লেকটাকে। এখানেও দোভাষী একটা পাওয়া গেল। রাতে এসেই আমাদের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন, এই এই জায়গার মধ্যে কোনটা কোনটা আপনারা দেখতে যাবেন? আমরা দেখে ওদের মতামত নিয়ে প্রোগ্রাম করে দিলাম।

সকালেই আমাদের কো-অপারেটিভ ফার্মিং দেখতে নিয়ে গেল। এখানে একটা জমিতে পাটের চাষ দেখলাম। পাটগুলি বড় বড় হয়েছে, কিন্তু জানা গেল আঁশ বেশি ভালো হয় না। চেষ্টা চলছে। কৃষকরা যারা কাজ করে তাদের বাস করার জন্য ভালো ভালো ঘর করা হয়েছে। আমাদের জানালো, আমরা যথেষ্ট উন্নতি করেছি। এখন দেশের লোক এদিকে ঝুঁকে পড়ছে। আমরা আর কয়েকটা জায়গা দেখলাম। বহু দূরে একটা বৌদ্ধ উপাসনাগার দেখতে পেলাম। বহুদিনের পুরানো স্মৃতি। অনেক যত্নে রাখা হয়েছে। হাজার হাজার লোক বৎসরে এখানে উপাসনা করতে আসে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনাদের দেশের লোক কি ধর্মকর্ম করে?" একজন উত্তর করলো, "সকলেই আমরা ধর্ম পালন করে থাকি। আমাদের কেহ বাধা দেয় না। আর নিষেধও করে না, আর নিষেধ করলেই আমরা শুনবো কেন? আমাদের সরকার ধর্মকর্ম করতে কাহাকেও বাধা দেয় না।"

আমরা তাড়াতাড়ি ফিরে এলাম। লেকের পারে একটা পাহাড় ছিল সেখানে উঠলে সমস্ত শহর ও লেকটা দেখা যায়। পীর সাহেব বললেন, আমরা উঠবো। আমি ও পীর সাহেব সেখানে উঠলাম। আস্তে আস্তে সকলেই উঠলো। একটু কষ্ট করে উঠতে হয়। কিন্তু দেখবার মতো জায়গা। দেখে আনন্দে বুক ভরে গেল। মনে হলো এখানে যদি কিছুকাল থাকতে পারতাম, তবে খুবই আনন্দ হতো।

তারপর নেমেই একটা বসার জায়গা—পাহাড় ও লেকের মাঝখানে। আমরা সেখানে কিছু সময় বসলাম, ওখানে ছোট একটা চায়ের দোকান ছিল। চা খেলাম। দাম যখন দিবার চাইলাম, কিছুতেই গ্রহণ করবে না। সেখানে

Scanned with CamScanner

কয়েকটা দোকানে মাছ বিক্রি করে। খাবার মাছ নয়, শৌখিন মাছ। ছোট ছোট কাচের পাত্রে রঙিন মাছগুলি রাখা হয়েছে। এক এক পাত্রে তিন চার রঙের মাছও রয়েছে। ইচ্ছা হলো কিনি, কিন্তু কিনে কী করবো! কোথায় চীন আর কোথায় পূর্ব বাংলা! নিতে যা খরচ হবে তা আমার দেওয়ার ক্ষমতা নাই। আর ভাড়া দিয়া নেবার মতো টাকাও নাই। রাখার মতো বাড়ি নাই। আর দেখভাল করার মতো লোকও আমার নাই। কারণ সকল জিনিসেরই জন্য টাকার প্রয়োজন। ওইটার অভাবই আমার বেশি।

অনেকক্ষণ গাছের ছায়ায় চেয়ারে বসে লেকের সৌন্দর্য দেখতে লাগলাম। পরে রওয়ানা করতে বাধ্য হলাম। কারণ, খেয়েই আমরা নৌকায় বেড়াতে বের হবো, সন্ধ্যা পর্যন্ত বেড়াবো। আমাদের মধ্যে কয়েকজন নৌকা ভাড়া করে ওখান থেকেই সোজা হোটেলের দিকে রওয়ানা করলো। আমরা মোটরে আরও দু'একটা জায়গা দেখে হোটেলে যাবো। বারোটায় আমরা হোটেলে পৌছলাম। তাড়াতাড়ি খেয়ে নৌকায় উঠলাম ছোট্ট ছোট্ট নৌকা, দু'জনে বইঠা বায় দাঁড় টানার মতো করে। মেয়েরাই নৌকা চালায় ওদেশে।

আমাদের জন্য চারখানা নৌকা ঠিক হলো। নৌকার ভিতরে চারজন করে বসতে পারে। মোটর গাড়ির মতো গদি দেওয়া বসবার জায়গা। আমাদের সাথে চা, ফল-ফলাদি কিছু নেওয়া হয়েছিল। নৌকা ছাড়া হলো। আমাদের মধ্যে অনেকে নৌকা বাইবার জন্য ব্যস্ত হয়ে গেল। অনেকে চেষ্টা করলো দাঁড় টানতে, হাল ধরতে, কেউই ঠিকমতো নৌকা বাইতে পারে না। শেষ পর্যন্ত আমি বললাম, "তোমরা বালুর দেশের লোক, নৌকা বাইবা কী করে? ঘোড়া দাবড়াতে পারো।"

আমার নৌকায় সামনের যে দাঁড় ছিল, প্রথমে আমি দাঁড়টা টানতে শুরু করলাম। কার নৌকা আগে যায় দেখা যাবে! কেউই পারে না, কারণ আমি পাকা মাঝি, বড় বড় নৌকার হাল আমি ধরতে পারি। দাঁড় টানতে, লগি মারতে সবই পারি। পরে আবার হাল ধরলাম। পাকা হালিয়া—যারা আমাদের নৌকার মাঝি তারা তো দেখে অবাক! এ আবার কোন দেশের লোক! এক মাঝি জিজ্ঞাসা করলো, আপনাদের বাড়ি কোন দেশে? দোভাষী সাথে ছিল, বললাম, পূর্ব পাকিস্তান। মুখের দিকে চেয়ে রইলো। মনে হলো কোনোদিন নামও বোধ হয় শোনে নাই, তাকে বুঝাইয়া বললাম, তারপর সে বুঝলো। তাকে বললাম, আমাদের পানির দেশ, বৎসরে ৬ মাস আমরা পানির মধ্যে বাস করি।

Scanned with CamScanner

মসিবত হলো, ভাষা বোঝে না, কী আর বলবো! চুপ করে রইলাম। এই আনন্দের সময় কি কথা না বুঝলে দোভাষীকে দিয়ে কথা বুঝাইয়া বলা ভালো লাগে? এই লেকের ঠিক মধ্যখানে একটা দ্বীপ আছে। সেখানে দোকান আছে। একটা বৌদ্ধ মন্দির আছে। আর বসবার ভালো ভালো জায়গা আছে। একটা চায়ের দোকানও আছে। বহু বড় বড় গাছ রয়েছে। এই দ্বীপের মাঝখানে আবার একটা পুকুরের মতো আছে। তার ওপর দিয়া পুল দেওয়া আছে। মাঝে মাঝে মাছ দেখতে পাওয়া যায়। এত বড় লেকের ভিতর ছোট্ট একটা দ্বীপ; সেখানে চায়ের দোকান, বসবার ব্যবস্থা, বুঝতেই পারেন কী সুন্দর জায়গাটা। কত ভালো লাগে!

আমাদের যে পাষাণ হৃদয়—যার সাথে সম্বন্ধ নিভৃত কারাগার আর তার পাথরের মতো শক্ত দেওয়ালগুলির। মাঝে মাঝে বাইরে থাকলে পুলিশের লাঠিচার্জ, 'জাতীয় সরকারের' চোখ রাঙানো—সেই আমাদের জীবনেও আনন্দের সঞ্চার হয় এখানে আসলে। অনেকক্ষণ বসে গল্প করলাম। অনেক ইতিহাস এই জায়গার শুনলাম শুনেছি কাশ্মীরের শ্রীনগরে নাকি এমনি লেক আছে। তবে কিছুটা আঁচ করতে পারেন, যদি আজমীর শহরের আনার সাগরে যেয়ে থাকেন। কিন্তু হ্যাংচো'র এই লেকের সাথে এদের কোনো তুলনা হয় না। আমরা নৌকায় উঠলাম, চললো সামনের দিকে, সেখানে মোটর আসবে। আমরা ওখান থেকেই কিছু জিনিস কিনতে বাজারে যাবো।

লেকের ভিতর একটা বড় নৌকায় প্রায় ১০/১২ জন ছাত্রছাত্রী নৌকা বেয়ে ফুর্তি করছে। আমাদের নৌকা কাছাকাছি আসলেই বুকের শান্তি সম্মেলনের ব্যাজ দেখেই 'গো পীং ওয়াংসে' স্লোগান দেওয়া শুরু করলো। আমরাও উত্তর দিলাম।

আমাদের নৌকার কাছে এসে বললো, আপনারা আমাদের নৌকায় কয়েকজন আসুন। কেউই যেতে চায় না বলে আমিই ওদের নৌকায় উঠে পড়লাম। অনেকে গেল না, কারণ সাঁতার জানে না, ভয়ে এমনিতেই জড়সড়ো। আমার তো সাঁতার কিছুটা জানা আছে। ২/১ মাইল আস্তে আস্তে সাঁতরাইয়া যাওয়ার অভ্যাসও ছোটকালে ছিল। ওদের নৌকায় উঠে দেখি ছাত্রছাত্রীরা কেউ নৌকা এদিক টান দেয় কেউ ওদিক টান দেয়, আর মাঝি যে ছাত্রটা হয়েছিল সে তো মাঝে মাঝে নৌকা ঘুরাইয়া দেয়। জিজ্ঞাসা করলাম, আপনারা কোথায় পড়েন? বললো, আমরা ক্যান্টন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি। এখানে ছুটি উপভোগ করতে এসেছি। আমাদের নৌকাগুলি সব এগিয়ে গেছে, তাড়াতাড়ি আমি

Scanned with CamScanner

বললাম, আমার কাছে বইঠা দেন। আমি ভালো নৌকা বাইতে পারি। বৈঠা দিলে বাওয়া শুরু করলাম। বেচারারা দেখে তো হতবাক! অনেকে আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, আপনি কী করেন? আমাদের দেশে কম্যুনিস্ট পার্টি আছে কি না? তাদের লোক ভালোবাসে কি না!

আমি বললাম যে, আমি রাজনীতি করি। তবে কম্যুনিস্ট না। আমাদের আলাদা পার্টি আছে। তার ভিন্ন প্রোগ্রাম আছে। কম্যুনিস্ট পার্টিও একটা আছে। তবে তার জনসমর্থন বেশি নাই। আমাদের দেশের লোকেরা কম্যুনিস্টদের কথা শুনলে কিছুটা ভয় পায়।

ছাত্রছাত্রীগুলি একটু আশ্চর্য হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলো। আরও অনেক বিষয়ে আলাপ হলো। আমাদের দেশের কথা জিজ্ঞাসা করলো। পরে প্রত্যেকেই একটা ছোট্ট খাতা বের করলো, প্রত্যেকেই আমার নাম ও ঠিকানা লিখে দিতে বললো। আমি পাড়ে বসে ওদের খাতাগুলি নিয়ে ইংরেজিতে সই করে দিলাম। কারণ, ওখানে বাংলা জানা লোক নাই বললেই চলে।

দেখি পীর সাহেব আমার জন্য দাঁড়াইয়া আছেন, মনে মনে একটু রাগও হয়েছেন, কারণ দেরি হয়ে যাচ্ছিলো। আমরা সন্ধ্যায় বাজারে এলাম। ওখানে হাতে তৈরি একপ্রকার পাখা পাওয়া যায়। হাড়ের, বাঁশের, নানা প্রকারের। দামও খুব বেশি না। তবে যারা কলকাতা বা বড় বড় শহরে খানদানি ইংরেজ বড়লোকদের বাড়ি গিয়াছেন তারা বোধ হয় দেখে থাকবেন। পাখাগুলি ভেঙে হাতের মধ্যে রাখা যায়। আবার টান দিয়ে খুলে বাতাস নেওয়া যায়। আমাকে একটা ওরা উপহার দিয়াছিল, আর একটা আমি কিনে এনেছিলাম। একটা উপহার দিয়াছিলাম আমার এক বড় ভাই বন্ধু যা বলেন তার স্ত্রীকে, আর একটা উপহার দিয়াছিলাম আমার একমাত্র সহধর্মিণীকে। যাদের কাছে টাকা ছিল বেশি তারা অনেক কিছু কিনলো।

সন্ধ্যার পরে আমরা ফিরে এলাম হোটেলে। আমাদের জন্য হ্যাংচো শান্তি কমিটির পক্ষ থেকে খাওয়ার আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। অনেক গণ্যমান্য লোক উপস্থিত ছিলেন। আমার পাশে যিনি খাওয়ার জন্য বসেছিলেন তিনি একজন বড় সরকারি কর্মচারী হবেন। ইংরেজি জানেন। কথায় কথায় জানতে পারলাম, আমাদের জন্য যে খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে সেগুলি মুসলমান বাবুর্চি দ্বারা পাক করানো হয়েছে। কর্মচারী বললেন, "আমরা মুসলমান বাবুর্চি জোগাড় করেছি কারণ, আপনারা মুসলমান। যে যে জিনিস আপনাদের খেতে

Scanned with CamScanner

নিষেধ আছে সেগুলি বাদ দেওয়া হয়েছে।" আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনারা কী করে জানেন কী কী জিনিস আমরা খাই না?" তিনি বললেন, "কেন? আমাদের দেশের মুসলমানরা অনেক জিনিস খায় না। আমরা পাশাপাশি যুগ যুগ ধরে বাস করছি। আমরা জানি মুসলমানদের কোন কোন জিনিস খাওয়া নিষেধ। আমাদের কোন কোন জিনিস নিষেধ তাহা মুসলমানরাও জানে।" ওদের পক্ষ থেকে বক্তৃতা করা হলো। আর আমাদের পক্ষ থেকে উত্তর দেওয়া হলো। পীর সাহেব বক্তৃতা করলেন। খাওয়া-দাওয়া শেষ করে আমরা হোটেলে ফিরে এলাম।

আবার হোটেলে এসেও আমরা গল্পে বসলাম—হ্যাংচো'র কয়েকজন ভদ্রলোক, আমি, ইলিয়াস ও দোভাষী। জানালায় দাঁড়াইয়া মাঝে মাঝে দেখে নিতাম লেকের সৌন্দর্য। চাঁদের আলোয় রাতে সকল কিছুই দেখা যায়; ছোট ছোট নৌকা ঘুরে বেড়াচ্ছে লেকের ভিতরে। অনেকক্ষণ গল্প করার পরে দোভাষী ও অন্যরা বিদায় নিলো। আমরাও তাদের কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

কাল সকালে আমরা রওয়ানা করবো দেশের দিকে। হংকং-এ একদিন থাকবো। তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়লাম। পরদিন ভোরে ট্রেনে চড়ে রওয়ানা করলাম। ক্যান্টন হয়ে যাবো, কিন্তু নামবো না। সোজা আমরা নয়াচীনের বর্ডারে এসে পৌছলাম। আমাদের ছোট একটা পুল পার হয়ে ব্রিটিশ এলাকার মধ্যে ফিরতে হবে, সেখানেও ট্রেন আছে। সেই ট্রেনে আমাদের হংকং-এ আসতে হবে। ইংরেজ কর্মচারীদের সাথে নয়াচীনের কর্মচারীদের ভাবটা ভালোই দেখলাম। উভয়ে উভয়কেই সম্মান ও খাতির করে। ইংরেজ জাত জানে কী করে পরের দেশে রাজত্ব করতে হয়। কারো সাথে খারাপ ব্যবহার করে না। জানে কম্যুনিস্ট চীন তাদের বন্ধু না, তবু বন্ধুভাবে তাদের গ্রহণ করে। এদিকেও দেখলাম নয়াচীনের কর্মচারীবৃন্দ ইংরেজদের খুবই খাতির করে—তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করে না। মিছামিছি চীনের লোকদের হয়রান করে না। ভালো ব্যবহার করেই উভয়ে উভয়ের মন জয় করতে ব্যস্ত।

আমাদের সাথে অনেক মালপত্র ছিল—যা আমরা উপহার পেয়েছিলাম। ইংরেজের কাস্টমস সেগুলি নিয়ে বেশি হৈচৈ করলো না। যখনই শুনলো, এগুলি উপহার, তখনই বললো, "যেতে দেও।"

আমরা গাড়িতে এলাম। নয়াচীনের কর্মচারী ও শান্তি কমিটির সভ্যবৃন্দ আমাদের বিদায় সংবর্ধনা জানালো। অনেকে আমাদের সাথে বুক মিলালো।

Scanned with CamScanner

আমাদের যে দোভাষী পিকিং থেকে এসেছিল, সে আমাকে ধরে বললো, "কবে আর দেখা হয়—যদি আমি অথবা আমার দেশের কোনো লোক তোমাদের ওপর কোনো অন্যায় ব্যবহার করে থাকে ক্ষমা করিও। তোমাদের দেশের লোকদের বলিও আমরা ভালো আছি। আমেরিকার মিথ্যা প্রোপাগান্ডা যেন বিশ্বাস করে না। অনেক কষ্ট দিলাম। তোমাদের অনেক অসুবিধা হয়েছে, তাতে দুঃখ করো না। আমাদের নতুন দেশ এখনও গড়ে তুলতে পারি নাই। আমাদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছি দেশ গড়ার কাজে।" বারবার বললো, "আমাদের ক্ষমা করিও।"

আমি তার কাছ থেকে এবং সকলের কাছ থেকে এক এক করে বিদায় নিয়া রওয়ানা করলাম। যতদূর দেখা গেল, আমাদের হাত তুলে অভিবাদন জানালো। তাদের ছেড়ে আসতে খুব খারাপ লাগলো। অনেক ভাবলাম—কবে আর আসি সুযোগ জীবনে নাও আসতে পারে! তবু মনে মনে খোদার কাছে প্রার্থনা করলাম, এ কথা বলে, "খোদা তুমি এদের মঙ্গল করিও। এরা যেন এদের দেশকে দুনিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেশ হিসাবে গড়ে তুলতে পারে। আর আমাদের দেশকেও যেন আমরা সোনার দেশে পরিবর্তন করতে পারি। আমাদের জনগণও যেন সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করতে পারে। পাশাপাশি দু'টা রাষ্ট্র যেন যার যার আদর্শ নিয়া গড়ে ওঠে।"

নয়াচীনে আমি কী কী দেখলাম তার আলোচনা করার চেষ্টা করবো—তাদের শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন, বেকার সমস্যা দূর করা, ভিক্ষাবৃত্তি বন্ধ, উন্নয়ন কাজ যা যা ওরা তিন বৎসরে করেছে।

দীর্ঘ পঁচিশ দিন পর্যন্ত নয়াচীনের কত নগর, কত গ্রাম আমি দেখেছি তা আপনারা সহজেই অনুমান করতে পারেন। মহল্লায় মহল্লায় ঘুরেছি। পাড়ায় পাড়ায় বেড়িয়েছি, স্টেশনে স্টেশনে নেমে ঘুরে ঘুরে দেখেছি। চেষ্টা করেছি দেখতে ভিক্ষুক পাওয়া যায় কি না এদেশ একদিন ভিক্ষার জন্য বিখ্যাত ছিল। চার বৎসর আগে এমনি দিনে কেউ রাস্তায় বেরোলে ভিক্ষুক এসে দাঁড়াতো, "বাবা ভিক্ষা দাও, না খেয়ে আছি। আল্লাহ তোমার ভালো করবে" সে ভিক্ষুক কোথায় গেল? খুঁজতে লাগলাম।

হংকং থেকে ট্রেনে ক্যান্টনসহ বহু স্টেশন পার হতে হয়েছে। পিকিং থেকে হংকং পর্যন্ত পথে হাজার হাজার মাইল ট্রেনে রয়েছি। নানকিং, সাংহাই, ক্যান্টন, হ্যাংচো, সিয়ানকিং-সহ বড় বড় শহর ঘুরেছি। একাকী রাস্তায়

Scanned with CamScanner

বেরিয়ে পড়েছি। রিকশা নিয়ে ঘুরেছি, ভিক্ষুক দেখতে হবে। এরা নিশ্চয় আমাদের কাছ থেকে গোপন করছে যে তাদের দেশে ভিক্ষুক নাই। যখন চেষ্টা করেও একটা ভিক্ষুকের দেখা পাই নাই তখন অনেকের কাছে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ভিক্ষুক দেখতে পাই না কেন? তারা আমাকে বললো, নয়া সরকার কায়েম হওয়ার পরে ভিক্ষাবৃত্তি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আমি বললাম, আইন করে? তারা উত্তর করলো, "না। সরকার প্রত্যেক বড় বড় শহরে এবং জেলায় জেলায় ভিক্ষুকদের জন্য 'হোম' করেছে।" যাকে এক কথায় 'ওয়ার্ক হাউজ' বলা হয়। সমস্ত ভিক্ষুককে ধরে সেই ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়, তাদের কাজ দেওয়া হয়, কাজ করে খায়। বিনা কাজে খেতে পায় না। আর যাদের কাজ করার ক্ষমতা নাই যেমন অন্ধ, আতুর তাদের সরকারের পক্ষ থেকে খাবার দেওয়া হয়। অনেককে এর মধ্যে কাজ দেওয়া হয়েছে– যাদের কাজ করার ক্ষমতা আছে। তারা একথাও স্বীকার করলো এখনও গ্রামে ২/১ জন ভিক্ষুক আছে। তাদের খুঁজে পাওয়া যায় নাই। তবে প্রকাশ্যে ভিক্ষা করতে পারে না, লোকে ধরে সরকারি ওয়ার্ক হাউজে পাঠিয়ে দেয়।

ভিক্ষুক সমস্যা নিয়ে যখন ভাবছি তখন আমার মনে পড়লো জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দীর কথা। ১৯৪৩ সালে বাংলায় দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হওয়ার পরে, সোহরাওয়ার্দী সাহেবকে ভার দেওয়া হলো সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেন্টের। যখন তিনি ভার নিলেন তখন দুর্ভিক্ষ ও মহামারি আরম্ভ হয়ে গেছে। তিনি এই দুর্ভিক্ষের হাত থেকে লোকদের বাঁচাবার জন্য সংগ্রাম শুরু করলেন। সমস্ত জনগণের কাছে সাহায্য ও সহানুভূতি চাইলেন। তখন ইংরেজ সরকার আমাদের রাজা ছিল। যুদ্ধের জন্য সকল কিছুই ইংরেজের হাতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। জনাব সোহরাওয়ার্দী তখন প্রত্যেক মহকুমায় এবং এমনকি এক মহকুমায় দুই তিনটি করে 'ওয়ার্ক হাউজ' করার হুকুম দিলেন এবং সেই সমস্ত এলাকার যেসব লোক ভিক্ষা করে কোনো রকমে জীবন বাঁচাইয়া রেখেছিল এবং বেকার হয়ে পড়েছিল তাদের ওয়ার্ক হাউজে নিয়ে কাজ দেওয়া হলো এবং খাওয়ার ও থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই সমস্ত লোক কেউ সুতা কাটতো, কেউ কাপড় বুনতো, কেউ বেতের চেয়ার করতো, এমনি ধরনের নানা প্রকার কাজ করতো। দুই বৎসর পরে আবার হিসাব নিয়ে দেখা গিয়েছিল, যে সমস্ত লোক সেখানে থাকতো, খেতো ও কাজ করতো, তাদের খাওয়া থাকার খরচ এবং কর্মচারীদের বেতন দিয়েও সরকারের কিছু কিছু আয় হতো। এতে দেখা যায় যে প্রথমে ২/১ বৎসর সরকারের লোকসান

Scanned with CamScanner

হলেও পরে সরকারের আয় হয়। লোকসান হয় বলে আমি মনে করি না, কারণ সরকার যে অর্থ ব্যয় করে তা জনগণকে বাঁচাবার জন্য এবং জনগণেরই দেওয়া এই টাকা। নয়াচীনে এ কথা শুনে আমার বিশ্বাস হলো যে ওয়ার্ক হাউজ করে তারা ভিক্ষাবৃত্তি প্রায় বন্ধ করে দিয়াছে। তাই চীনের যথেষ্ট জায়গা খুঁজেও একটা ভিক্ষুক দেখতে পেলাম না।

তবে একথা সত্য যে, এখনও চীনের লোক খুবই গরিব। কোনোমতে কাজ করে ভাত খাবার বন্দোবস্ত হয়েছে। সাধারণ লোককে আমি ময়লা, ছেঁড়া, তালি দেওয়া কাপড় পরতে দেখেছি। অধিকাংশই এই ছেঁড়া ময়লা কাপড় পরে। এখন পর্যন্ত নয়াচীনের জনগণের জীবনযাত্রার মান খুব নিচু সেটা দেখেই বোঝা গেল

আপনারা নিশ্চয়ই শুনেছেন যে এই জাতটা আফিমখোরের জাত। দুনিয়ায় আফিমখোর বললে এক কথায় চীনের লোককে বোঝা যায়। আমি যখন কলিকাতায় ইসলামিয়া কলেজে পড়তাম তখন মাঝে মাঝে আমার বন্ধু মি. জহিরুদ্দিনের (যিনি এখন ঢাকায় উকিল) বাড়ি যেতাম। যাবার সময় পথে চীনা পাড়া পার হয়ে যেতে হতো। নাকে কাপড় না দিয়ে যাওয়া যেত না; হয় মদের গন্ধ না হয় অন্য কিছুর দুর্গন্ধ।

চীনে যেয়ে আফিম খাওয়ার নেশাটার খোঁজ নেওয়ার চেষ্টা করলাম। শুনে আশ্চর্য হয়ে গেলাম—ব্যাপার কী? সরকারের হুকুম, আফিম খাওয়া চলবে না। আর কার সাধ্য, আফিম খায়! আমার মনে হয় অত্যাচার করেই আফিম খাওয়া বন্ধ করা হয়েছে। যদি সরকার খবর জানতে পারে যে, কোনো লোক আফিম খায় তা হলে তাকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হয়। সরকারের খবর পেতে কষ্ট হয় না। জনসাধারণই সরকারকে গোপনে খবর দেয়। এমন শোনা গেছে যে, স্বামী আফিম খাওয়া ছাড়তে চায় না, তাই স্ত্রী সরকারকে খবর দিয়াছে যে, আমার স্বামী আফিম খায় এবং খাওয়া ছাড়তে চায় না। ছেলেমেয়ে বাবা-মার বিরুদ্ধে সরকারকে খবর দিয়াছে। এমন অনেক গল্প আমি শুনলাম। তবে একথা সত্য যে, আফিম খাওয়া একবারে বন্ধ হয়েছে কি না বলতে পারি না। তবে শতকরা ৮০ জন লোক যে খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। এখনও আফিম খাওয়ার বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন চলছে। আমাকে একজন দোভাষী বলেছে, "পালাইয়া পালাইয়া এখনও ২/১ জনে খায়, তবে দুই তিন বৎসরের মধ্যে একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে।"

Scanned with CamScanner

আমাকে আরও বললো, "বোঝেন তো, যুগ যুগ ধরে এই অভ্যাস চলে এসেছিল আমাদের দেশে। বিদেশি সাম্রাজ্যবাদীরা আমাদের আফিম দিয়ে ঘুম পাড়ইয়া এই সোনার দেশটাকে শোষণ ও শাসন করেছে। আর এই বিদেশিরা আফিম ব্যবসা করে কোটি কোটি টাকা অর্থ উপার্জন করে নিয়া গিয়াছে। আর আমাদের দেশের গরিব সর্বস্ব বিক্রি করে শুধু আফিম খেয়েছে। আমাদের সরকার ও আমাদের শিক্ষিত সমাজের প্রতিজ্ঞা, একজনও আফিমখোর রাখবো না এই দেশে।"

আর একটা জিনিসের জন্য চীন বিখ্যাত ছিল, সে হলো ডাকাতি। বিরাট বিরাট দল ছিল ডাকাতদের। চিয়াং কাইশেকের সময় দিনে দুপুরে এরা ডাকাতি, খুনখারাবি করতো, কিছুতেই এদের দমন করতে পারে নাই। আমরাও অনেক গল্প শুনেছি এই ডাকাতির। কেমন করে মানুষ ধরে নিয়ে যেত, টাকা দিলে ছেড়ে দিতো। এক কথায় বলা যেত, 'মগের মুল্লুক'। কিন্তু নূতন সরকার কায়েম হওয়ার পরে কড়া হাতে এদের দমন করা হয়েছে। গ্রামে গ্রামে দল বেঁধে ডাকাত ধরা শুরু হয়েছে। আর সরকার খুব তৎপর হয়ে গ্রামের লোকদের সাহায্য করছে, আস্তে আস্তে ডাকাতি অনেক কমে গেছে। এখনও মাঝে মাঝে ডাকাতি হয়, তবে খুব কম। এক কথায় জনগণ সাহায্য করলে সকল কিছু করাই সম্ভব। শুধু জুলুম করে ও আইন করে এই সমস্ত অন্যায় কাজ বন্ধ করা যায় না, এর সাথে সুষ্ঠু কর্মপন্থারও প্রয়োজন। চীন সরকার সেই দিকে নজর দিয়েছে বলে মনে হলো। এই সমস্ত ডাকাতি, চুরি, খুনের প্রধান কারণ হলো বেকার সমস্যা। আপনারা জানেন, ৬০ কোটি লোকের এই দেশে কোটি কোটি লোক বেকার ছিল। তাদের না ছিল জমি, না ছিল চাকরি, না ছিল কাজ। তাই তারা কী করে খাবে?

এই সমস্ত কাজ কিছু লোক করে অভ্যাসের দোষে। আর কিছু লোক করতে বাধ্য হয় অভাবের তাড়নায় পেটে খাবার না থাকলে, ছেলেমেয়ে সামনে না খেয়ে মরলে, রোগে ঔষধের বন্দোবস্ত করতে না পারলে মানুষ অনেক সময় বাধ্য হয় চুরি করতে, ডাকাতি করতে এবং ছলে বলে কৌশলে অর্থ উপার্জন করে ছেলেমেয়েদের খাওয়াতে। তাই নয়াচীন সরকার প্রধান কাজ হিসাবে গ্রহণ করলো কী করে বেকার সমস্যা দূর করা যায়। বেকার সমস্যা দূর করতে হলে সুষ্ঠু পরিকল্পনা দরকার।

চিয়াং কাইশেকের আমলে জমির মালিক জমিদারই ছিল। চাষির জমির ওপর কোনো অধিকার ছিল না। চাষিরা খেতমজুরি করে কোনো মতে জীবনযাপন

Scanned with CamScanner

করতো। চাষের সময় কাজ পেত অনেকে, আবার বহু লোক পেতোও না। আয় খুব কম ছিল। জমিদাররা ইচ্ছামতো কৃষকদের জমি দিতো, আবার ইচ্ছা হলে কেড়ে নিতো। আইন ছিল বড়লোকদের হাতে।

চাষিরা জমির অধিকার চাইলে তাদের গুলি খেয়ে মরতে হতো। ভাগচাষি নামে এক প্রকার প্রজা ছিল, যা আমাদের দেশেও আছে। তবে আমাদের দেশের জমিদাররা যে অত্যাচার করে, তার চেয়ে সহস্র গুণ অত্যাচার করতো চীনের জমিদাররা আমাদের দেশে দেখা যায় কোনো কোনো প্রজার ৩/৪ বৎসরের খাজনা বাকি আছে, তবুও জমিদাররা অনেক সময় মামলা করে উৎখাত করে না আজও দেখা যায় আমাদের দেশের জমিদাররা মাঝে মাঝে প্রজার ওপর অত্যাচার করে থাকে।

চীনের অবস্থা আরও ভয়াবহ ছিল। কারণ 'আইন' বলে কোনো জিনিস ছিল না। আইন জমিদারদের হাতে, তারা ইচ্ছা করলে প্রজাদের ধরে এনে বেত মারতো, না খাওয়াইয়া আটকাইয়া রাখতো। আমাদের দেশেও পূর্বে এই ব্যবস্থা ছিল। যদি কোনো কৃষকের মেয়ে দেখতে ভালো হতো, তবে তো আর উপায় ছিল না। জমিদারের হুকুম তাকে জমিদারের বাড়ি পৌঁছাইয়া দিতে হবে, খাজনার পরিবর্তে। যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন তার ওপর জমিদার অথবা তার ছেলের পাশবিক অত্যাচার করবে এবং কামভাব চরিতার্থ করবে। মৃত্যু পর্যন্ত তার জমিদার বাড়িতে থাকতে হবে ঐ একইভাবে। যদি কোনো মেয়ের বাবা মা আপত্তি করে তবে তার সর্বস্ব কেড়ে নেওয়া হবে এবং অমানুষিক অত্যাচার করে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিবে।

এই সমস্ত জমিদাররা কোনো কাজ করতো না। বড় বড় শহরে এদের ভালো ভালো বাড়ি থাকতো, সেখানে আরামে মদ ও মেয়ে নিয়ে ফুর্তি করা হতো। জমিদাররা অনেক জমি ফেলে রাখতো, কারণ তাদের খাস জমি চাষাবাদ হতো না। এইভাবে কোটি কোটি বিঘা জমি পড়ে থাকতো অনাবাদি হয়ে।

আর একদিকে কোটি কোটি লোক কাজের অভাবে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করতো। কেউ চুরি ডাকাতি করতো আর কেউ না খেয়ে শৃগাল কুকুরের মতো রাস্তাঘাটে পড়ে থাকতো। এমনও অনেক শোনা গেছে যে পেটের দায়ে বাবা মা মেয়েদের দিয়ে ব্যবসা করিয়ে কোনোমতে খাওয়ার বন্দোবস্ত করতো।

বছরে বছরে দুর্ভিক্ষ হতো। মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বলতে কিছুই ছিল না। কারণ যা উপার্জন করতো তার চেয়ে জিনিসপত্রের দাম অনেক বেশি, তাই তা মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে।

Scanned with CamScanner

অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে মানুষ তখন পরিবর্তন চায়। কারণ চীনের মানুষ কম্যুনিস্ট পার্টিকে ভালোবাসতো না। তাদের কথা শুনলে ভয়ে শিহরিয়া উঠতো। কিন্তু যখন মানুষের আর কোনো উপায় থাকে না, বিচারের আশা আর করতে পারে না, ইনসাফ দেশের থেকে উঠে যায় তখন মানুষ যাহা সম্মুখে পায় তাহ'ই আঁকড়াইয়া ধরে চীনের জনগণই তার প্রধান প্রমাণ।

এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য যখন বেআইনি কম্যুনিস্ট পার্টি আবেদন জানালো, তখন মানুষ তার দিকে ছুটে চললো। আর একটা কারণ, চিয়াং কাইশেক তার দেশে বিরোধী দল গঠন করতে দেয় নাই। যারাই তার বিরুদ্ধে অথবা তার সরকারের অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করতো তখনই তাদের জেল-জুলুম, ফাঁসি, গুলি, নানারকমের অত্যাচার সহ্য করতে হতো। অনেকে রাজনীতি ছেড়েছিল, আর অনেকে বাধ্য হয়ে কম্যুনিস্ট দলের মধ্যে আশ্রয় নিয়া চিয়াং কাইশেকের অত্যাচার ও অবিচার খতম করার জন্য সক্রিয় সংগ্রাম শুরু করলো। এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে যখন কম্যুনিস্ট পার্টি যুদ্ধ ঘোষণা করলো, তখন চিয়াং সরকার সাধারণ মানুষের কোনো সমর্থন তো পেলোই না, উল্টা চিয়াং কাইশেক যাতে পরাজিত হয়, তার জন্য তারা চেষ্টা করতে শুরু করলো।

নয়াচীন সরকার কায়েম হওয়ার পরে তারা প্রথম কাজ শুরু করলেন, 'লাঙল যার জমি তার' এই প্রথা প্রবর্তনের মাধ্যমে। বড় বড় জমিদারদের জমি বাজেয়াপ্ত করে গরিব জমিহীন কৃষকের মধ্যে বণ্টন করে দিলো। সত্যিকারের কৃষক জমির মালিক হলো। যে সমস্ত অনাবাদি খাস জমি পড়ে ছিল, তাও ভাগ করে দিলো কৃষকদের মধ্যে হাজার হাজার বেকার কৃষক জমি পেলো। যখন তারা বুঝতে পারলো জমির মালিক তারা, তাদের পরিশ্রমের ফল জমিদাররা আর ফাঁকি দিয়া নিতে পারবে না, তখন তারা পুরা উদ্যমে চাষাবাদ শুরু করলো। তবে একথা সত্য যে, নতুন চীন সরকার সকলকে সমান করে দেয় নাই, যা আমরা কম্যুনিস্টদের সম্বন্ধে শুনি। এখনও অনেক বড় চাষি জমির মালিক আছে, তারা লোক রেখে চাষাবাদ করে। তবে প্রয়োজনের অধিক যে জমি ছিল তা বাজেয়াপ্ত করে গরিব চাষিদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে।

নয়াচীনে একখণ্ড জমি দেখলাম না, যা অনাবাদি অবস্থায় পড়ে আছে। রেল লাইনের পাশে যে গর্তগুলি পড়ে থাকে সেগুলিতেও ফসল করা হয়েছে। যদি কোনো জমি ইচ্ছাকৃতভাবে পড়ে থাকে তাহলে সরকার কঠোর শাস্তি দেয়।

Scanned with CamScanner

জমি যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে তা পুরুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; স্বামী জমি যাহা পাবে, স্ত্রীও সমপরিমাণ জমি পাবে এবং দুজনকেই পরিশ্রম করতে হবে। কারণ, দুজনই জমির মালিক। স্বামী কাজ করবে আর স্ত্রী বসে খাবে এ প্রথা চীনের থেকে তুলে দেওয়া হয়েছে। আমি ট্রেন থেকে পুরুষ ও মেয়েলোক অনেককেই হাল-চাষ করতে দেখেছি। মেয়েদের অধিকার সম্বন্ধে পরে আলোচনা করবো। জমির ট্যাক্স হিসাবে চাষিরা সরকারকে টাকা দিতেও পারে এবং ফসলের এক অংশও দিতে পারে। ট্যাক্স যে খুব কম তা নয়। আমার মনে হলো একটু বেশি।

কৃষক যে জিনিস উৎপাদন করে তার দাম আমাদের দেশের মতো কম হতে পারে না। আমাদের দেশে যখন ধান পাট চাষির ঘরে থাকে, তখন দাম অল্প হয়। যখন মহাজনদের ঘরে থাকে তখন দাম বাড়তে থাকে। চাষি উৎপাদন খরচও পায় না। আর অন্যান্য জিনিস যা কৃষকের কিনতে হয়, যেমন নুন, তেল, কাপড়, এগুলির দাম এত বেশি থাকে আমাদের দেশে, যে কৃষক যা উৎপাদন করে তা দিয়ে তাদের সংসার চলে না। কিন্তু নয়াচীনে একটা সামঞ্জস্য বিধান করেছে, কৃষক যা বিক্রি করে তার দাম দিয়ে ভালোভাবে অল্প দামে তেল, নুন, কাপড় কিনতে পারে। এতে তাদের জমির ফসলের দাম দিয়েই সংসার চালানো সহজ হয়েছে। গরিবদের পাঁচ টাকায় এক মন পাট বিক্রি করে ৪ টাকায় এক সের ডাল তেল কিনতে হয় না তাদের দেশে। প্রত্যেক এলাকাতে সরকারি দোকান আছে সেখানে সস্তায় সমস্ত জিনিস পাওয়া যায়। কোনো দোকানদার ইচ্ছা করলেই বেশি দাম নিতে পারে না। কারণ যদি লোকে জানতে পায় যে কোনো দোকানদার বেশি দাম নিচ্ছে তখন তারা সরকারি কর্মচারীদের খবর দিয়ে নিজেরাই ধরাইয়া দেয় এবং মিটিং করে ঠিক করে ঐ দোকানদারের দোকানে কেউই জিনিসপত্র কিনতে পারবে না। এতে চাষিদের যথেষ্ট উপকার হয়েছে। দেশের ভিতর গণজাগরণ এসেছে বলে এটা সম্ভবপর হয়েছে।

এক জায়গায় এক ঘটনা শুনলাম, এক সরকারি কর্মচারী ঘুষ খেয়েছিল, তাকে জনসাধারণ ধরাইয়া দেয়। ঘুষ খাওয়ার অপরাধে তার ফাঁসি হয়েছিল। সেই হতে কর্মচারীদের মধ্যে ভয়ের সঞ্চার হয়েছে। কেউই ঘুষ খেতে সাহস পায় না।

এইভাবে চাষিদের জীবনে একটি বিরাট পরিবর্তন হয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে : যে চাষি সকলের চেয়ে বেশি ফসল

Scanned with CamScanner

উৎপাদন করতে পারবে, তাকে পুরস্কার দেওয়া হবে। গ্রামে গ্রামে 'মিউচুয়াল এইড সোসাইটি' গড়ে উঠেছে। একে অন্যকে সাহায্য করে। গ্রামের গরিব চাষিরা এক হয়ে তাদের চাষাবাদ করে। এতে সকলের মধ্যে একতা গড়ে উঠেছে। 'প্রত্যেকে প্রত্যেকের জন্য, সকলেই সকলের জন্য'—এই নীতির প্রচার খুব হয়েছে এবং কাজও সেইভাবে হতেছে। গ্রামের গরিব চাষিরা একতাবদ্ধ হয়ে চাষাবাদ করাতে মানুষের মধ্যে বিভেদ ভাব দিন দিন দূর হয়ে যেতেছে।

চাষিদের মধ্যে জমি বণ্টন হওয়ায় যথেষ্ট লোক কাজ পেয়েছে। বেকারের সংখ্যাও দিন দিন কম হয়ে যেতেছে। চীন বহু বড় দেশ, সমস্ত দেশটায় চাষাবাদ হতে পারে। সরকার জনগণের সাহায্য নিয়ে হাজামজা নদী, খাল কাটতে শুরু করেছে। প্রত্যেক বৎসর বন্যায় লক্ষ একর জমির ফসল পূর্বে নষ্ট হয়ে যেত; আজ আর সাধারণ বর্ষায় ফসল নষ্ট হতে পারে না। একমাত্র হোয়াংহো নদীতে বন্যায় বৎসরে লক্ষ লক্ষ একর ফসল নষ্ট হতো। সরকার হোয়াংহো নদীতে বাঁধ বাঁধবে বলে জনগণকে ডাক দিলো। লক্ষ লক্ষ লোক পেটে খেয়ে সরকারকে সাহায্য করলো। হোয়াংহোকে বলা হয় চীনের দুঃখ। চীনারা আগে কোনোদিন এই বাঁধ বেঁধে রাখতে পারে নাই। কিন্তু বিপ্লবের পর দেশপ্রেম ও জাতীয় সংহতির দৃঢ়তায় চীনারা অসাধ্য সাধন করেছে। এখন আর হোয়াংহো নদীতে বন্যা হতে পারে না। লোকের এখন আর চিন্তা করতে হয় না। আরামে বৎসরের পর তাদের পরিশ্রমের ফল তারা পায়।

চীনের সরকারের কাজের একটা কায়দা আছে। তারা সকল কাজেই জনগণের সাহায্য চায়। জনগণ বুঝতে পারে এ কাজ তাদেরই মঙ্গলের জন্য, তাই সরকার যখনই ডাক দেয়, লক্ষ লক্ষ লোক তাতে সাড়া দেয়। এক জায়গায় শুনলাম, সরকার ডাক দিলো—'একশত মাইল একটা রাস্তা করতে হবে। তোমাদের যথেষ্ট অসুবিধা হতেছে; সরকারের অত টাকা নাই, তাই তোমাদের নিজেদের কাজ নিজেদের করাই উচিত। প্রত্যেকের আসতে হবে, অন্তত ২ দিন কাজ করে দিতে হবে।' সমস্ত লোক এসে কাজ শুরু করলো, সরকার তাদের খাবার দিলো। নারী পুরুষ নির্বিশেষে ১ মাসের ভিতর সমস্ত রাস্তা করে দিলো। এইভাবে নয়াচীনে হাজার হাজার গঠনমূলক কাজ জনসাধারণ করেছে, কারণ জনসাধারণের আস্থা আছে সরকারের ওপরে এবং মনে করে এ কাজ তাদের নিজেদের। এমন বহু ছোট বড় কাজ এই তিন বৎসরে চীন সরকার করেছে। একদিন যে চীনের দুনিয়ার কাছে খাদ্য

Scanned with CamScanner

ভিক্ষার জন্য হাত পেতে বসে থাকতে হতো, খাদ্যের অভাবে কোটি কোটি লোক মারা যেত, আজ সেই চীন বৎসরের খোরাক উৎপাদন করেও জনসাধারণকে আছুদা মাফিক অর্থাৎ তৃপ্তিসহকারে মনের সাধ মিটিয়ে খাওয়াইয়া বিদেশে বহু খাদ্যশস্য চালান দেয়। দরকার হলে অন্য দেশকে বিপদের সময় সাহায্য করে। এর অর্থ, নয়া সরকার সৎ ও দেশপ্রেমিক এবং তাদের কাজ গঠনমূলক।

আমাকে এক সরকারি কর্মচারী বলেছেন, যদি কোনো লোক না খেয়ে কষ্ট পায় অথবা ঔষধের অভাব হয়, তাহলে সেইসমস্ত জায়গার সরকারি কর্মচারীদের কর্তব্য তাদের সাহায্য করা এবং কাজের, খাওয়ার ও ঔষধের বন্দোবস্ত করা। যদি শোনা যায় যে, কোনো এলাকায় কোনো লোক না খেয়ে মারা গেছে, তবে সেই এলাকার সরকারি কর্মচারীদের কৈফিয়ত দিতে হয়। সন্তোষজনক কৈফিয়ত না দিতে পারলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। প্রত্যেক গ্রামে পঞ্চায়েত প্রথা চালু করা তাদের কাজ। ঐ সমস্ত এলাকায় কেউ অন্যায় করলে তার বিচার করা, সালিশি করে মিটিয়ে দেওয়া পঞ্চায়েতের কাজ। রাস্তাঘাট, স্বাস্থ্য, শিক্ষার দিকে নজর দেওয়াও এই পঞ্চায়েতের কাজ। এই পঞ্চায়েত কমিটির সভ্যদের ইলেকশনে মেম্বার হতে হয়। ছোটখাটো বিচার এরাই করে। তবে বিশেষ ধরনের অন্যায় করলে পিপলস কোর্টে বিচার হয়। আসামির উকিল রাখতে হয় না। সরকার পক্ষ থেকে উকিল দেওয়া হয়। লোকাল ইনকোয়ারির পরে বিচার হয়। মিথ্যা মামলা অথবা মিথ্যা সাক্ষী জোগাড় করতে হয় না।

যে দেশে সরকারের কর্মচারীরা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় ও সেরকম সাক্ষ্য দিতে লোকদের বাধ্য করে তাদের ওপর মানুষের আস্থা থাকবে কী করে? ভয় করতে পারে, কিন্তু সে সরকার ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা পায় না। এইভাবে গ্রামের কৃষকদের মামলায় আসামি হয়ে জমি বন্ধক দিয়ে, মহাজনদের কাছ থেকে সুদে টাকা নিয়ে মামলা চালাতে হয় না। কোনো কৃষকের জমি বেচার হুকুম নাই। জমি এক হাত থেকে অন্য হাতে যেতে পারে না। ধরুন, আমাদের গ্রামের অবস্থায় কী হয়? এক গ্রামে একজন কি দু'জন মহাজন বা তালুকদার অথবা জমিদার থাকে, তারা যখন লোকের কোনো বিপদ হয়, বা না খেয়ে থাকে অথবা মেয়ে বিবাহের সময় হয়, মামলা মোকদ্দমায় পড়ে, তখন গ্রামের মহাজনদের কাছ থেকে টাকা ধার নেয় জমি বন্ধক দিয়ে, কেউবা বাড়ি বন্ধক দিয়ে। দেখা যায়, আস্তে আস্তে গ্রামের বারো আনা জমি এই

Scanned with CamScanner

মহাজনদের হাতে চলে যায়, আর কৃষকরা ভূমিহীন অথবা জমিহীন কৃষকে পরিণত হয়। তারপর একদিন কালের করাল গ্রাসে পড়ে বিনা চিকিৎসায় না খেয়ে মারা যায়।

আর হতভাগাদের ছেলেমেয়েরা কিছুদিন মহাজনের বাড়ি কাজ করে, কিছুদিন ভিক্ষা করে জীবন রক্ষা করে, তারপর একদিন গ্রাম ছেড়ে পেটের তাগিদে অন্য কোথাও চলে যায়। আর ফিরে আসে না। এই যাওয়াই শেষ যাওয়া হয়। বোধ হয়, প্রকৃতির কোলে চিরদিনের জন্য আশ্রয় নেয়। তাদের ছেলেমেয়েগুলি না খেয়ে থাকতে থাকতে একদিন ব্যারাম হয়ে মারা যায়। আমরা বলি অসুখ হয়ে মারা গেছে। কিন্তু না খেতে না খেতে যে ব্যারাম হয়, তারপর মারা যায়, একথা আমাদের দেশে বলে না। কারণ, সরকারের থেকে খবর নিলে জানা যায় যে, না খেয়ে মরে নাই, ব্যারাম হয়ে মারা গেছে। যদি কেউ না খেয়ে মরার খবর দেয় তবে তার কৈফিয়ত দিতে কাজ সারা হয়ে যায়। আর যদি কোনো খবরের কাগজে প্রকাশ হয়, তবে কাগজআলার কাগজটা দেশের নিরাপত্তার নামে বন্ধ করে দেওয়া হয়। আর বেচারার আমার মতো নিরাপত্তা আইনে জেল খাটতে খাটতে জীবন শেষ হয়ে যায়।

আমাদের দেশে মানুষ না খেয়ে মারা গিয়েছে এই খবরটা বন্ধ করার জন্য অথবা প্রতিবাদ করার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা হয়। নয়াচীনে এরকম খবর রটলে সরকার এর খোঁজ নেয় কী জন্য লোকটা মারা গেছে। কতদিন না খেয়ে ছিল? জমিজমা কী পরিমাণ আছে? এরকম ঘটনা যেন আর ভবিষ্যতে না হয়। এই না খেয়ে মরার জন্য লোকাল কর্মচারীদের কৈফিয়ত দিতে হয়, আর আমাদের দেশে এই ঘটনা প্রকাশ হওয়ার জন্য কৈফিয়ত দিতে হয়। আপনারা বুঝতে পারবেন যদি আমি একটা ঘটনা বলি। আমাদের পূর্ব বাংলার মুসলিম লীগের জনৈক মন্ত্রী খুলনার দুর্ভিক্ষ এলাকা ভ্রমণ করে বললেন যে, "লোকে না খেয়ে মরছে না, মরছে পুষ্টির অভাবে।" পুষ্টির অভাব হয় কেন? এই কৈফিয়ত কে জিজ্ঞাসা করে? আর করলেই বা উত্তর দেবার জন্য লীগ মন্ত্রীমণ্ডলী বাধ্য হবে কেন? কারণ তারা জানে নিরাপত্তা আইন তাদের হাতে আছে। ইচ্ছা করলে যে কোনো মুহূর্তে বিনা ওয়ারেন্টে যে কোনো লোককে গ্রেপ্তার করে জেলে রাখতে পারে বছরের পর বছর।

যা হোক, নয়াচীন বেকার সমস্যা দূর করতে চেষ্টা করছে। এজন্য তারা নজর দিচ্ছে, কুটিরশিল্পের দিকে। কুটিরশিল্পে সরকারের থেকে সাহায্য করা হয়। হাজার হাজার বেকারকে কাজ দেওয়া হয়েছে আমাদের দেশের তাঁতিদের

Scanned with CamScanner

মতো লক্ষ লক্ষ তাঁতি কাপড় তৈয়ার করে, সুতা কেটে জীবন ধারণ করে। সরকার তাদের অল্প দামে সুতা দেয়, যাতে তারা কলের কাপড়ের সাথে পাল্লা দিয়ে কাপড় উৎপাদন করতে পারে। আমাদের দেশে বিদেশ থেকে প্রয়োজনের চেয়ে অনেক কম সুতা এনে বড় বড় ব্যবসায়ীর মাধ্যমে সুতা বিলি করা হয়, যা কালোবাজারিতে বিক্রি হয়ে গরিব তাঁতিদের কাছে যখন পৌঁছে তখন দাম অনেক পড়ে যায়। তাই কাপড় তৈয়ার করে মিলের কাপড়ের সাথে পাল্লা দিয়ে পারে না। আমাদের সরকার বড় বড় কালোবাজারিদের দিয়ে বিদেশ থেকে কাপড়, সুতা আনায়। আর তা বেশি দামে বিক্রি করা হয় বাজারে। ফলে, একদিকে গরিব জনসাধারণের বেশি দামে কাপড় কিনতে হয়, আর অন্যদিকে তাঁতিরা সুতার অভাবে তাঁতের কাজ ছেড়ে দিয়ে বেকার হয়।

নয়াচীন সরকার কাপড়ের কলগুলিকে হুকুম দিয়েছে সুতা তৈয়ার করতে, সেই সুতা বিলি করা হয় সরকারি কর্মচারীদের মাধ্যমে গরিব তাঁতিদের কাছে। গরিব তাঁতিরা কাপড় তৈয়ার করে সরকারি স্টোরে জমা দেয়। এভাবে লক্ষ লক্ষ বেকার তাঁতি কাজ পাচ্ছে, বিদেশি কাপড় আনতে হচ্ছে না। কাপড়ের মিলগুলিও যথেষ্ট পরিমাণে সুতা তৈয়ার করছে এবং কাপড় তৈয়ার করছে। এদিকে ফ্যাক্টরিগুলিও পুরা উদ্যমে কাজ করছে আর লোকেও কাজ পাচ্ছে। তাঁতি কাপড় তৈয়ার করে আরামে দিন কাটাচ্ছে।

কুটিরশিল্পের অর্থ শুধু কাপড় তৈরি নয়। আরও অনেক কাজ করার জন্য সরকার হুকুম দিয়েছে এবং সাহায্য করছে। যেমন টেবিল, চেয়ার, খাট, হাঁড়ি, পাতিল, কাঁচি, ক্ষুর নানা প্রকারের জিনিস করার জন্য সরকার সাহায্য করে। অনেকে আবার সাবান তৈয়ারও করে। কোনো নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসই বিদেশ থেকে আনা হবে না বলে সরকার হুকুমও যেমন দিয়াছে আবার জনগণকে সেসকল জিনিস উৎপাদন করার জন্য সাহায্যও করছে।

এছাড়াও সরকার জনগণের সাহায্যে বড় বড় শিল্প গড়ে তুলছে, তাতে হাজার হাজার লোক আজ কাজ পাচ্ছে। দেশে শিল্প গড়ে না তুললে বেকার সমস্যা দূর করা যায় না। তাই নয়া সরকার সেদিকে খুব নজর দিয়েছে বলে মনে হয়। আমি অনেক বড় বড় সরকারি কর্মচারী ও শান্তি কমিটির সম্পাদকের সাথে আলাপ করেছি দোভাষীর মাধ্যমে। সাধারণ লোকের সাথে আলাপ করে যতদূর জানা যায়, তাতে এই মনে হলো যে, বেকার সমস্যা দূর করতে আরও ২/৩ বৎসর সময় লাগবে। তবে সাংহাই ইংরেজি দৈনিক কাগজের

Scanned with CamScanner

সম্পাদকের সাথে আলাপ করে তাঁর কাছ থেকে অনেক খবর পেয়েছিলাম। তিনি আমাকে জানালেন যে, এখন পর্যন্ত প্রায় ১৫ লক্ষ বেকার আছে, তাদের সরকার টেকনিক্যাল ট্রেনিং দেবার ব্যবস্থা করেছে কাহারও ছয় মাস লাগবে, কাহারও ১ বৎসর, আর কাহারও ৪ বৎসর লাগবে। এদের ট্রেনিং হওয়ার সাথে সাথে কাজ মিলে যাবে। ট্রেনিংয়ের সময় সরকার এদের এলাউন্স দেয়, যদিও তা যথেষ্ট নয়। তবে কোনোমতে চলে যায়। নতুন রাষ্ট্র—অর্থের অভাব, বেকার সমস্যা দূর করতে ও অন্যান্য কাজ করতে সময় লাগবেই তো!

তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "কয় বৎসরের মধ্যে বেকার সমস্যা দূর করতে পারবেন?" তিনি উত্তর করলেন, "কমপক্ষে আর ৩ বৎসর সময় আমাদের লাগবে। তিন বৎসর পরে যদি কোনোদিন আসেন তবে দেখতে পাবেন, একটাও আর বেকার লোক নয়াচীনে নাই।" কত বড় সংকল্প এদের মনে! এরা এত বড় একটা বিরাট বেকার সমস্যা চিরদিনের জন্য দেশ থেকে মুছে দিতে চায়। দুনিয়ার অনেক বড় উন্নতিশীল দেশও আজ পর্যন্ত বেকার সমস্যা দূর করতে পারে নাই। বার বার চেষ্টা করেও প্ল্যানের পর প্ল্যান করেও তারা কৃতকার্য হতে পারে নাই। তার কারণ, দৃষ্টিভঙ্গি ও সমাজব্যবস্থা। যার আলোচনা এখানে আমি করতে চাই না।

দুনিয়ার মধ্যে চীনদেশ বেশ্যাবৃত্তির জন্য বিখ্যাত ছিল—বিশেষ করে সাংহাই শহর। কারণ, এ শহরটা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শহরের মধ্যে অন্যতম। এই বেশ্যাবৃত্তির বিরুদ্ধে নয়াচীন সরকার জেহাদ ঘোষণা করলো। আইন করে না, মানবীয় ব্যবহার দ্বারা। সমাজসেবক ও নিঃস্বার্থ কর্মীদের ওপর ভার পড়লো এই মেয়েরা কেন বেশ্যা হয় এবং এমন কুৎসিতভাবে জীবনযাপন করে অনুসন্ধানে তা বের করার! এরা কিছুদিন পর্যন্ত এদের অনেকের জীবনের ইতিহাস সংগ্রহ করেছিল। আর একদিকে সরকার একটা কমিটি নিয়োগ করলো—কী করে এদের কাজ দেওয়া যায়, সমাজে পুনর্বাসন করা যায় সে বিষয়ে পরামর্শ দিতে। মানুষ না খেতে পেয়ে পেটের জন্য কী করতে পারে তা এদের জীবন নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যায়। যাদের ইতিহাস নেওয়া হয়েছিল, তাদের অধিকাংশই হলো না খেতে পেরে উপায়হীন অবস্থায় এসে বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করেছে। আবার অনেকের জীবনীতে জানা যায় যে, তখন চীনদেশে মেয়ে বিবাহ দিতে হলে অনেক অর্থের প্রয়োজন হতো; আর বিবাহ না হলে সেইসব মেয়েদের বৃদ্ধ পিতামাতা সমাজে মুখ দেখাতে পারতো না। এমনকি দেশের লোক তাদের সামাজিক ব্যাপারে একঘরে করে রাখতো।

Scanned with CamScanner

তাতে অনেক মেয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে এসে বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করেছে। আবার কতগুলি কেসস্টাডিতে পাওয়া গেল যে, অনেকে চরিত্রহীন যুবকের সাথে প্রেমে পড়ে ঘর ছেড়ে বের হয়ে এসেছে—এই প্রলোভনে যে অন্য জায়গায় যেয়ে তাদের বিবাহ হবে। কিন্তু যুবকটা যতদিন সম্ভব উপভোগ করে পরে একদিন তাকে ফেলে পালিয়ে সলে যায়। মেয়েটা আর কী করে? ঘরেও ফিরে যেতে পারে না, আর বাঁচবার মতো উপায়ও থাকে না, বাধ্য হয়ে গণিকালয়ে স্থান নেয়।

এ শুধু চিয়াং কাইশেক আমলের চীনেই ছিল না। এ রকম ঘটনা আমাদের দেশেও সচরাচর ঘটেছে। চীনের এই রিপোর্টগুলি আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হলো। কারণ আমার দেশের কথা তখনই মনে পড়লো। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে আমি দেখেছি কত ভদ্র পরিবারের মেয়ের সতীত্ব বিসর্জন দিয়ে অর্থ উপার্জন করেছে, না খাওয়া বাবা-মাকে খাওয়াবার জন্য। হাজার হাজার মেয়ে দুর্ভিক্ষের সময় চার পয়সা দু'পয়সার জন্য সতীত্ব দিয়েছে। এমন খবরও আমি জানি স্বামী স্ত্রীকে দিয়ে ব্যবসা করিয়ে কোনো মতে সংসার চালিয়েছে। আমি তখন রিলিফের কাজ করতেছিলাম। আইএ পরীক্ষা না দিয়া রাতদিন রিলিফের কাজ করতাম। আমার সাথে অনেক ভিখারির আলাপ হয়েছে। চোখের পানি ফেলে দিয়ে তারা বলেছে, বাবা পেটের দায়ে আর কী করি?

এমনকি ১৯৫৩ সালে খুলনার দুর্ভিক্ষের সময় সাতক্ষীরা মহকুমায় যখন মওলানা ভাসানী সভা করতে যান, তখন গরিব মেয়েরা এসে মওলানা সাহেবকে বলেছে, "হুজুর, এখন আর কেউ আমাদের ভিক্ষাও দেয় না। তাই স্বামীর অনুমতিতে ইজ্জত দিয়ে কোনো রকমে এক বেলা বা একদিন পরে একদিন চারটা খাই।"

পেটে খাবার না থাকলে কোনো ধর্ম কথায়ই মানুষ ঈমান রাখতে পারে না। পেটের দায়ে মানুষ নর্দমা থেকে কুড়াইয়া খায়। যখন মা দেখে যে তার ছেলেমেয়ে কলিজার কলিজা, না খেয়ে এবং বিন ওষুধে আস্তে আস্তে কোলে বসে শুকিয়ে শুকিয়ে মারা যায়, অথচ একটু খাবার দিলেই তার কলিজার ধন বাঁচতে পারে, কিন্তু কোনো উপায় নাই; ভিক্ষাও পাওয়া যায় না, তখন তার পক্ষে ইজ্জত দিয়ে খাবার জোগাড় করতে একটুও দ্বিধা হয় না। তাই চিয়াং কাইশেকের চীনের মেয়েরা পেটের দায়ে বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছে।

Scanned with CamScanner

দ্বিতীয় বিষয়টা হলো, মেয়েদের বিবাহ হওয়া তখন কষ্টকর হয়ে পড়েছিল। এতে অনেক অর্থের প্রয়োজন হতো। আজ আমাদের সমাজেও একই ভাব দেখা দিয়াছে। কোনো ছেলে লেখাপড়া শিখলে, একটু ভালো চাকরি পেলেই ভাবে যে, বিবাহ করে বেশ কিছু টাকা ও গহনা এবং খাটপালঙ্ক পাওয়া যাবে। মেয়ে মনমতো হলেই শুধু চলবে না, সম্ভব হলে বাড়ি, না হয় গাড়ি, না হয় নগদ টাকা যৌতুক চাই। গরিব ভদ্রলোক মেয়েকে কিছু লেখাপড়া শিখাইয়াছে এখন আবার টাকার দরকার বিবাহ দিতে। কোথায় টাকা পাবে? বাড়ি থাকলে বিক্রি করতে পারতো, তা নাই। নগদ টাকা নাই, বাধ্য হয়ে বলতে হয় কী করবো? কিছুই আমার দেবার নাই। তখন আর মেয়ের বিবাহ হবে না। মেয়ের বিবাহ না হলে সমাজ ঘৃণা করবে, তখন সেই মেয়ের আর কী উপায় থাকে? আস্তে আস্তে আমাদের সমাজে এই ঘৃণ্য ব্যাধিটা ঢুকে পড়েছে। এই দোষটা যখন আরো প্রকট হয়ে দেখা দিবে, তখন সমাজের ধ্বংসের আর বেশি দিন বাকি থাকবে না। তখন মেয়েরা সমাজে মুখ দেখাতে না পেরে তাদের পথ তারা দেখবে। আমি আমার দেশের মেয়েদের অনুরোধ করবো, যে ছেলে এইভাবে অর্থ চাইবে তাকে কোনো মেয়েরই বিবাহ করা উচিত না। সময় থাকতে এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করা উচিত এবং আমাদের দেশের শিক্ষিত মেয়েদের এগিয়ে আসা উচিত। মানবসৃষ্ট এই সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের ফলজনিত কুপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনে আমাদের মতো বহু যুবকের সাহায্যও তারা পাবে।

চিয়াং কাইশেকের আমলের এই অন্যায় অত্যাচার সমাজ থেকে নয়াচীন তুলে দিয়েছে।

আমি আমার দোভাষীর মাধ্যমে সংহাই শান্তি কমিটির নেতার সাথে আলাপ করলাম এবং জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনারা বেশ্যাবৃত্তি কী করে তুলে দিলেন? তার বললো : আইন করে তুলে দেন নাই। তবে কি অত্যাচার করে তুলে দিয়েছেন?" উত্তরে বললেন, "না, অত্যাচার করেও তুলে দেই নাই। আবার আইন করেও তুলে দেই নাই। আইন করে তুলে দিলে কি হবে, এদের তো বাঁচাতে হবে! এদের খাওয়া থাকার ব্যবস্থা করে দিলেই তারপর আইন করা যায়। শুধু আইন করলেই কোনো কাজ হয় না। আমাদের সরকার প্রথম গণনা করলো কত বেশ্যা চীনদেশে আছে। তারপর তাদের জন্য কিছু কাজের ব্যবস্থা করা হলো। আমরা প্রত্যেক সমাজসেবক প্রথমে তাদের কাছে যেয়ে বোঝাতে লাগলাম, তোমরা এ বেশ্যাবৃত্তি ছেড়ে দাও। তোমাদের কাজের

Scanned with CamScanner

বন্দোবস্ত করে দিতেছি। তোমরা ফ্যাক্টরিতে কাজ করবা অন্য মেয়েরা যেভাবে করে, তারপর যাকে পছন্দ করবা তার যদি মত হয়, তবে তোমাদের বিবাহ হবে, সংসার হবে, ছেলেমেয়ে হবে। তোমরা সাধারণ মানুষের মতো বাস করতে পারবা। এভাবে জীবন নষ্ট করে তোমাদের লাভ কী? এইভাবে দলে দলে কর্মীরা তাদের সাথে দেখা করে আলোচনা করতে শুরু করলো। একমাত্র সাংহাই শহরে ৪০ হাজারের বেশি বেশ্যা ছিল। আলোচনার ফল কিছুটা ভালো হলো। প্রথমে শতকরা ৩০ জন বেশ্যা, বেশ্যাবৃত্তি ছেড়ে দিয়ে কাজ নিতে রাজি হলো। তাদের সকলের চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা হলো, তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে ফ্যাক্টরিতে কাজ দেওয়া হলো। কয়েকমাস পরে আবার কর্মীরা বাকি বেশ্যাদের কাছে যেয়ে বোঝাতে লাগলো এবং বললো, তোমরা দেখে আসো আগে তোমাদের সাথে যারা ছিল তাদের অবস্থা কেমন করে ফিরে গেছে। তারা সংসারে স্থান পেয়েছে, অনেকের বিবাহ হয়েছে, বাড়ি পেয়েছে। তাদের অবস্থার কত পরিবর্তন হয়েছে। সে সময় আরও প্রায় শতকরা ৩০ জন বেশ্যাবৃত্তি ছেড়ে ফ্যাক্টরিতে কাজ নিলো। কিন্তু যে সমস্ত বেশ্যা বাকি ছিল তারা কিছুতেই আসতে রাজি হয় নাই। অনেকে পালাইয়া চলে গেল হংকং ও চীনের বাইরে, অনেকে গা ঢাকা দিলো।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে, "যারা গা ঢাকা দিয়াছে তারা অনেকে এখনও গোপনে বেশ্যাবৃত্তি চালাইতেছে?" উত্তর দিলো, "হয়তো অনেকেই গোপনে বড় বড় শহরে ব্যবসা চালাচ্ছে, তবে সরকার ও কর্মীরা তাদের ধরবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করছে।" আমি বললাম, "বেআইনি করেন নাই, তবে ধরবার চেষ্টা করছেন কেন? কী অধিকারের বলে আপনারা তাদের ব্যবসা চালাতে দেন নাই?" তিনি বললেন, "বেআইনি করা লাগে না, আমরা প্রোপাগান্ডা করে জনমত গঠন করেছি। জনমতের ভয়ে কেউ আর গণিকালয় যেতে সাহস পায় না। ধরার অর্থ হতেছে আমরা রোজ যেয়ে ওদের পরামর্শ দেই এবং জীবন অতিষ্ঠ করে তুলি। এদের মধ্যে কিছু সংখ্যকের স্বভাবে পরিণত হয়ে গেছে, তারা আর এ ব্যবসা ছাড়তে রাজি না। তারা মনে করে তাদের স্বাধীনতা থাকবে না। তারা কাজ না করেই যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করতে পারে। এক কথায় নয়াচীন থেকে বেশ্যাবৃত্তি তুলে দেওয়া হয়েছে, আইন করে হোক, আর বেআইনি হোক, আর কাজ দিয়েই হোক "

আমাদের রাজধানী করাচিতে আইন করে বেশ্যাবৃত্তি বন্ধ করা হয়েছে, কিন্তু আমি জানি প্রায় সকল হোটেলেই এই ব্যবসা চলে থাকে। আইন করে

Scanned with CamScanner

কোনো অন্যায় কাজই বন্ধ করা যায় না, অন্যায় বন্ধ করতে হলে চাই সুষ্ঠু সামাজিক কর্মপন্থা, অর্থনৈতিক সংস্কার ও নৈতিক পরিবর্তন।

নয়াচীনে আজকাল পূর্বের মতো মেয়েদের বাবা মায়ের টাকা দিয়া আর জামাই কিনতে হয় না। তাহারা নতুন বিবাহ আইন প্রবর্তন করেছে। ছেলেমেয়ে একমত হয়ে দরখাস্ত করলেই তাদের যার যার ধর্মানুযায়ী বিবাহ দিতে বাধ্য। 'পুরুষ শ্রেষ্ঠ আর স্ত্রী জাতি নিকৃষ্ট' এই পুরানো প্রথা অনেক দেশে বহুকাল থেকে চলে আসছে, তাহা আর নয়াচীনে নাই। আইন করে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তাই আজ নয়াচীনে সমস্ত চাকরিতে মেয়েরা ঢুকে পড়ছে। পুরুষদের সাথে তাল মিলিয়ে কাজ করছে। প্রমাণ করে দিতেছে পুরুষ ও মেয়েদের খোদা সমান শক্তি দিয়েই সৃষ্টি করেছে। সুযোগ পেলে তারাও বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক, ডাক্তার, যোদ্ধা সকল কিছুই হতে পারে। নয়াচীনের বহু পূর্বে পাশ্চাত্য দেশগুলি, বিশেষ করে গ্রেট ব্রিটেন, আমেরিকা, রাশিয়া, ফ্রান্স, জার্মানি, ইটালি এমনকি মুসলিম দেশ তুরস্ক নারী স্বাধীনতা স্বীকার করেছে। নারীরা সেদেশে যথেষ্ট অগ্রসর হয়েছে। তুরস্কে অনেক মেয়ে পাইলট আছে, যারা দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ পাইলটদের মধ্যে অন্যতম।

নয়াচীনের মেয়েরা আজকাল জমিতে, ফ্যাক্টরিতে, কলে-কারখানাতে, সৈন্যবাহিনীতে দলে দলে যোগদান করছে।

সত্য কথা বলতে গেলে, একটা জাতির অর্ধেক জনসাধারণ যদি ঘরের কোণে বসে শুধু বংশবৃদ্ধির কাজ ছাড়া আর কোনো কাজ না করে তা হলে সেই জাতি দুনিয়ায় কোনোদিন বড় হতে পারে না।

নয়াচীনে পুরুষ ও নারীর সমান অধিকার কায়েম হওয়াতে আজ আর পুরুষ জাতি অন্যায় ব্যবহার করতে পারে না নারী জাতির ওপর। আমাদের দেশের কথা চিন্তা করে দেখুন। যদিও আইনে আমাদের দেশে নারী পুরুষের সমান অধিকার, তথাপি আমাদের দেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত লোকের মনে এই ধারণা যে, পুরুষের পায়ের নিচে মেয়েদের বেহেশত। পুরুষ যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। মেয়েদের নীরবে সব অন্যায় সহ্য করতে হবে বেহেশতের আশায়। তার চেয়ে বড় কথা হচ্ছে, মেয়েদের নির্ভর করতে হয় পুরুষদের অর্থের ওপর কারণ আমাদের দেশে অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত কিছু সংখ্যক মোল্লা পর্দা পর্দা করে জান পেরেশান করে দেয়। কোনো পরপুরুষ যেন মুখ না দেখে। দেখলে আর বেহেশতে যাওয়া হবে না। হাবিয়া দোজখের মধ্যে

Scanned with CamScanner

পুড়ে মরবে। আমার দেশের সরলপ্রাণ গরিব অশিক্ষিত জনসাধারণ তাদের কথা বিশ্বাস করে আর বেহেশতের আশায় পীর সাহেবদের পকেটে টাকা গুঁজে দেয়, আর তাদের কথা কোরআন হাদিসের কথা বলে বিশ্বাস করে। কিন্তু ইসলামিক ইতিহাস পড়লে জানা যায় যে, মুসলমান মেয়েরা পুরুষদের সাথে যুদ্ধ ক্ষেত্রে যেত, অস্ত্র এগিয়ে দিতো। আহতদের সেবা শুশ্রূষা করতো। হজরত রসুলে করিমের (সা.) স্ত্রী হজরত আয়েশা সিদ্দিকা নিজে বক্তৃতা করতেন, 'দুনিয়ায় ইসলামই নারীর অধিকার দিয়াছে'

আমাদের দেশে অনেকে চার বিবাহ করে। পুরুষ যদি চার বিবাহ করে তবে মেয়েরা অন্যায় করেছে কি? কোরআনে একথা কোথাও নাই যে, চার বিবাহ করো। কোরআন মজিদে লেখা আছে যে, এক বিবাহ করো। তবে তুমি দুই বা তিন বা চারটা পর্যন্ত বিবাহ করতে পারো যদি সকল স্ত্রীকে সমানভাবে দেখতে পারো। কিন্তু আমি প্রশ্ন করি, এমন কোনো মানুষ জন্মগ্রহণ করেছে কি যে সমানভাবে সকল স্ত্রীকে দেখতে পারে? কোনোদিন পারে না। তাই যদি না পারে তবে চার বিবাহ করতে পারে না। আল্লাহর হুকুম সেখানে অমান্য করা হয়।

আমি একজন মওলানা সাহেবের কথা জানি, যিনি চার বিবাহ করেছেন, কিন্তু ছোট বিবিকে সাথে নিয়া ঢাকা শহরে থাকেন। আর অন্যান্য বিবিরা গ্রামে কষ্ট করে থাকেন। বৎসরে একদিনও স্বামীর সাথে দেখা হয় না তাদের। আর ছোট বিবি বৎসরের মধ্যে বারো মাস তার সাথে থাকেন। এখানে কোথায় আল্লাহর হুকুম মানা হলো? কোরআনে অন্যভাবে বেশি বিবাহ করা নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে। নয়াচীনে বেশি বিবাহ প্রথা তুলে দেওয়া হয়েছে; যদি স্ত্রীকে পছন্দ না করো তবে তাহাকে তালাক দিয়া অন্য বিবাহ করতে পারো। আবার তালাক কেন দিচ্ছো তার প্রমাণ করতে হবে কোর্টে।

তবে একটা অদ্ভুত নতুন প্রথা করা হয়েছে নয়াচীনে, সেটা হলো অবিবাহিত মেয়েদের ছেলেমেয়ে হলে, সরকার সেই ছেলেমেয়েদের রাষ্ট্রের ছেলেমেয়ে হিসাবে গ্রহণ করে। নয়াচীন সরকার যে মেয়েদের অবিবাহিতকালে ছেলেমেয়ে হয় তাদের কোনো শাস্তির ব্যবস্থা করে নাই। অন্যপক্ষে, যদি কেউ তাদের হিংসা বা ঘৃণা করে তাদের শাস্তির ব্যবস্থা আছে। আমি এটা স্বীকার করি যে, ছেলেমেয়েদের কোনো দোষ নাই। তারা নিরপরাধ, তাদের যদি কেউ হিংসা বা ঘৃণা করে তবে তাতে যথেষ্ট অন্যায় হবে এবং তাদের শাস্তি দেওয়া উচিত।

Scanned with CamScanner

কিন্তু যে মেয়েদের অবিবাহিতকালে ছেলেমেয়ে হয়, তাদের কোনোরকম শাস্তির ব্যবস্থা না হলে দেশে ভবিষ্যতে উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দেবে কি না সেটা ভাববার কথা। যদিও নয়াচীনের অনেকে বলেছে তাতে উন্নতি হয়েছে, উচ্ছৃঙ্খলতা কমে গেছে। কারণ, ছেলেমেয়ে ইচ্ছা করলেই যখন বিবাহ করতে পারে, তখন আর মানুষ খারাপের দিকে যাবে কেন? আমার এখানে মতামত দেওয়া উচিত হবে না। কারণ আমি এদের কথায় সন্তুষ্ট হতে পারি নাই। তবে প্রথাটা আমার ভালো লাগে নাই। ফলাফলের অপেক্ষায় রইলাম।

নারী-পুরুষের সমান অধিকার কায়েম হওয়ার পরে মেয়েদের ওপর যে অসম্ভব রকমের অত্যাচার পূর্বে হতো তা আজ চীনে বন্ধ হয়ে গেছে। নয়াচীন সরকারের মধ্যে বড় বড় পদ মেয়েরা আজ অধিকার করেছে যেমন, ম্যাডাম সান ইয়াৎ-সেন আজ সহসভাপতি এবং আর একজন মহিলার সাথে আলাপ হয়েছিল তিনি হলেন নয়াচীন সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ম্যাডাম লু।

যে সমস্ত ফ্যাক্টরি, কলকারখানা, সরকারি অফিসে আমি গিয়াছি সেখানেই দেখতে পেয়েছি মেয়েরা কাজ করছে; তাদের সংখ্যা স্থানে স্থানে শতকরা ৪০ জনের ওপরে। নয়াচীনের উন্নতির প্রধান কারণ পুরুষ ও মহিলা আজ সমানভাবে এগিয়ে এসেছে দেশের কাজে। সমানভাবে সাড়া দিয়াছে জাতি গঠনমূলক কাজে। তাই জাতি আজ এগিয়ে চলেছে উন্নতির দিকে।

সরকারি কর্মচারীদের বেতন সম্বন্ধেও আমি যথেষ্ট আলোচনা করেছিলাম নেতৃবৃন্দের সাথে। অনেককে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কী হারে বেতন দেওয়া হয় সরকারি কর্মচারীদের? শুনে আশ্চর্য হলাম, কারণ এ কথা আমরা চিন্তা করতেও পারি না। সে দেশে আয় হিসাবে ব্যয় করা হয়। আমি জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম, ৬০ কোটি লোকের বিরাট দেশের প্রধান কর্মকর্তা মাও সে তুং আমাদের টাকার ৫০০ শত টাকা মাসে গ্রহণ করে থাকেন। এইভাবে সরকারি কর্মচারীদের বেতন দেওয়া হয়। নিচে ৫০ টাকা আর উপরে ৫০০ টাকার বেশি কেউ গ্রহণ করতে পারে না, আর যাতে ৫০ টাকায় সংসার চলে তার বন্দোবস্ত সরকার করে থাকেন। সরকারি দোকান থেকে ন্যায্যমূল্যে জিনিসপত্র কিনতে পারে। জিনিসের দামের সামঞ্জস্য থাকলে ৫০ টাকায় সংসার চালানো কষ্টকর হয় না। সরকার সমস্ত গরিব কর্মচারীদের ছেলেমেয়ের শিক্ষার ভার নিজেই গ্রহণ করে। তাদের থাকবার জন্য বাড়ির বন্দোবস্ত করে দেওয়া হয়, আর চিকিৎসা যাতে পেতে পারে

Scanned with CamScanner

তারও যথাযথ ব্যবস্থা আছে। যারা বড় বড় কর্মচারী বা রাষ্ট্রপ্রধান তাঁরা ৫০০ টাকা বেতনের সাথে বাড়ি পায়, গাড়ি পায় এবং নানা সুযোগ-সুবিধা পায়। চেয়ারম্যান মাও সে তুং ৫০০ টাকা বেতন নিলেও আর সকল কিছুই ফ্রি পান। তবে তিনি নিজে ছোট্ট একটা বাড়িতে থাকেন। যদিও সে বাড়ির কাছে সাধারণ লোক যেতে পারে না। বিরাট রাজপ্রাসাদের ভিতর, ছোট একটা দালানে থাকেন। আর সে প্রাসাদে তার নিজস্ব কর্মচারীরা থাকেন। এবং তাদের অফিস, বাড়ি খুব বেশি গার্ড দিয়ে রাখা হয়।

আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "আপনাদের নেতাকে তো সকলে ভালোবাসেন তবে তিনি ওভাবে গার্ডের ভিতর বাস করেন কেন?" তারা উত্তর দিলো, "দুনিয়া ভরা আমাদের শত্রু। মাও-কে হত্যা করার জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় করতে অনেক সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র প্রস্তুত। তাই তাঁকে আমরা গার্ড দিয়ে রাখি। তিনি আমাদের নেতা, ৬০ কোটি লোকের আস্থা আছে তাঁর ওপর। তাঁর ওপর আমাদের রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। দুনিয়ায় সৎ লোকদের শত্রুও বেশি হয়। এছাড়াও ঘরের শত্রুও আছে তা আপনারা জানেন, চিয়াং কাইশেক ও তার দলবলেরা যাদের জনসাধারণ দেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, তারা সুযোগ পেলেই আমাদের নেতাকে হত্যা করতে দ্বিধাবোধ করবে না। বিশ্বাসঘাতক সকল দেশেই আছে।" তখন আমার মনে পড়লো পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মরহুম লিয়াকত আলী খানের কথা। যদিও অনেক বিষয়ে তাঁর সাথে আমাদের অমিল ছিল, কিন্তু আমরা কোনোদিন এটা বিশ্বাস করি না যে, অন্যায়ভাবে কোনো জাতীয় নেতাকে হত্যা করে দেশের কল্যাণ করা যায়। তাই তাঁর এই হত্যার নিন্দা আমরা করেছিলাম, যে দোষী তাকে ধরে শাস্তি দেওয়ার জন্য আমরা বহুবার দাবি করেছিলাম।

যা হোক, বেতন ও মাহিনা সম্বন্ধে আলোচনা করতে করতে অনেক দূর চলে এসেছি। কথা হলো, আমাদের দেশে যেভাবে সরকারের থেকে বেতন দেওয়া হয় তার চেয়ে অন্যায় আর কিছু হতে পারে না। আমাদের দেশের সকলের চেয়ে বড়—রাষ্ট্রপতি বেতন পান মাসে বারো হাজার টাকা, আর বাড়ি গাড়ি সকলই ফ্রি। আর সকলের চেয়ে ছোট কর্মচারী বেতন পায় ২০/২৫ টাকা। অন্যান্য মন্ত্রী ও কর্মচারীরা বেতন পায় ২ হাজার, ৩ হাজার, ৪ হাজার করে মাসে, অনেকের বাড়ি ফ্রি, গাড়ি ফ্রি। বেতন বেশি দিতে কেহ আপত্তি করতো না, যদি রাষ্ট্রের আয় বেশি হতো। গরিব কর্মচারীদের দুঃখের সীমা নাই। একজন গরিব কেরানি ৮০/৯০/৫০/৬০ টাকা বেতন পায়। তাই দিয়ে

Scanned with CamScanner

ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিখাতে হয়, কাপড়চোপড় কিনতে হয়, বাসা ভাড়া করতে হয়। আবার একটু পরিষ্কার কাপড় পরতে হয়। তারপর, ছেলেমেয়েদের জন্য অন্য ব্যয় আছে, নিজেদের খেয়েও বাঁচতে হয়। এর মধ্যে আবার জিনিসপত্রের দামের স্থিরতা নাই। মাঝে মাঝে কাপড়ের দাম, চাউলের দাম, বইপুস্তকের দাম, ওষুধপাতি, যাবতীয় নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বেড়ে যায়। তাতে দু'খানা কাপড় কিনতে অনেকের এক মাসের বেতন ব্যয় হয়ে যায়। জিনিসের মূল্যে স্থিরতা ও সামঞ্জস্য না থাকলে সামান্য বেতন বাড়লেও কোনো লাভ হয় না। তাই জিনিসের দামের স্থিরতা এবং ন্যায্যমূল্য ও সামঞ্জস্য থাকা চাই। তাহলেই গরিব কর্মচারীরা কোনোমতে বাঁচতে পারে। তাদের ছেলেমেয়েদের ফ্রি শিক্ষার বন্দোবস্ত করা উচিত এবং সাথে সাথে তাদের জন্য অল্প খরচে বাড়ির বন্দোবস্ত করে দেওয়া উচিত—যাতে তাদের বেশি ভাড়া দিয়ে বাড়ি ঠিক করতে না হয়। আমি যখন জেলে ছিলাম এক সিপাহি আমাকে বলেছিল যে, "৬০ টাকা বেতন, তার মধ্যে বাসা ভাড়া দিতে হয় ১৮ টাকা। কারণ যে সামান্য কয়েকটা সরকারি বাড়ি আছে তাহা অন্য সিপাহিদের দেওয়া হয়েছে। আমাকে দেওয়া হয় নাই। কারণ আমি বড় কর্তাদের দালালি করতে পারি নাই।" আমি বললাম, "তাদের যদি না দেওয়া হতো তাহলে তো তাদেরও আপনার মতো দশা হতো। তাই একই কথা। এটা সত্য কথা যে একদিনে হয় না, কিন্তু সুষ্ঠু কর্মপন্থা থাকা দরকার।"

নয়াচীনেও সরকার সকলের বাসস্থান ব্যবস্থা সম্পূর্ণ কার্যকরী করতে পারে নাই। সকলকে বাড়ি দিতে পারে নাই। আমাকে তারা বলেছে যে, সকলকে সমানভাবে রাখতে, আমাদের আরও সময় লাগবে।

আমাদের দেশে প্রোপাগান্ডা হয় যে, নয়াচীনে সকলকে সমান করে দেওয়া হয়েছে—তা সত্য নয়। বড় বড় কর্মচারী গরিব কর্মচারীদের থেকে কিছুটা সুযোগ-সুবিধা বেশি পায়। তাদের বেতনও বেশি। একথা সত্য যে, চীনে সকলে যাতে বাঁচবার মতো সুযোগ সুবিধা পায় তা সকলকে দেওয়া হয়। একজনে চাকরি করে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যাংকে জমা করে, আর একজন না খেয়ে কষ্ট করে, তাহা উঠে গেছে। আরাম করো আপত্তি নাই, তবে কেউ না খেয়ে থাকতে পারবে না, এই হলো নীতি। তাই আজকাল নয়াচীনে কোনো কর্মচারী ঘুষ খেতে পারে না, আর খেতে চায়ও না। যদি ঘুষ ধরা পড়ে তবে তার সেই মুহূর্তে ভীষণ শাস্তি পেতে হয়। তারা বলে, তোমাদের বেতনে যখন

Scanned with CamScanner

সংসার চলে যাচ্ছে তখন ঘুষ খাও কেন? আমাদের দেশের কথা আলাদা, এখানে ঘুষ না খাওয়াই ব্যতিক্রম। অনেকে পেটের দায়ে ঘুষ খেতে বাধ্য হয়। আর অনেকে ব্যাংকে টাকা জমা করার জন্য খায়। ইংরেজ আমলে বড় বড় কর্মচারীরা একটু কম ঘুষ খেতো। এখন অনেকেই ঘুষ খায়।

আমি জানি, অনেক কর্মচারী দুই তিন হাজার টাকা বেতন পায়, তথাপি ঘুষ খায়। এও জানি ২০০ টাকা বেতন পায় তার মধ্যেই সংসার চালায়, ছেলেমেয়ের স্কুল-কলেজের খরচ দেয়, তারপরও চল্লিশ হাজার টাকা খরচ করে ঢাকা শহরে বাড়ি কেনে বা করে।

১৪ বৎসরে রাজনীতিতে আমার শিখবার ও দেখবার যথেষ্ট সুযোগ হয়েছে পূর্বে শুনতাম, দারোগা পুলিশের মতো ঘুষ কেউ খায় না। তারপর শুনতাম, সিভিল সাপ্লাইয়ের মতো ঘুষ কেউ খায় না, তারপর শুনতাম কাস্টমস অফিসারদের মতো ঘুষ কেউ খায় না। আমি কয়েক বৎসর রাজবন্দি হিসেবে জেল খেটেছি, তাতে দেখেছি জেলখানার ঘুষের মতো বৈজ্ঞানিকভাবে ঘুষ বোধ হয় কোনো ডিপার্টমেন্টের কর্মচারীরা নিতে জানে না। কোনো দুর্নীতি দমন বিভাগের কর্মচারীর উপায় নাই যে সে ঘুষ ধরে! জেলখানা, পুলিশ ডিপার্টমেন্ট, সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেন্ট, কাস্টমস, কোর্ট-কাচারি, সাব রেজিস্ট্রার অফিস, ইনকাম ট্যাক্স, কারো চেয়ে কেউ কম না, এই ধারণাই আমার শেষ পর্যন্ত হয়েছে জাতির নৈতিক পরিবর্তন ছাড়া ও সুষ্ঠু কর্মপন্থা ছাড়া দেশ থেকে দুর্নীতি ও ঘুষ বন্ধ করা সম্ভব হবে না। এই দুর্নীতি কঠোরভাবে দমন করা দরকার। নিরাপত্তা আইন যদি ব্যবহার করতে হয় তবে এদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করলে বোধ হয় জনসাধারণ এই নিরাপত্তা আইনের কোনো সমালোচনা করতো না। সকলের চেয়ে দুঃখের কথা হলো, অনেক দুর্নীতিপরায়ণ নেতা দেশে আছে যারা শাসকগোষ্ঠীর সাথে হাত মিলাইয়া চোরাকারবার করে লক্ষ লক্ষ টাকা উপায় করে। যখন তাদের বিরুদ্ধে কোনো সৎ কর্মচারী মামলা দায়ের করতে চায় তখনই বড় বড় মন্ত্রীরা এই সমস্ত কর্মচারীদের বদলি করে মামলা ধামাচাপা দেয়।

নয়াচীন থেকে দুর্নীতি তুলে দেওয়া সম্ভব হয়েছে এই কারণে যে, রাষ্ট্রের কর্ণধাররা ঘুষ দুর্নীতি তুলে দিতে বদ্ধপরিকর। আমি নয়াচীনে একটা ঘটনা শুনেছিলাম যে, মাও সে তুংয়ের একজন প্রধান বন্ধু এবং নয়াচীনের নেতা দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিয়েছিল বলে তাকে বিচার করে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল।

Scanned with CamScanner

ইচ্ছা করলে মাও সে তুং তাকে রক্ষা করতে পারতেন কিন্তু বিচারে যাকে ফাঁসির হুকুম দিয়েছে তাকে রক্ষা করা অন্যায়। ইসলামি রাষ্ট্রের খলিফাদের সময় এইভাবে ভাইকেও অন্যায় করলে খলিফারা ক্ষমা করতেন না। দরকার হলে ফাঁসি দিয়ে হত্যা করতেন। এরকম বহু ইতিহাস আছে। দুঃখের বিষয় কয়েকজন মুসলমান নামধারী নেতা পবিত্র ইসলামের নাম ব্যবহার করে দুর্নীতি, ঘুষ ও চোরাকারবারিকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। নিজেরাও অনেকে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করেছে। দেশের রাষ্ট্রনায়করা যদি দুর্নীতিপরায়ণ হয় তবে আর দেশের কর্মচারী ও জনগণ দুর্নীতিপরায়ণ কেন হবে না?

দুর্নীতি সমাজের ক্যানসার রোগের মতো। একবার সমাজে এই রোগ ঢুকলে সহজে এর থেকে মুক্তি পাওয়া কষ্টকর। আমাদের দেশের বিচারে একটা লোক আর একজনকে হত্যা করলে বিচারে তাকে ফাঁসি দেওয়া হয়। ডাকাতি করলে বা চুরি করলে তাকে কয়েক বৎসর ধরে সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। একটা লোক হঠাৎ রাগের বশবর্তী হয়ে আর একটা লোককে হত্যা করলো, যাকে হত্যা করা হয় তার সংসারটা খতম হয়ে যায়। কারণ, সেই লোকটার ওপর সমস্ত সংসার নির্ভর করে। কিন্তু চোরাকারবারিকে ফাঁসি দেওয়া হয় না, ফাঁসি যদি কাহাকেও দিতে হয়, তবে চোরাকারবারি ও দুর্নীতিপরায়ণ লোকদেরই দেওয়া উচিত। একজন চাউলের চোরাকারবারি লক্ষ লক্ষ মন চাউল জমা রেখে লক্ষ লক্ষ লোককে না খাইয়ে মারে। আর একজনকে হত্যা করলে যদি ফাঁসি হয়, তবে হাজার হাজার লোকের যারা মৃত্যুর কারণ তাদের কী বিচার হওয়া উচিত? ধরুন, একজন কাপড়ের চোরাকারবারির জন্য অনেক মহিলা ইজ্জত রক্ষা করার সামান্য কাপড় জোগাড় করতে না পেরে আত্মহত্যা করে। তবে তার বিচারে কী হবে? সে তো লক্ষ লক্ষ নারীর ইজ্জত ও জীবন নষ্ট করেছে। আমি জানি আমাদের দেশের এক স্বনামধন্য মুসলিম লীগওয়ালা একমাত্র কাপড়ের চোরাকারবার করে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করেছে। তবে ইলেকশনে দাঁড়াইয়া লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করেও ভোট পান নাই। তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার জন্য সরকারি কর্মচারীরা চেষ্টা করেছিল, তখন তাদের বদলি করে দিয়ে সেই চোরাকারবারিকে রক্ষা করা হয়েছিল। এমনকি শোনা যায় যে, ফাইলগুলি পূর্ব বাংলা থেকে উড়ে করাচি চলে গিয়াছিল এবং কোনো এক মন্ত্রীর বাক্সের মধ্যে ফাইলগুলি আটকাইয়া রাখা হয়েছিল। এতবড় যেখানে দুর্নীতি সেখানে সরকারি কর্মচারীরা কোন সাহসে বড় বড় চোরাকারবারিদের গায়ে হাত দেবে?

Scanned with CamScanner

নয়াচীনকে এখানে সত্যিকারের ধন্যবাদ দিতে হয়। কোনো দোকানদারও ঠিক করা দামের চেয়ে এক পয়সা বেশি নিতে সাহস পায় না। কারণ, তারা জানে সরকার টের পেলে আর উপায় থাকবে না। সেখানকার সরকার দেশের থেকে দুর্নীতি মুছে ফেলতে বদ্ধপরিকর। যারা দুর্নীতিপরায়ণ তাদের ওপর কারো মায়া নাই, মমতা নাই, স্নেহ নাই, ভালোবাসা নাই, সকলেই তাকে ঘৃণা করে। সাধারণ লোক এই সমস্ত দুর্নীতিপরায়ণ লোকদের দেখলে নাকি মুখে থুতু দেয়। সত্য মিথ্যা জানি না, তবে এরকম গল্প নয়াচীনে শুনেছি। সে দেশের লোকও সাড়া দিয়াছে সরকারের দুর্নীতি নির্মূল কর্মকাণ্ডে। যদি কোনো কর্মচারী ঘুষ নেয় বা চায় তবে তার আর রক্ষা নাই, তখন জনগণ একমত হয়ে তার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলে। সরকারও তখন কঠোর ব্যবস্থা নেয়। আমাদের দেশে জনগণ সত্যই এভাবে এগিয়ে আসে নাই। সরকারও কঠোর হয় নাই।

একদিন এক বাড়িতে আমি গিয়াছিলাম, নাম বলবো না বা ঠিকানা দিবো না। সে ভদ্রলোকের একটা ছেলে ছিল, আমার সাথে পড়তো। ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনার ছেলে কোথায়?" তিনি বললেন, "ও চাকরি করে।" আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "কী চাকরি করে?" বললেন, "চাকরি বেশি ভালো না, তবে একশত টাকা বেতন পায় আর কিছু উপরিও আছে।" উপরি, মানে ঘুষও পায়। আমি আশ্চর্য হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। তারপর নিজকে আমি সামলিয়ে নিয়ে বললাম, "তবে তো বেশ ভালোই আছে!"

ভেবে দেখুন, সমাজ কোথায় গিয়েছে! ছেলে ঘুষ খায় পিতা তাহা গর্বের সাথে ঘোষণা করে। সমাজ কত নেমে গেলে এই অবস্থায় আসতে পারে!

আমার দেশের এক নেতা একদিন আমার কাছে গর্ব করে বলেছিলেন যে, তাঁর জামাই এক পয়সা বাড়ির থেকে না নিয়ে ব্যবসা করে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করেছে। আমি একটু মুখপোড়া মানুষ, মনে যা আসে এবং তা সত্য হলে মুখের ওপর বলে দি। কাউকেও ভয় করি না। আর চক্ষুলজ্জা একটু কম। বললাম, "বিনা টাকায় ব্যবসা হয় এটা তো জানতাম না।" তবে হয়, আমাদের দেশের পীর সাহেবদের। ফুঁ দিয়া ধর্মের কথা বলে মানুষের কাছ থেকে টাকা নিয়ে বড় বড় ঘর করে ও জমি কেনে, কোনো কাজকর্ম করে না। এটা একটা ব্যবসা। আর একটা ব্যবসা রাতে ঘরে সিং কাটা অথবা ডাকাতি করা। যাতে কোনো অর্থের প্রয়োজন হয় না। আর একটা ব্যবসা আছে যেটা

Scanned with CamScanner

বিনা টাকায় হয় সেটা বেশ্যাবৃত্তি করা। এছাড়া বিনা টাকায় কোনো ব্যবসা হয় বলে আমার জানা নাই। এখন আমাদের দেশের নতুন এক ব্যবসা হয়েছে 'পারমিটের ব্যবসা'। মন্ত্রীদের দালালি করে, যদি একটা পারমিট পাওয়া যায় তা বিক্রি করলে কিছু টাকা আসে। যদিও সেই পারমিট বিক্রিতে গরিবের অনেক ক্ষতি হয়। তবু টাকা পাওয়া যায়।

নয়াচীন থেকে ঘুরে এসে আমার এই মনে হয়েছে যে, জাতির আমূল পরিবর্তন না হলে দেশ থেকে দুর্নীতি দূর করা কষ্টকর। নতুন করে সকল কিছু ঢেলে সাজাতে হবে। ভাঙা দালানে চুনকাম করে কোনো লাভ হয় না—বেশি দিন টিকে না। আবার ভেঙে পড়ে। পুরান দালান ভেঙে ফেলে দিয়ে নতুন করে গড়ে তুললে, ঘুণ ধরতে বা ভেঙে পড়তে অনেক সময় লাগে। সাথে সাথে ভিত্তিটা মজবুত করতে হয়। ভিত্তি মজবুত না হলে সামান্য বাতাসে ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই, নয়াচীনে দেখেছি তারা ভিত্তি মজবুত করে কাজ শুরু করেছে।

সত্য কথা বলতে কি—নতুন দেশ, নতুন মানুষ, নতুন তাদের ব্যবহার। মনে হয় সকল কিছুর মধ্যেই নতুনত্ব।

আপনাদের জানা আছে, চীন দেশ ৬০ কোটি লোকের দেশ। তিন সম্প্রদায়ের লোকেরা সে দেশে বাস করে। শতকরা প্রায় ৮০ জনই বৌদ্ধ, প্রায় ৫ কোটি মুসলমান আর কিছু খ্রিষ্টান। কয়েকটা প্রদেশে মুসলমানদের সংখ্যা বেশি, এমনকি শতকরা প্রায় ৯০ জন মুসলমান। আর অন্যান্য প্রদেশেও মুসলমান কিছু কিছু আছে। চিয়াং কাইশেকের সময় বহু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা হতো। হাজার হাজার নিরীহ লোক মারা যেত। এক সম্প্রদায় আরেক সম্প্রদায়ের ওপর অত্যাচার চালাতো। ধর্মের নামে বহু জুয়াচুরি চলতো। কুসংস্কার দেশের মধ্যে অনেক বেশি ছিল।

সিং কিয়াং প্রদেশের গভর্নর জনাব বোরহান শহীদ, পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর জনাব হালিম ও একজন সাধারণ কর্মী জনাব ইউসুফের সাথে আলাপ করে মুসলমানদের দুরবস্থা সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছি। জনাব ইউসুফের দুই ভাইকে চিয়াং কাইশেকের সৈন্যরা হত্যা করেছিল। তাঁর বৃদ্ধ পিতাকেও হত্যা করা হয়েছিল, বাড়ি জ্বালাইয়া দেওয়া হয়েছিল—এই জন্য যে তারা মাও সে তুং সরকারের সমর্থক ছিলেন। ইউসুফ আমাকে বলেছিল যে, সাধারণ মুসলমানরা চিয়াং কাইশেককে সমর্থন করতো না। কারণ, তার

Scanned with CamScanner

শাসনের সময় মুসলমানদের ওপর অমানুষিক অত্যাচার করা হতো। তার সময় মাঝে মাঝে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়ে মুসলমানদের ঘর বাড়ি ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে, তার অনেক নজির আছে। বহু লোককে হত্যা করা হয়েছে, যাদের অনেকের নাম সে আমাকে বলেছিল, মনে নাই।

তখন ধর্মের নামে শোষণ চলতো। ধর্মকে ব্যবহার করা হতো শোষক সম্প্রদায়ের সুবিধার জন্য। শুধু মুসলমান ধর্মের মধ্যেই এই প্রবণতা ছিল না, প্রত্যেক ধর্মের মধ্যেই ছিল। সকলের চেয়ে বেশি ছিল বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে। রাষ্ট্রনায়করা বৌদ্ধ ধর্মের রক্ষাকর্তা হিসাবে দেশকে ধর্মের নামে শাসন ও শোষণ করতো এবং ধর্মকে ব্যবহার করতো নিজেদের স্বার্থের জন্য। বৌদ্ধ ধর্মের অহিংস নীতি তখন আর ছিল না, সেটা হিংসায় পরিণত হয়েছিল। হাজার হাজার লোককে গুলি করে হত্যা করে চিয়াং কাইশেকের দল। দাঙ্গা-হাঙ্গামা লাগিয়ে রাখতো নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য। এটা শোষক সম্প্রদায়ের নীতি। জনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে তাদের শাসন ব্যবস্থা কায়েম রাখতো। যখন জনগণের ভিতর গণআন্দোলন শুরু হতো, তারা ভাত-কাপড় দাবি করতো, অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য বদ্ধপরিকর হতো, তখনই শোষকগোষ্ঠী এক সম্প্রদায়কে অন্য সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে লেলাইয়া দিতো, যাতে তাদের গণআন্দোলনকে অন্যদিকে ধাবিত করতে পারে। এবং দেখা যেত অশিক্ষিত জনসাধারণ নিজেদের বাঁচবার দাবি ভুলে যেয়ে সম্প্রদায়গত স্বার্থকে বড় করে দেখতো। এটা শোষক গোষ্ঠীর নিয়ম। যুগ যুগ ধরে এই নিয়মে জনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে তারা তাদের শোষণ ও শাসন চালাতো।

মানুষ যদি সত্যিকারভাবে ধর্মভাব নিয়ে চলতো তাহলে আর মানুষে মানুষে এবং রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে এইভাবে যুগ যুগ ধরে সংগ্রাম হতো না। কিন্তু মানুষ নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য ধর্মের অর্থ যার যেভাবে ইচ্ছা সেইভাবে চালাতে চেষ্টা করেছে। সেই জন্য একই ধর্মের মধ্যে নানা মতের সৃষ্টি হয়েছে। ধরুন রসুলে করিম (দ.) ইসলাম ধর্মকে যেভাবে রূপ দিয়েছিলেন সেইভাবে যদি ধর্ম চলতো তাহা হলে আজ আর মানুষে মানুষে এ বিরোধ হতো না। কিন্তু সেই ইসলাম ধর্মের মধ্যে কত বিভেদ সৃষ্টি করা হয়েছে। সুন্নি, শিয়া, কাদিয়ানি, ইসমাইলি, আগাখানি, আবার মোহম্মদি, ওহাবি, কত রকমের বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে একই ধর্মের মধ্যে। এর অর্থ কী? আমরা দেখতে পেয়েছি শুধু হিন্দু, মুসলমান, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ ধর্মের লোকেরাই একে অন্যের

Scanned with CamScanner

সঙ্গে দাঙ্গাহাঙ্গামা করে নাই। শিয়া সুন্নি দাঙ্গার কথা আপনারা জানেন, হাজার হাজার মুসলমান মুসলমানকে হত্যা করেছে। আপনারা এও জানেন, কাদিয়ানি-শিয়া-সুন্নিদের সাথে পাঞ্জাবে যে হত্যাকাণ্ড হয়ে গেছে তার নজির বোধ হয় ইতিহাসে বিরল। এর কারণ কী? আজ ধর্ম কোথায়? আর যারা আমাদের ধর্মের গুরু তাদের অবস্থা কী? একবার চিন্তা করলে বুঝতে পারবেন, আমাদের দেশে এককালে এই সকল তথাকথিত ধর্মগুরু বা পীর সাহেবরা ইংরেজি পড়া হারাম বলে আমাদের জাতির কী ভয়ানক ক্ষতি করেছে। সৈয়দ আহমদ যখন ইংরেজি পড়ার জন্য আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টি করলেন তখন তাঁকে এই সকল পীর সাহেবরা ফতোয়া দিলো 'কাফের' বলে। জিন্নাহ সাহেব যখন পাকিস্তানের আন্দোলন শুরু করলেন তখন এই সমস্ত পীর সাহেবরা কায়েদে আজমের বিরুদ্ধে কী জঘন্য ভাষায় আক্রমণ করেছিল। হাজার হাজার প্যামফ্লেট কংগ্রেসের টাকা দিয়া ছাপাইয়া দেশ বিদেশে বিলি করেছিল। ইসলামের নামে তারা কোরআন ও হাদিস দিয়া প্রমাণ করে দিতে চেষ্টা করতো যে পাকিস্তান দাবি করা, আর কোরআনের খেলাফ কাজ করা একই কথা। আর একদল পীর মওলানারা বলতো এবং কেতাব কোরআন দিয়া প্রমাণ করতো যে পাকিস্তান চাওয়া জায়েজ আছে।

আমার মনে আছে, যখন আমি সিলেটে গণভোটে যাই, আমার সাথে প্রায় তিনশত কর্মী ছিল। সিলেটে দেওবন্দের পাশ করা প্রায় ১৫ হাজার মওলানা আছেন। তারা প্রায় সকলে একমত হয়ে ফতোয়া দিলো যে সিলেট জেলা পাকিস্তানে যাওয়া উচিত হবে না এবং কোরআন হাদিস দিয়ে তা প্রমাণ করে দিতে চেষ্টা করলো। সেখানে ভোটাভুটি হবে। লোকে যদি ভোট দেয় পাকিস্তানের পক্ষে তবে সিলেট জেলা পাকিস্তানে আসবে, আর যদি হিন্দুস্তানের পক্ষে ভোট দেয় তবে হিন্দুস্তানে যোগদান করবে। আমরা সকলকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম। কাজ শুরু হলো। হাজার হাজার মওলানা লম্বা জামা পরে কংগ্রেসের টাকা নিয়ে বক্তৃতা শুরু করলেন, পাকিস্তানে ভোট দেওয়া হারাম। আমরা বলতে শুরু করলাম ওরা ভাড়াটিয়া মওলানা, ওদের কথা শুনো না।

একটা ঘটনা বলতে চাই। সোহরাওয়ার্দী সাহেব সিলেটে খবর দিলেন যে তাঁর শ্রেষ্ঠ কর্মীদের পাঠাবেন। যে জায়গায় অসুবিধা সেখানে তাদের পাঠালে খুব ভালো হবে। তার মধ্যে তিনি আমার নামও দিয়েছিলেন। কারণ তিনি মনে করতেন, আমি খুব ভালো কর্মী, আর বক্তৃতাও করতে

Scanned with CamScanner

পারি। আমাকে ও আমার দলবলকে এমন জায়গায় পঠানো হলো যে, যেখানে পাকিস্তানের পক্ষে কথা বললেই মওলানারা মারে। যারা সভা করতে পূর্বে চেষ্টা করেছে তাদের কপালে অনেক কিছু হয়েছে। আমি যাওয়ার পরে বিয়াবহ নামক স্থানে সভ করবো বলে ঘোষণা করলাম এবং সদলবলে রওয়ানা হলাম। কিছু লোক সেখানে পাকিস্তানকে সমর্থন করতে লাগলো। তাদের প্রায় সকলেরই দাড়ি নাই। ভয়েতে তারা অস্থির। আমি প্রায় ৪০ জন বাছাবাছা কর্মী নিয়ে একদিন পূর্বে সেখানে পৌছলাম। কর্মীরা সব নেমে গেল বাড়ি বাড়ি ক্যানভাস করতে, আর দাবি করলো আপনারা ভোট না দেন কিন্তু আমাদের কিছু বলতে দেন। আপনারা শোনেন, পছন্দ না হয় ভোট দিবেন না।

দুয়ারে দুয়ারে কর্মীরা ঘুরতে আরম্ভ করলো। কিছু স্কুলের ছাত্রও আমাদের ছেলেদের সাথে জুটলো। দেশের মধ্যে কিছু লোক ঘুষখোর থাকতে পারে কিন্তু সাধারণ মানুষ তো আর খারাপ না, তারা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ। তারা অনেকে বললেন, বলুক না ওরা কী বলতে চায়। যা হোক সভার দিন সকাল সকাল আমরা উপস্থিত হলাম। যেয়ে দেখি আবার কংগ্রেসী মওলানাদের দলও এসেছে। তারা প্রস্তাব করলো যে, 'সভা করতে পারো আগে তবে বাহাস (বিতর্ক) করতে হবে। তোমরা পূর্বে বলো, আর আমরা পরে বলবো।' বাধ্য হয়ে কিলের ভয়েতে আমাদের মেনে নিতে হলো। প্রায় দশহাজার লোক সভায় উপস্থিত হয়েছে। তারাও বললো, আচ্ছা দুই পক্ষের কথাই আমরা শুনবো। হায় খোদা! দেখি প্রায় ৮/১০ জন বিরাট বিরাট মওলানা। এক জনের নাম এক পৃষ্ঠা, আলী হজরত থেকে আরম্ভ করে অনেকদূর বলতে হয়। আমার তো দেখে প্রাণ শুকিয়ে গিয়েছে। তারা সভায় বহু কেতাব কোরআন নিয়েও এসেছে; প্রমাণ করে দেবে যে পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দেওয়া হারাম। ভাবি, হায় হায় শেষ হয়ে যাবো! আমার সাথে শুধু এক স্কুলের মৌলবী সাহেব, তিনি কিছু কোরআন হাদিস জানেন। ওদের দিকে চেয়ে তারও অবস্থা কাহিল। আর আমার সাথে ছিল করিমগঞ্জ মহকুমার গণভোট কমিটির প্রেসিডেন্ট ফোরকান আলি মুন্সী সাহেব।

আমরা বিদেশি মানুষ, আমাদের পূর্বে বলতে দেওয়া হলো। স্কুলের মৌলবি সাহেব আধঘণ্টা খানেক কোরআন হাদিস দিয়ে কিছু বোঝালেন। আর ফোরকান আলি মুন্সী সাহেব আধ ঘণ্ট কিছু বললেন আর আমার ভাগ্যে হলো দুই ঘণ্টা। সোহরাওয়ার্দী সাহেব আমাকে মাইক্রোফোন দিয়েছিলেন,

Scanned with CamScanner

আমি মাইক্রোফোনে বক্তৃতা শুরু করলাম। পীর সাহেবরা প্রথমে দাঁড়াইয়া ফতোয়া দিলেন, মাইক্রোফোনে কথা বলা হারাম। যা হোক, আমি ওদের হারাম আর হালাল মানি কম। জানি, তা মানলে আর পাকিস্তান আসতো না। বক্তৃতা দুই ঘণ্টা দেওয়ার পরে কর্মীরা 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ, কায়েদে আজম জিন্দাবাদ' শুরু করলো। জনসাধারণও তাদের সাথে মিলে বলতে আরম্ভ করলো। আর যায় কোথায়? পীর সাহেবরা দাঁড়াইয়া আমাকে ও কর্মীদের মারবার জন্য হুকুম দিলো। প্রায় ২/৩ শত লোক লাঠি নিয়ে আমাকে আক্রমণ করলো। আমার সাথে কর্মীরা এসে আমার পাশে দাঁড়ালো। আমি মাথাটা এগিয়ে দিয়ে বললাম, "আমাকে মেরে যদি শান্তি পান, মারুন।" কিন্তু কিছুক্ষণ হৈচৈ করে আর মারলো না, চলে গেল। এ ঘটনাটা বলা আমার এখানে উচিত কি না জানি না, তবুও বললাম এই উদ্দেশ্যে যে, কেমন করে আমাদের দেশের একদল মওলানা টাকার লোভে কোরআন হাদিসের মিথ্যা ব্যাখ্যা করতে পারে। কেন তারা এ কাজ করে? এর অর্থ, তারা এটাকে ব্যবসা হিসাবে গ্রহণ করেছে।

কোনো কাজকর্ম করে না, মানুষকে ফাঁকি দেয়, মাদ্রাসার নামে, মসজিদের নামে, লিল্লা বোর্ডিংয়ের নামে টাকা তুলে নিজেদের ভরণপোষণ করে। চিয়াং কাইশেকের চীনে সেই দশা ছিল। কামাল আতাতুর্কের তুরস্কেরও সেই দশা ছিল।

শুধু মুসলমান সমাজের মধ্যেই এই কুসংস্কার ছিল না, চীন দেশে—বৌদ্ধ সমাজে এর চেয়ে বেশি ছিল। ইসলামের মূল কথা শান্তি, ঈমান, বিশ্বভ্রাতৃত্ব। সেখানে ধর্মযাজকদের দ্বারা শান্তির পরিবর্তে দেখা দিলো অশান্তি, ঈমানের পরিবর্তে বেঈমানি, বিশ্বভ্রাতৃত্বের জায়গায় দেখা দিলো ভাই ভাইকে শোষণ বা নির্যাতন করা।

যেমন বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা স্বয়ং মহামতি বুদ্ধ অহিংস নীতি প্রচার করেছিলেন—সেখানে দেখা দিলো হিংসা, ঘৃণা, অত্যাচার, অবিচার ও শোষণ।

তেমনি আবার দেখা দিলো খ্রিষ্ট ধর্মের মধ্যে, যেখানে ক্রাইস্ট বলে দিয়েছেন, 'এক মুখে আঘাত করলে আরেক মুখ এগিয়ে দাও, ক্ষমাই মহত্ত্বের লক্ষণ।' কিন্তু খ্রিষ্ট ধর্মে বিশ্বাসীরা দুনিয়ার অনুন্নত দেশগুলিকে শোষণ করার জন্য যুদ্ধ করে। নয়া নয়া অস্ত্র তৈরি করে, তার দ্বারা জনসাধারণকে হত্যা করে, সেই দেশগুলিকে শাসন করার নামে শোষণ করে। দরকার হলে লক্ষ লক্ষ নিরীহ

Scanned with CamScanner

লোককে বোমা মেরে হত্যা করে। গ্রামের পর গ্রাম উচ্ছেদ করে। এরাই আবার দুনিয়ায় প্রচার করে, 'আমরা খ্রিষ্টান'। এরা কি জেসাস ক্রাইস্টকে অপমান করে না? যেমন, আমরা মুসলমানরাও কি অসম্মান করি না দুনিয়ার শেষ নবী হজরত রসুলে করিমকে (সা.)? তাঁর আদর্শ পালন না করে তাঁর নাম ব্যবহার করি মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য। তেমনি ভারতের দিকে চেয়ে দেখুন, হিন্দু ধর্মের রক্ষকরা জায়গায় জায়গায় মুসলমানদের হত্যা করছে ধর্মের নামে। এক হিন্দু অন্য হিন্দুর ছোঁয়া পানি পর্যন্ত খায় না, কারণ জাত যাবে!

চীন দেশের অধিকাংশেরও বেশি লোক বৌদ্ধ। তারা সেখানে বৌদ্ধ ধর্মের নামের দোহাই দিয়ে নিরীহ মুসলমানদের ওপর, খ্রিষ্টানদের ওপর অত্যাচার করেছে। চিয়াং কাইশেক সরকার এই অত্যাচার কোনোদিন বন্ধ করতে পারে নাই অথবা চেষ্টা করে নাই।

সরকার ইচ্ছা করলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা বন্ধ করতে পারে না, এ আমি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করি না। আজ হিন্দুস্তানে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু যদিও চান না কোনো সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের ওপর অত্যাচার করুক, কিন্তু তাঁর সরকারের পক্ষে দাঙ্গা বন্ধ করা সম্ভব হচ্ছে না। কারণ, তাঁর দলবলের মধ্যে এমন লোক আছে যারা এটাকে জিয়াইয়া রাখতে চায়। তাই পণ্ডিতজি শত চেষ্টা করেও দাঙ্গা থামাতে সমর্থ হচ্ছেন না। এই একইভাবে চিয়াং কাইশেকের চীনে দাঙ্গাহাঙ্গামা হয়ে গ্রামের পর গ্রাম, শহরের পর শহর ছারখার হয়ে যেত।

নয়াচীন সরকার দাঙ্গা নির্মূলে নজর দিলেন। বিপ্লবের পর মাও সে তুং-এর নেতৃত্বে চীনা কম্যুনিস্ট পার্টি ক্ষমতায় আসার পরে আজ পর্যন্ত একটা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামাও চীনে হয় নাই। যারাই চেষ্টা করেছে, সরকার কঠোরভাবে তাদের শায়েস্তা করে দিয়েছে।

আমাদের দেশে প্রোপাগান্ডা হয়েছে, নয়াচীনে ধর্ম-কর্ম করতে দেওয়া হয় না। এটা যে সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা তার যথেষ্ট প্রমাণ আমরা পেয়েছি। আর যদি আমি নয়াচীনে দেখতাম ধর্ম পালন করতে দেওয়া হয় না, তবে সমস্ত দুনিয়ায় এর বিরুদ্ধে আমি প্রোপাগান্ডা করতাম। কারণ, আমি ব্যক্তিগতভাবে ধর্মে বিশ্বাসী। এবং নিজে একজন মুসলমান বলে গর্ব অনুভব করি।

আমি নিজে চেষ্টা করেছিলাম—ভালোভাবে জানবার জন্য, মুসলমানদের অবস্থা কী? তারা এই সরকারের হুকুমতে কেমন আছে? কী অবস্থায় দিন

Scanned with CamScanner

কাটাচ্ছে। পরে খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারলাম, নয়াচীন সরকার কারও ধর্মকাজে বাধার সৃষ্টি করে না এবং যদি কোনো সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের ওপর বা তাদের ধর্মকাজে বাধার সৃষ্টি করে, তাহলে তাদের কঠোর হস্তে দমন করা হয়। এ রকম অনেক ঘটনার কথা আমাকে অনেক মুসলমান বলেছেন। আমরা নিজেরা মসজিদে গিয়াছি, সেখানে মুসলমানরা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে। প্রত্যেক মসজিদে ইমাম আছে যারা ছেলেমেয়েদের কোরআন হাদিস শিক্ষা দেয়।

ইমাম সাহেবরা বেতন পান। তাদের আমাদের দেশের মতো না খেয়ে ইমামতি করতে হয় না; আর পেট বাঁচানোর জন্য মিথ্যা ফতোয়া দেওয়া লাগে না। আর তাবিজ কবজ, ফুঁ-ফাঁ দিয়া পয়সা নিতে হয় না এবং এই সমস্ত টাকা গ্রহণ করা আইন করে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

যতদূর খবর নিয়া জানলাম, নয়াচীনে একটা প্রতিষ্ঠান আছে যার নাম 'অল চায়না ইসলামিক কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন।' এই প্রতিষ্ঠান থেকে পিকিং সরকারকে সাহায্য করা হয়। আর মুসলমানরা অর্থ দিয়া একে বাঁচাইয়া রাখে। এদের কাজ, ইসলামের নামে যে-সব কুসংস্কার চালু হয়েছে তা মুছে ফেলে দেওয়া, যত মসজিদ আছে তার হিসাব নিয়া ইমাম নিযুক্ত করা। তাদের মাসে মাসে বেতন দেওয়া, আর অনেক ইমামকে জমি বা অন্য কাজ দেওয়া হয়েছে যাতে তাদের পরের দানের ওপর নির্ভর করতে না হয়। এরাই বড় বড় মাদ্রাসা করে, সেখান থেকে পাশ করলে 'মওলানা' বা 'মৌলবি' লেখা যায়। অন্য কোথাও থেকে পাশ করলে 'মওলানা' লেখার ক্ষমতা নাই। এবং এই কমিটিও তেমন কাউকে মওলানা হিসাবে গ্রহণ করবে না। পাশ করার পরে আবার একটা পরীক্ষা দিতে হয়। একটা বোর্ড আছে, বোর্ডের পরীক্ষায় পাশ করলে তাদের চাকরি দেওয়া হয়। ইচ্ছামতো মাদ্রাসা করে ব্যবসা করা যায় না। এই কমিটি থেকে অনুমতি নিতে হবে। ঐ কমিটি অনুমতি দিলেই সরকারও অনুমতি দিবে। যদি কোথাও মসজিদ ভেঙে যায় বা মেরামত করতে হয় তবে কমিটি তা করবে জনগণের সাহায্য নিয়ে। কেন্দ্রীয় কমিটির ব্রাঞ্চ হিসাবে প্রাদেশিক, জেলা, মহকুমা কমিটিও আছে। পীর মুরিদির ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেছে।

আমাদের দেশে যদি যক্ষ্মার ব্যারাম হয় তবে পীর সাহেব এক টাকা সোয়া পাঁচ আনা পয়সা নিয়া তাবিজ দিয়া বলে, 'ভালো হয়ে যাবা'। বেচারা বিশ্বাস

Scanned with CamScanner

করে পড়ে থাকে। একদিন ভুগতে ভুগতে মারা যায়, আর কিছু ব্যারাম বিলিয়ে রেখে যায়, হয় স্ত্রীর যক্ষ্মা হবে, না হয় ছেলেমেয়েদের হবে। এইভাবে রোগের বিস্তার ঘটে। তাই তাবিজ-কবজ ফুঁ-ফাঁ বন্ধ হয়ে গেছে নয়াচীনে। তাতে ইসলামের কোনো ক্ষতি হয় নাই বরং উপকার হয়েছে। বসে বসে টাকা নেওয়া আর চারটা করে বিবাহ করা নয়াচীনে এখন আর চলে না, যা আমাদের দেশে সচরাচর চলে থাকে। আবার কেউ ৬০ বৎসর বয়সে ১৪ বৎসরের মেয়ে বিবাহ করে বসে থাকে। এমন অনেক গল্প চীন দেশে ছিল, আমাদের দেশেও আছে যে, পীর সাহেবদের মুরিদরা মেয়ে দান করে। ৬০ বৎসরের পীর সাহেব ১২ বৎসরের মেয়েকে বিবাহ করিয়া মুরিদের দান গ্রহণ করেন। নয়াচীনের ইসলামিক কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন এই সমস্ত অন্যায় কাজ বন্ধ করতে সক্ষম হয়েছে।

সাংহাই জামে মসজিদের ইমাম সাহেব আমাদের অনেক গল্প বলেছিলেন। মনে হলো এঁদের মতো ইমাম হলে দেশের যথেষ্ট উপকার হতো। মাঝে মাঝে আমাদের মনে হয় হায়! ৪ বৎসরে যে কুসংস্কার নয়াচীন ধ্বংস করেছে তা করতে আমাদের কত সময় লাগবে? মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ বেঁচে থাকলে অন্ততপক্ষে এই কাজটা হতো। তিনি এ সমস্ত ধোঁকাবাজ, পরের টাকায় নির্ভরশীল মওলানা দেখতে পারতেন না। আজ আমাদের দেশেও ২/১ জন শিক্ষিত মওলানা আছেন, যাঁরা এই সমস্ত কুসংস্কার দূর করতে চান।

নয়াচীনে শুধু ইসলামিক কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনই নাই, খ্রিষ্টান কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনও আছে, বৌদ্ধ কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনও আছে। তারাও তাদের সমাজ থেকে কুসংস্কার দূর করার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করছে। অস্ট্রেলিয়ার এক ভদ্রমহিলা—যিনি খ্রিষ্টান ধর্মযাজক ছিলেন, প্রায় ৩০ বৎসর চীনে আছেন—তাঁর কাছে খ্রিষ্টানদের কুসংস্কার সম্বন্ধে গল্প শুনেছি। তিনি শান্তি সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন। খ্রিষ্টানদের চেয়ে বৌদ্ধধর্মের মধ্যে কুসংস্কার বেশি ছিল। আজ আর কোনো কুসংস্কার চীন দেশে নাই। ধর্মের দোহাই দিয়ে সেখানে আজ রাজনীতি চলে না, যা চলছে আজও আমাদের দেশে। অনেক নেতাকে আমি জানি, যারা মুসলিম লীগের সদস্য—যাদের সাথে আমি বহুদিন রাজনীতি করেছি—তারা ইসলামের যে কয়েকটা কাজ করা নিষেধ আছে, তার প্রত্যেকটা করে; আবার ইলেকশনে দাঁড়াইয়া বড় বড় পীর মওলানাদের হাজির করে তাদের কাছ থেকে ফতোয়া নেয় টাকা দিয়া। বক্তৃতায় ইসলামের কথা বলে বেহুঁশ হয়ে পড়ে। আমার যতদূর

Scanned with CamScanner

ইসলাম সম্বন্ধে জানা আছে তাতে আল্লাহ সকলকে ক্ষমা করতে পারে, কিন্তু এই বেইমানদের কোনোদিন ক্ষমা করবে না।

এই রাজনৈতিক নেতারাই নিজেদের স্বার্থের জন্য ধর্মকে ব্যবহার করে—নিজেদের নেতৃত্ব রক্ষা করার জন্য। জনসাধারণকে ধর্মের নামে ধোঁকা দিয়ে তাদের শাসন ও শোষণ করতে চায়। এরাই দুনিয়ায় ধর্মকে মানুষের কাছে হেয় প্রতিপন্ন করে ধর্মের যথেষ্ট ক্ষতি করেছে ও করছে। ধর্মের ভিতর যা আছে তা মানুষ সত্যিকারভাবে বুঝতে পারলে, আর তা পালন করলে দেশে শোষণ, অত্যাচার, অবিচার থাকত কি না সন্দেহ! নয়াচীনে আজ আর কেহ রাজনীতিতে ধর্মকে ব্যবহার করতে পারে না। ব্যক্তিগতভাবে যার ইচ্ছা ধর্মকর্ম করতে পারে, কেহ তাকে বাধা দিতে পারবে না। আর কেহ ধর্ম পালন না করলেও কেহ জোর করে করাতে পারবে না। দুইটাই নয়াচীনে আইন করে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

সম্প্রদায় হিসাবে সেখানে রাষ্ট্রের কোনো সুযোগ পাওয়া যায় না। বৌদ্ধরা শতকরা ৮০ জন বলে শতকরা ৮০টা চাকুরি তাদের দিবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা সেখানে নাই। যদি মুসলমানরা সংখ্যায় নগণ্য হয়েও শিক্ষিত বেশি হয় চাকুরি তাহারাই বেশি পাবে। যে যে কাজে সক্ষম সে সেই কাজ পাবে, খ্রিষ্টান বলে অথবা মুসলমান বলে তাকে বাদ দেওয়া চলবে না। অনেক মুসলমান আছে যারা অনেক বড় বড় সরকারি চাকুরি অধিকার করে আছে। অনেক প্রদেশের গভর্নর মুসলমান। সৈন্যবাহিনীতে অনেক বড় বড় পদ মুসলমানরা অধিকার করে আছে। নয়াচীনের সৈন্যবাহিনীতে সংখ্যানুপাতে মুসলমান অনেক বেশি। যে অঞ্চলে মুসলমানরা বাস করে তারা *যোদ্ধা* নামে পরিচিত ও খুব সাহসী। নয়াচীন সকলকেই মানুষ হিসাবে বিচার করে; কে কোন ধর্মের তা দিয়ে বিচার হয় না। তাই নয়াচীন সরকার সকল সম্প্রদায়ের জনসাধারণের সমর্থন পেয়েছে। অল্প সময়ের মধ্যে কোনো সরকার এত ভালো কাজ করতে পারে নাই। যারাই নয়াচীনে গেছে তাহারাই এদের প্রশংসা করেছে, শুধু আমি একা হতভাগাই মুগ্ধ হই নাই।

আপনারা সকলে জানেন আতাউর রহমান সাহেব ও ইত্তেফাক সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন সাহেব যাকে—মানিক ভাই বলে আমরা ডাকি, এঁরা দুজনেই কম্যুনিস্ট আদর্শের ঘোরবিরোধী হয়েও নয়াচীন সরকারকে প্রশংসা না করে থাকতে পারেন নাই। আপনারা পীর মানকী শরীফকে সকলেই

Scanned with CamScanner

জানেন, তাঁর মতো গোঁড়া মুসলমান আমার চোখে জীবনে পড়ে নাই—যিনি নয়াচীনে যেয়েও মুসলমানদের পাক ছাড়া আর কারো পাক খান নাই, তাঁর মুখে এদের প্রশংসা শুনেছি।

আমাকে মুসলিম লীগওয়ালারা কম্যুনিস্ট বলতে ছাড়ে না; যদিও কম্যুনিস্ট আদর্শের সাথে আমার কোনো সম্বন্ধ নাই। আমি আলাদা পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি—তার ম্যানিফেস্টো আছে, গঠনতন্ত্র আছে, তার নেতা জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও মওলানা ভাসানী। শহীদ সাহেব কম্যুনিস্ট বিরোধী এবং মওলানা ভাসানী ইসলামের সত্যিকারের খাদেম। তাই ও কথা উঠে না, কিন্তু আমাদের দেশের একদল লোক আছে ভালোকথা বললেই কম্যুনিস্ট বলে চিৎকার শুরু করে। তাদের জন্যই আজ লোকের মধ্যে দিন দিন ধারণা হচ্ছে কম্যুনিস্টরাই বোধ হয় ভালো কথা কয়। নয়াচীনে কম্যুনিস্ট নীতি বলে কোনো নীতি দেখলাম না। দেশের ও জনগণের যাতে মঙ্গল হয় তাই তাদের কাম্য এবং সেই কাজই তারা করে।

গ্রেট ব্রিটেনের ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী, লেবার পার্টি লিডার মি. এটলিও নয়াচীন সরকারকে প্রশংসা না করে পারেন নাই। আমাদের রাষ্ট্রদূতও নয়াচীন সরকারের প্রশংসা করেছেন। তিনি আমাদের বলেছিলেন, যে দক্ষতার সাথে এরা শাসনকার্য চালাইতেছে তাতে অদূর ভবিষ্যতে দুনিয়ার যে কোনো শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রের সাথে এদের তুলনা করা যাবে। একথা সত্য যে, তারা কম্যুনিস্ট নীতিতে বিশ্বাসী তবে, সোভিয়েট রাশিয়ার সাথে তাদের যথেষ্ট তফাত আছে। রুশ বিপ্লবের পরে সেখানকার কম্যুনিস্ট পার্টি অনেক নতুন পথ অবলম্বন করে ভুল করেছে, পরে আবার তার সংশোধন করেছে। রাশিয়ায় যে ভুল হয়েছে সে ভুল নয়াচীন আজ আর করছে না।

দুনিয়ায় আজ অনেক আদর্শের সরকার আছে। কোথাও রাজতন্ত্র, কোথাও গণতন্ত্র, কোথাও ফ্যাসিবাদ, কোথাও কম্যুনিজম বা সোশালিজম। যে যে দেশে ফ্যাসিস্ট সরকার আর কম্যুনিস্ট সরকার কায়েম, সেখানে অন্য কোনো রাজনৈতিক দল বা রাজনৈতিক আদর্শকে কাজ করতে দেওয়া হয় না। আবার অনেক দেশে গণতন্ত্র বলে চিৎকার করে, কিন্তু গণতন্ত্রের 'গ' অক্ষরও কায়েম হতে দেয় না সে দেশের সরকার। কারণ বিরোধী দল থাকলে তাদের অপকর্ম দুনিয়ার কাছে ধরা পড়ে এবং জনগণের চাপে গদি ছাড়তে বাধ্য হয় তাই তারা ছলে-বলে-কৌশলে গদি রক্ষার জন্য নানা উপায় বাহির করে। এবং বিরোধী দলের নেতাদের কারাগারে নিক্ষেপ করে।

Scanned with CamScanner

নয়াচীনে যার সাথেই আলাপ করেছি, দেখেছি তারা আমেরিকার কথা শুনলে যেন রাগে ফেটে পড়ে। অনেক কথার ও আলোচনার এবং অনেকগুলি কারণের মধ্যে, এর তিনটা কারণই প্রধান বলে মনে হলো। নয়াচীনকে ইউএন-এ ঢুকতে দিতেছে না; কোরিয়ায় সৈন্য পাঠিয়ে আমেরিকা কোরিয়ানদের যুদ্ধে হত্যা করেছে। চীনে জীবাণু বোমা ফেলেছে, চিয়াং কাইশেককে সাহায্য করেছে। চিয়াং কাইশেক যে আজ ফরমোজাতে বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে আরামে বাস করছে, তা একমাত্র আমেরিকার সাহায্যে।

নয়াচীনে আমেরিকার বিরুদ্ধে যে জনমত গড়ে উঠেছে সেটা হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ ইউএনও কেন করা হয়েছে? সমস্ত দুনিয়ার রাষ্ট্রগুলি এক জায়গায় বসে যাতে তাদের ভিতরকার গোলমাল এবং নানা মতবিরোধ মিটমাট করতে পারে, তার জন্যই দুনিয়ার রাষ্ট্রগুলি আজ ইউএনও বা জাতিসংঘ গঠন করেছে। কিন্তু সত্যই এটা অন্যায় যে ৬০ কোটি লোকের একটা দেশ আজ ইউএনও-তে ঢুকতে পারছে না, কারণ তাতে আমেরিকার স্বার্থে আঘাত লাগে। দেখা যায়, থাইল্যান্ড, ইরাক, ইরান, ব্রহ্মদেশ, হল্যান্ড, বেলজিয়াম, এমনকি ১০ লক্ষ লোকেরও দেশ ২/১টা আছে—যারা ইউএন-এর সদস্য, কিন্তু ৬০ কোটি লোকের দেশ ঢুকতে পারবে না! আর সে জায়গায় দেশ থেকে বিতাড়িত, দেশদ্রোহী বলে যাকে লোকে গালি দেয়, যে দেশ থেকে পালিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমান একটা দ্বীপে আশ্রয় নিয়েছে, পরের টাকায় কোনোমতে খেয়ে পরে বেঁচে আছে—তার সরকার আজ ইউএনও তে সদস্য। এবং সেখানে দাঁড়াইয়া নয়াচীন সরকারের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করে। চীনের লোক জানে যে এটা একমাত্র আমেরিকার ষড়যন্ত্র। তাই চীনের জনগণ মনে করে আমেরিকার সরকার তাদের শত্রু।

জীবাণু যুদ্ধে চীনের বহুলোকের ক্ষতি হয়েছিল। বহুলোক নানা রোগে ভুগে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। এই সমস্ত দেখেই আমেরিকার বিরুদ্ধে নয়াচীনের জনমত। সত্যই এটা লজ্জার বিষয় যে আজ নয়াচীনের স্থান ইউএনও-তে নাই। কোনো মতবাদই নয়াচীনের ইউএনও-তে যোগদানে বাধার সৃষ্টি করতে পারে না। যাদের মধ্যে সামান্য মনুষ্যত্ব আছে তাদের চোখেও আজ এই ঘটনা চোখে না পড়ে পারবে না। ইংরেজদের বিরুদ্ধে নয়াচীনের মনোভাব খুব খারাপ দেখলাম না। কারণ নয়াচীন সরকারকে ইংরেজরা স্বীকৃতি দিয়েছে। পিকিংয়ে ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত আছে। নয়াচীনের লোক মনে করে ইংরেজরা যাই হোক তাদের কিছুটা মনুষ্যত্ব আছে। এবং বোঝবার মতো

Scanned with CamScanner

ক্ষমতাও রাখে। হংকং চীনের মূলখণ্ডের ভিতর একটা ইংরেজ কলোনি। ইচ্ছা করলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই নয়াচীন উহা দখল করে নিতে পারে। কিন্তু তারা মনে করে হংকং ইংরেজের দখলে থাকলে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে বাধ্য হবে। কথাটা যে কিছুটা সত্য তাতে সন্দেহ নাই।

অনেক ইংরেজের ব্যবসা আছে সাংহাইতে। আমেরিকার সমস্ত কলকারখানা আজ বাজেয়াপ্ত করে নিয়েছে নয়াচীন সরকার। কিন্তু ইংরেজদের কলকারখানা আজও বাজেয়াপ্ত করে নাই। কারণ নয়াচীন আজ চায় যত দেশের সাথে বন্ধুত্ব করা যায় ততই তাদের জন্য মঙ্গল।

ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান সম্বন্ধে তাদের ধারণাও খুব ভালো, কারণ ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান তাদের সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং পাকিস্তান ও ভারতবর্ষের রাষ্ট্রদূত নয়াচীনের পিকিং শহরে আছে। যাদের সাথে আমার আলাপ হয়েছে, মনে হয়, তারাই পাকিস্তানের সাথে বন্ধুত্ব করতে ও ব্যবসাবাণিজ্য করতে খুবই আগ্রহশীল।

পাকিস্তান নয়াচীনকে ইউএনও-তে গ্রহণ করবার জন্য ভোট দিয়াছিল একথাও অনেকে কৃতজ্ঞতার সাথে স্বীকার করেছিল। এশিয়াবাসী এক হয়ে পশ্চিমা শক্তির অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াক এটাও তাদের একটা দাবি। তারা মনে করে, যুগ যুগ ধরে পশ্চিমের শক্তিবৃন্দ এশিয়ার বহু দেশকে শোষণ করেছে। আজ সময় এসেছে এশিয়ানদের শোষণ বন্ধ করার। তারা মনে করে এশিয়ার সমস্ত রাষ্ট্রের মধ্যে যেন বন্ধুভাব গড়ে উঠে।

নয়াচীনের উন্নতি দেখে সত্যই আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। যদি দশ বৎসর তারা দেশকে শান্তিপূর্ণভাবে গড়তে পারে তবে দেশের জনসাধারণের কোনো দুঃখ-দুর্দশা থাকবে না, অশিক্ষা কুসংস্কার মুছে যাবে। এবং দুনিয়ার যে কোনো শক্তির সাথে তারা মোকাবেলা করতে পারবে সকল দিক থেকে, কারণ জাতিকে গড়ে তোলার যে প্রধান শক্তি জনসাধারণের মনোবল তা নয়াচীনের জনগণের মধ্যে আছে। নয়াচীনের অনেক কিছুই আমার ভালো লেগেছিল একথা সত্য। কিন্তু নয়াচীন সরকার কম্যুনিস্ট মতবাদ ছাড়া অন্য কোনো মতবাদের লোককে রাজনীতি করতে দেয় না। একমাত্র নয়াচীন–নেতা মাও সে তুংয়ের 'নয়া গণতন্ত্রে'র নীতি যারা বিশ্বাস করেন তাদেরই রাজনীতি করার অধিকার আছে। অন্য কোনো নতুন আদর্শের দল সৃষ্টি করার অধিকার কারও নাই। যদিও নয়াচীন সরকারের বড় পদগুলিতে কম্যুনিস্ট

Scanned with CamScanner

ছাড়া দু'চার জন নন কম্যুনিস্ট আছেন, তবে ধরে নিতে হবে তারা কম্যুনিস্ট-ভাবাপন্ন এবং কম্যুনিস্টরা যা বলে তাই বিনা প্রতিবাদে মেনে নেয়। ধরুন, একজন সাধারণ নাগরিক মনে করে সরকার যেভাবে দেশকে গড়তে চেষ্টা করছে তাহাতেই দেশের মঙ্গল।

আমার মতে, ভাত-কাপড় পাবার ও আদায় করে নেবার অধিকার মানুষের থাকবে, সাথে সাথে নিজের মতবাদ প্রচার করার অধিকারও মানুষের থাকা চাই। তা না হলে মানুষের জীবন বোধ হয় পাথরের মতো শুষ্ক হয়ে যায়।

Scanned with CamScanner

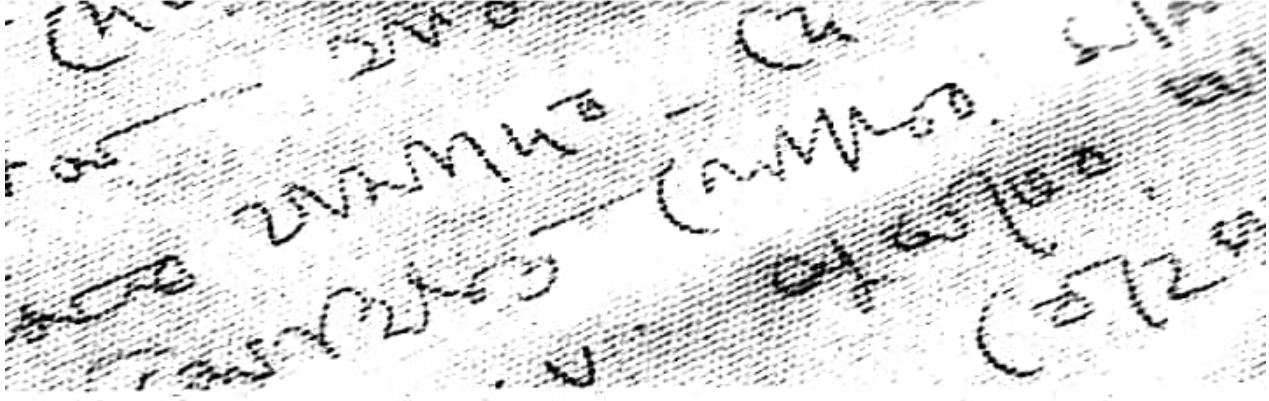

আমার দেখা নয়াচীন খাতার নোটস্

রেঙ্গুন, থাইল্যান্ড, ব্যাঙ্কক, অ্যারেঙ্ড্রাম, শ্যামদেশ, হুয়েন সাং, ফা হিয়েন, সিংহুয়া সংবাদ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি। হংকং, নাম ভিক্টোরিয়া কৌলুন হোটেল। কইতেক বিমানঘাঁটিতে নামলাম।

কাউহু স্টেশন—চীনের শেষ স্টেশন—মেনচুন কম্যুনিস্ট চীনের স্টেশন। ট্রেনে দুইটা ক্লাস শক্ত ও নরম।

ক্যান্টন শহরের মাঝে মাঝে পূর্ববাংলার মতো—পার্ল নদীর পাড়ে সাইচুং হোটেল।

ক্যান্টন থেকে পিকিং দেড় হাজার মাইল।

সত্যি যে চীনের সাথে কারো তুলনা হয় না।

ক্ষিতীশ বোস পিরোজপুরের লোক। ক্যান্টন শান্তি কমিটির সভ্য। ক্যান্টন ওয়োরের মাংস মাসলেকের মধ্যে।

১৯১২ সালে মাঞ্চু সম্রাটদের শেষ করে সান ইয়াৎ-সেন ক্ষমতা দখল করে প্রজাতন্ত্র কায়েম করেন।

২৪শে সেপ্টেম্বর। ক্যান্টন থেকে হুয়াং কাইও, চীনের সর্ববৃহৎ নদী ইয়াংসি নদীর পাড়।

কুয়েমিনসিং—সব ধ্বংস করে গেছে পালাবার সময়। পিকিং চীনের পুরানা শহর। ইংরেজ, আমেরিকা, জাপান, ফ্রান্স অনেকেই পিকিং আক্রমণ করেছে।

সাততলা অট্টালিকা পিকিং হোটেল। Forbidden City—আলাদা একটি শহর পিকিং শহরের ভিতরে। রাজারা থাকতেন তাঁর সামন্তদের নিয়ে। সৌন্দর্যে ভরা এই নিষিদ্ধ এলাকা। এর মধ্যে না আছে এমন কিছুই নাই। পার্ক, লেক—এখন শহরটা সকলের জন্য। এখানে লাইব্রেরি, মিউজিয়াম শ্রমিকদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা। হাজার হাজার লোক আসে এই শহরে আরাম করতে, হাওয়া খেতে। 'Gate of heavenly Peace.' চীনারা বলে তিয়েন আন মেন। এখানে দাঁড়িয়ে মাও সে তুং অভিবাদন গ্রহণ করেন।

১লা অক্টোবর ১৯৪৯ সালের এই দিনে মুক্তিবাহিনী চীনকে মুক্ত করেছিল। মাও, লিও, চ্যু তে, চৌ এন লাই এবং নেইবো চীনা টাকার নাম ইয়ুয়ান, কেউ বলে ইয়েন।

Scanned with CamScanner

হংকংয়ে ২০ টাকা বদল করলাম যা পেলাম তা ঠিক বলতে পারব না। তবে এক বস্তা কাগজ পেয়েছিলাম কয়েক কোটি ইয়েন হবে। ইনফ্লেশন যাকে বলে।

Summer Palace গ্রীষ্ম প্রাসাদ

নানা রকমের জীব-জানোয়ারের মূর্তি। সকলের উঁচু জায়গায় বৌদ্ধমন্দির। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রমোদনগরী এই জায়গা, ভিতরে বিরাট লেক। এখানে সকল কিছুই আছে পার্ক, বড় ছোট রাস্তা। লেকের মধ্য জায়গায় একটা দ্বীপ।

শান্তির কপোত

মণিমাণিক্য দিয়ে সাজানো বুদ্ধমূর্তি থেকে লুটপাট করে নিয়েছে বিদেশি শক্তি। ভারত-পাকিস্তানের মতো মেজর-জেনারেল, রেজা-মাহবুব-তৃতীয় লেবেলের একমাত্র বাঙালি কর্মচারী।

তুর্কি কবি নাজিম হিকমত—রাশিয়ার লেখক আইজ্যাক আসিমভ

মহাপ্রাচীর

ট্রেনে করে নিয়ে যাওয়া।

সপ্ত আশ্চর্যের একটি দেওয়াল। দেড় হাজার মাইল লম্বা প্রাচীর। বোধ হয় দুই হাজার বছরের বেশিদিন হবে নির্মাণ হয়েছে।

শান্তি হোটেল ও পিকিং হোটেল। সকল জিনিসের একদাম।

গলাবন্ধ কোট আর মোটা কাপড়ের প্যান্ট সকলেরই ড্রেস। ১০ই সেপ্টেম্বর ভারতীয়রা আমাদের খাবার দাওয়াত করলেন। না করার পরে ওদের খাওয়াইছিলাম।

১লা অক্টোবর বাঁ দিকের গ্যালারিতে আমাদের জায়গা—পতাকা ও জনগণের সমুদ্র। তৃতীয় উৎসব। ১০টায় আসবেন মাও সে তুং—সুন চিন লি; চু তে পাশে আছেন।

সৈন্যরা অনেক মহড়া দেখালো জল, স্থল ও বিমান বাহিনীর। কৃষক মজদুর পায়োনিয়ার ফোর্স।

দাওয়াত খাবার দিন মাও সে তুংকে ভালোভাবে দেখতে হবে। ইউসুফ হাসান।

তাহিরা মাজহার। শান্তি সম্মেলনে সাঁইত্রিশটা দেশ যোগদান করেছে।

কপোত থাকা, শান্তির কপোত সকল দিকে। সাঁইত্রিশটা দেশের পতাকা। পাকিস্তানের সকলেই আমরা পাশাপাশি বসেছি। টেবিলে হেডফোন আছে। সিটে নাম লেখা রয়েছে। চারটা মূল ভাষায় বক্তৃতা শোনা যায়। মূল ভাষার বক্তৃতা করলে অন্য ভাষায় শোনা যায়। ইংরেজি, চীনা, রুশীয়, স্পেনিশ। হাই পার্ক দেখতে গেলাম এক রাতে।

Scanned with CamScanner

White Haired girl চীনা ছবি। প্রসিদ্ধ নাটক (সাদা চুলের মেয়ে)

ক্ষিতীশ বাবু বাংলা গানে মুগ্ধ করে দিয়েছে।

ধর্ম—কনফুসিয়ান বেশি, তারপর বৌদ্ধ, তারপর মুসলমান। মসজিদ আছে কয়েকটা, মুসলমানদের মাথায় গোলটুপি। খ্রিষ্টান আছে কিছু।

প্যাগোডা

Temple of Heaven (স্বর্গমন্দির) ফসল ফলানোর মন্দির; দেশে যাতে ভালো শস্য হয় তার জন্য পূজা করা হত। সূর্য, চন্দ্র, হাওয়া ও বুকীর পূজা বলা যায়।

৮৬ ছিয়াশি জন বক্তৃতা করে ১১ দিন সম্মেলন চললো।

১২ই থেকে আমরা। কনকনে শীত।

জমিদারি বাজেয়াপ্ত। চাষির মধ্যে জমি বিলি ব্যবস্থা। নানকিন, টিয়েন সিং, সাংহাই, হ্যাংচো (পশ্চিম হ্রদ) ক্যান্টন ১৯১১ সালে সান ইয়াৎ-সেনের দল আক্রমণ করে।

১৯৪১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর হক সাহেব জাতীয় মন্ত্রিত্ব গঠন করেন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীকে সাথে নিয়ে। মুসলিম লীগ—নাটোর।

১৯৪৩—২৮শে মার্চ হক সাহেব পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। নাজিমুদ্দিন প্রধানমন্ত্রী হন। ১৯৪৩ সালে। মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনের পূর্বেই খাজা সাহেব পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।

১৯৪৬ সালের ২২শে এপ্রিল সোহরাওয়ার্দী শপথ গ্রহণ করেন।

Scanned with CamScanner

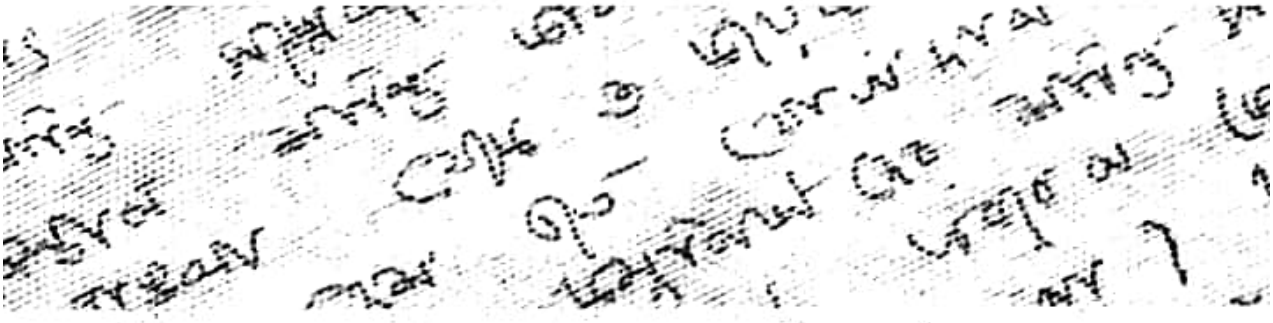

জীবনপঞ্জি

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
(১৯২০-১৯৭৫)

১৯২০
গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে শেখ মুজিবুর রহমান জন্মগ্রহণ করেন। টুঙ্গিপাড়া গ্রামের অদূরে বিখ্যাত মধুমতী নদী। এই নদীতে তখন স্টিমার চলতো এবং সেই স্টিমারে করে খুলনা হয়ে কলকাতা যাওয়া যেত। গোপালগঞ্জ তখন ফরিদপুর জেলার একটি মহকুমা শহর। পিতা শেখ লুৎফর রহমান গোপালগঞ্জ আদালতে সেরেস্তাদারের চাকরি করতেন। মাতার নাম শেখ সায়েরা খাতুন।

১৯২৭
তিনি স্থানীয় গিমাডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হন।

১৯২৯
তাঁকে গোপালগঞ্জ পাবলিক স্কুলে তৃতীয় শ্রেণিতে ভর্তি করা হয়।

১৯৩০
শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর চাচাতো বোন বেগম ফজিলাতুননেছার (রেণু) সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন।

১৯৩৪
অসুস্থতার কারণে পড়াশোনার সাময়িক ছেদ ঘটে।

১৯৩৭
'মুসলিম সেবা সমিতি'র সম্পাদক নিযুক্ত হন। এ সংগঠনের মধ্য দিয়ে মুষ্টিচাল সংগ্রহ এবং দরিদ্র ছাত্রদের সাহায্য করা হতো।

Scanned with CamScanner

১৯৩৮

তিনি তখন গোপালগঞ্জ মিশন হাই স্কুলের ছাত্র। একবার অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী গোপালগঞ্জে আসেন। স্কুলের ছাদ থেকে পানি পড়া এবং ছাত্রাবাসের সমস্যা তাঁদের নিকটে তুলে ধরে কিশোর শেখ মুজিবুর রহমান সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন। শেরে বাংলা ও সোহরাওয়ার্দীর সংবর্ধনা উপলক্ষ্যে গঠিত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর নেতৃভূমিকা গ্রহণ। এ নিয়ে স্থানীয় কংগ্রেসীদের সঙ্গে বিরোধ। তাদের ইন্ধনে ও মিথ্যা অভিযোগে জীবনের প্রথম কারাবরণ।

১৯৪০

গোপালগঞ্জ মিশন হাই স্কুলের ছাত্র থাকাকালে তিনি নিখিল ভারত মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনে যোগ দেন। এ সময়ে তিনি এক বছরের জন্য নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগের কাউন্সিলর নির্বাচিত হন।

গোপালগঞ্জ মহকুমা মুসলিম লীগের ডিফেন্স কমিটির সেক্রেটারি নির্বাচিত।

ফরিদপুর ছাত্রলীগের সম্মেলনে কবি কাজী নজরুল ইসলাম, হুমায়ুন কবির, ইব্রাহিম খাঁ প্রমুখকে আমন্ত্রণ। ১৪৪ ধারা সত্ত্বেও হুমায়ুন কবিরের বাড়িতে সকল সম্মেলন সম্পন্ন।

১৯৪২

কলকাতায় ছাত্রনেতা আবদুল ওয়াসেক প্রমুখের নেতৃত্বে হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণের আন্দোলনে অংশগ্রহণ।

গোপালগঞ্জ মিশন হাই স্কুল থেকে প্রবেশিকা পাশ করার পর কলকাতা যান এবং কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে (মওলানা আবুল কালাম আজাদ কলেজ) আইএ ক্লাসে ভর্তি হন শেখ মুজিবুর রহমান কলকাতায় বেকার হোস্টেলে থাকাকালীন মুসলিম লীগের রাজনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হন এবং মুসলিম লীগের প্রগতিশীল অংশের নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সংস্পর্শে আসেন।

পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমায় অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সম্মেলনে ফরিদপুর থেকে বিরাট কর্মীবাহিনী নিয়ে যোগদান।

১৯৪৩

পঞ্চাশের (১৩৫০ বঙ্গাব্দ) মন্বন্তরে কংগ্রেস, ফরোয়ার্ড ব্লক ও কম্যুনিস্ট পার্টির কর্মীদের সঙ্গে মুসলিম লীগের যুবকর্মীদের নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ

Scanned with CamScanner

কমিটিতে যোগদান। দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সাহায্যার্থে লঙ্গরখানা পরিচালনা করেন। গোপালগঞ্জে ত্রাণকার্যে অংশগ্রহণ করেন।

কুষ্টিয়ায় অনুষ্ঠিত নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগের সম্মেলনে যোগ দেন এবং সম্মেলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কাউন্সিলের সদস্যপদ লাভ। অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ সম্মেলন উপলক্ষ্যে দিল্লি গমন এবং সম্মেলনে অংশগ্রহণ। তখন দিল্লির লালকেল্লা, দেওয়ানি আম, দেওয়ানি খাস, কুতুব মিনার, নিজামুদ্দিন আউলিয়ার দরগাহ্ পরিদর্শন করেন।

১৯৪৪

গোপালগঞ্জে মুসলিম লীগের সম্মেলনে মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিম, তমিজউদ্দিন খান, খাজা শাহাবুদ্দিন প্রমুখের আগমন। গোপালগঞ্জের স্থানীয় মুসলিম লীগের নেতৃত্বে গঠিত অভ্যর্থনা কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত। সম্মেলন সাফল্যমণ্ডিত হয়।

কলকাতায় ফরিদপুরবাসীর উদ্যোগে গঠিত 'ফরিদপুর ডিস্ট্রিক্ট অ্যাসোসিয়েশন' -এর সম্পাদক নির্বাচিত হন।

কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ থেকে আইএ পাশ করেন।

১৯৪৬

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইসলামিয়া কলেজ ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। গোপালগঞ্জ মহকুমা মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হন। এ সময়ে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগের নির্বাচনি প্রচারণায় বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন।

১৬ই আগস্ট মুসলিম লীগ আহূত প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসকে কেন্দ্র করে সূচিত কলকাতায় দাঙ্গা প্রতিরোধে ভূমিকা পালন করেন। কলকাতা ও বিহারে দাঙ্গা-পীড়িত এলাকায় ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ান। পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ।

শরণার্থী ও মোহাজেরদের সাহায্যার্থে প্রাণান্তকর পরিশ্রম; ময়রা ও মাধাইগঞ্জে ক্যাম্প স্থাপন এবং তাদের সুবন্দোবস্তে ব্যবস্থা গ্রহণ।

জিন্নাহর আহ্বানে দিল্লিতে ৭, ৮, ৯ এপ্রিল অনুষ্ঠিত ভারতবর্ষের মুসলিম লীগপন্থি কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের কনভেনশনে বাংলাদেশের ছাত্রকর্মী

Scanned with CamScanner

হিসেবে ১০-১৫ জনসহ বঙ্গবন্ধুর যোগদান। এ উপলক্ষ্যে আজমীর শরীফ, তাজমহল, আগ্রা দুর্গ, লালকেল্লা, ফতেহপুর সিক্রি, সেকেন্দ্রা পরিভ্রমণ।

১৯৪৭

ইসলামিয়া কলেজ থেকে বিএ পাশ করেন পাঠ্যবিষয় ছিল ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান।

৬ই এবং ৭ই জুলাই সিলেটে অনুষ্ঠিত গণভোটে মুসলিম লীগের বিজয়ের পেছনে শেখ মুজিবুর রহমানের বিশেষ ভূমিকা ছিল। তখন তিনি পাঁচশত মুসলিম লীগ কর্মীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

১৯৪৭ সালে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত বিভক্ত হয়। তাতে ব্রিটিশ শাসিত বঙ্গ প্রদেশের পশ্চিম অংশ ভারতের মধ্যে এবং পূর্ব অংশ পাকিস্তানের মধ্যে পড়ে। শেখ মুজিবুর রহমান কলকাতা ত্যাগ করে পূর্ববঙ্গের রাজধানী ঢাকায় চলে আসেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হন।

ঢাকায় রাজনৈতিক কর্মীসম্মেলনে অভ্যর্থনা কমিটির অন্যতম সদস্য। সম্মেলনে গঠিত গণতান্ত্রিক যুবলীগের যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত।

বঙ্গবন্ধুর পাকিস্তান তথা পূর্ব-পাকিস্তান কালের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের শুরু ১৫০ নম্বর মোগলটুলির 'পার্টি হাউস' থেকে।

১৯৪৮

মুসলিম লীগ সরকারের গণবিরোধী ভূমিকার বিরোধিতা করে তিনি মুসলিম লীগ ত্যাগ করেন। ৪ঠা জানুয়ারি গঠন করেন পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ। তিনি ছিলেন এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। নবগঠিত এ দলের ১০ দফা দাবির অন্যতম ছিল বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করা, সামরিক বাহিনীতে জনসংখ্যার অনুপাতে বাঙালিদের নিয়োগ, বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা, পাকিস্তানের নৌবাহিনীর সদর দফতর চট্টগ্রামে স্থানান্তর প্রভৃতি। ২৩শে ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন উর্দুকে রাষ্ট্রভাষারূপে ঘোষণা দিলে দেশব্যাপী প্রতিবাদের ঝড় ওঠে এবং রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সূচনা হয়। ২রা মার্চ গঠিত হয় সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ। শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন এ আন্দোলনে প্রথম সারির একজন। ১১ই মার্চ সাধারণ ধর্মঘট পালনকালে সচিবালয়ের সামনে থেকে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়

Scanned with CamScanner

প্রবল ছাত্র-আন্দোলনের মুখে ১৫ই মার্চ তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। ১৬ই মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ছাত্রসভায় সভাপতিত্ব করেন।

১৯শে মে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। ১১ই সেপ্টেম্বর তাঁকে পুনরায় গ্রেফতার করা হয়।

১৯৪৯

২৯শে এপ্রিল ১৯৪৯-২৭শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ পর্যন্ত কয়েকবার কারা মুক্তিলাভ এবং একটানা কারারুদ্ধ হয়ে অসুস্থতা সত্ত্বেও রাজনীতিতে সক্রিয় থাকেন।

পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগকে অসাম্প্রদায়িক সংগঠনে পরিণত করার লক্ষ্যে এর নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দেওয়া হয় এবং ১৯৫৩ সালের কাউন্সিল অধিবেশনে তা কার্যকর।

২১শে জানুয়ারি কারাগার থেকে মুক্তি পান। বিভিন্ন দাবি-দাওয়া আদায়ের লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্নশ্রেণির কর্মচারীগণ তাঁর নেতৃত্বে মার্চ মাসে ধর্মঘটের ডাক দিলে কর্তৃপক্ষ তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করেন।

এপ্রিল মাসে উপাচার্যের বাসভবনের সামনে অবস্থান ধর্মঘট করার সময়ে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।

২৩শে জুন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে গঠিত হয় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ। কারাবন্দি অবস্থায় শেখ মুজিবুর রহমান এর যুগ্ম-সম্পাদক নিযুক্ত হন এবং জুন মাসের শেষ দিকে মুক্তিলাভ করেন।

সেপ্টেম্বর মাসে দেশে চরম খাদ্যসংকট দেখা দিলে তিনি সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন। ফলে কয়েক দিনের জন্য তাকে বন্দি করা হয়। অক্টোবরের শেষ দিকে লিয়াকত আলী খানের কাছে প্রতিনিধি দল নিয়ে দেখা করার অপরাধে মওলানা ভাসানীর সঙ্গে তাঁকে কয়েক দিনের জন্য গ্রেফতার করা হয়।

১৯৫০

১লা জানুয়ারি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের ঢাকায় আগমনকালে আওয়ামী মুসলিম লীগ এক ভুখা মিছিল বের করে।

পাকিস্তানি দুঃশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করায় এবং রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে সোচ্চার হওয়ার জন্য পাকিস্তান সরকারের দমননীতির অংশ হিসেবে ১১ই মার্চ শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়। সেবার তাঁকে প্রায় দুই বছর জেলে আটক রাখা হয়েছিল।

Scanned with CamScanner

১৯৫২

ভাষা আন্দোলনকে দুর্বল ও স্তিমিত করার লক্ষ্যে ১৪ই ফেব্রুয়ারি তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।

ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্বে ১৬ই ফেব্রুয়ারি থেকে ২৭শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত শেখ মুজিবুর রহমান কারাবন্দি অবস্থায় অনশন ধর্মঘট পালন করেন। অনশন ধর্মঘটরত অবস্থায় ১৮ই ফেব্রুয়ারি তাঁকে ঢাকা জেল থেকে ফরিদপুর জেলে স্থানান্তর করা হয়। ২৭শে ফেব্রুয়ারি ফরিদপুর জেল থেকে তিনি মুক্তি পান।

২৭শে এপ্রিল ঢাকা বার অ্যাসোসিয়েশনে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের সম্মেলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন।

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্মেলনের দায়িত্ব গ্রহণ।

৯ই জুলাই পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে শেখ মুজিবুর রহমান দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। এ সময়ে শান্তি পরিষদের প্রতিনিধিদলের সদস্য হয়ে তিনি চীন সফর করেন এবং বাংলা ভাষার অধিকার সম্পর্কে মাও সে তুং-এর সঙ্গে আলাপ করেন।

পরবর্তী নির্বাচনে মুসলিম লীগকে পরাজিত করার লক্ষ্যে ১৪ই নভেম্বর দলের আহূত কাউন্সিল অধিবেশনে যুক্তফ্রন্ট গঠনের প্রস্তাব পাশ করাতে সক্ষম হন।

১৯৫৪

মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া এলাকা থেকে বিপুল ভোটে পূর্ববঙ্গ প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। এ নির্বাচনে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী মুসলিম লীগের প্রার্থী প্রভাবশালী নেতা ওয়াহিদুজ্জামান।

১৪ই মে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার কৃষি, বন ও সমবায় মন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।

২৯শে মে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার ৯২-ক ধারা প্রয়োগ করে মন্ত্রিসভা ভেঙে দিয়ে গভর্নরের শাসন প্রবর্তন করার পর ৩০শে মে তাঁকে বন্দি করা হয়। ২৩শে ডিসেম্বর তিনি ছাড়া পান।

১৯৫৫

৫ই জুন বঙ্গবন্ধু গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। আওয়ামী লীগের উদ্যোগে ১৭ই জুন ঢাকার পল্টন ময়দানের জনসভা থেকে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন

Scanned with CamScanner

দাবি করে ২১ দফা ঘোষণা করা হয়। ২৩শে জুন আওয়ামী লীগের কার্যকরী পরিষদে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা না হলে দলীয় সদস্যরা আইনসভা থেকে পদত্যাগ করবেন। ২৫শে আগস্ট করাচিতে পাকিস্তান গণপরিষদে বঙ্গবন্ধু বলেন :

Sir, you will see that they want to place the word 'East Pakistan' instead of 'East Bengal'. We have demanded so many times that you should use Bengal instead of Pakistan. The word 'Bengal' has a history, has a tradition of its own. You can change it only after the people have been consulted. If you want to change it then we have to go back to Bengal and ask them whether they accept it. So far as the question of One-Unit is concerned it can come in the constitution. Why do you want it to be taken up just now? What about the state language, Bengali? What about joint electorate? What about autonomy? The people of East Bengal will be prepared to consider One-Unit with all these things. So, I appeal to my friends on that side to allow the people to give their verdict in any way, in the form of referendum or in the form of plebiscite.

[অনুবাদ : স্যার, আপনি দেখবেন ওরা 'পূর্ব বাংলা' নামের পরিবর্তে 'পূর্ব পাকিস্তান' নাম রাখতে চায়। আমরা বহুবার দাবি জানিয়েছি যে, আপনারা এটাকে বাংলা নামে ডাকেন। 'বাংলা' শব্দটার একটা নিজস্ব ইতিহাস আছে, আছে এর একটা ঐতিহ্য। আপনারা এই নাম আমাদের জনগণের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে পরিবর্তন করতে পারেন। আপনারা যদি ঐ নাম পরিবর্তন করতে চান তাহলে আমাদের বাংলায় আবার যেতে হবে এবং সেখানকার জনগণের কাছে জিজ্ঞেস করতে হবে তারা নাম পরিবর্তনকে মেনে নেবে কি না। এক ইউনিটের প্রশ্নটা শাসনতন্ত্রে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। আপনারা এই প্রশ্নটাকে এখনই কেন তুলতে চান? বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গ্রহণ করার ব্যাপারে কি হবে? যুক্ত নির্বাচনী এলাকা গঠনের প্রশ্নটারই কি সমাধান? আমাদের স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধেই বা কি ভাবছেন? পূর্ব বাংলার জনগণ অন্যান্য প্রশ্নগুলোর সমাধানের সাথে এক ইউনিটের প্রশ্নটাকে বিবেচনা করতে প্রস্তুত। তাই আমি আমার ঐ অংশের বন্ধুদের কাছে আবেদন জানাব তারা যেন আমাদের জনগণের 'রেফারেন্ডাম' অথবা গণভোটের মাধ্যমে দেয়া রায়কে মেনে নেন।]

Scanned with CamScanner

২১শে অক্টোবর আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে দলের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দ প্রত্যাহার করা হয় এবং বঙ্গবন্ধু পুনরায় দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

১৯৫৬

৩রা ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করে খসড়া শাসনতন্ত্রে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি অন্তর্ভুক্তির দাবি জানান। ১৪ই জুলাই আওয়ামী লীগের সভায় প্রশাসনে সামরিক বাহিনীর প্রতিনিধিত্বের বিরোধিতা করে একটি সিদ্ধান্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই সিদ্ধান্ত প্রস্তাব আনেন বঙ্গবন্ধু। ৪ঠা সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে খাদ্যের দাবিতে ভুখা মিছিল বের করা হয়। চকবাজার এলাকায় পুলিশ মিছিলে গুলি চালালে ৩ জন নিহত হয়। ১৬ই সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধু কোয়ালিশন সরকারের শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম, দুর্নীতি দমন ও ভিলেজ-এইড দপ্তরের মন্ত্রীর দায়িত্ব লাভ করেন।

১৯৫৭

সংগঠনকে সুসংগঠিত করার উদ্দেশ্যে ৩০শে মে দলীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শেখ মুজিব মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন। ২৪শে জুন থেকে ১৩ই জুলাই তিনি চীনে সরকারি সফর করেন।

১৯৫৮

৭ই অক্টোবর পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা ও সামরিক বাহিনী প্রধান জেনারেল আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারি করে রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। ১১ই অক্টোবর বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয় এবং একের পর এক মিথ্যা মামলা দায়ের করে হয়রানি করা হয়। প্রায় চৌদ্দ মাস জেলখানায় থাকার পর তাঁকে মুক্তি দিয়ে পুনরায় জেলগেটেই গ্রেফতার করা হয়।

১৯৬০

৭ই ডিসেম্বর হাইকোর্টে রিট আবেদন করে তিনি মুক্তি লাভ করেন। সামরিক শাসন ও আইয়ুববিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু গোপন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন। এ সময়ই বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের লক্ষ্যে কাজ করার জন্য বিশিষ্ট ছাত্র নেতৃবৃন্দ দ্বারা 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ' নামে একটি গোপন সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতি মহকুমায় এবং থানায় নিউক্লিয়াস গঠন করেন।

Scanned with CamScanner

১৯৬২

৬ই ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধুকে জননিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করা হয়। ২রা জুন চার বছরের সামরিক শাসনের অবসান ঘটলে ১৮ই জুন বঙ্গবন্ধু মুক্তিলাভ করেন। ২৫শে জুন বঙ্গবন্ধুসহ জাতীয় নেতৃবৃন্দ আইয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যৌথ বিবৃতি দেন। ৫ই জুলাই পল্টনের জনসভায় বঙ্গবন্ধু আইয়ুব সরকারের কঠোর সমালোচনা করেন। ২৪শে সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধু লাহোর যান, এখানে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে বিরোধীদলীয় মোর্চা জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠিত হয়। অক্টোবর মাসে গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের পক্ষে জনমত সৃষ্টির জন্য তিনি শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সাথে সারা বাংলা সফর করেন

১৯৬৩

সোহরাওয়ার্দী অসুস্থ হয়ে চিকিৎসার জন্য লন্ডনে অবস্থানকালে বঙ্গবন্ধু তাঁর সঙ্গে পরামর্শের জন্য লন্ডন যান। ৫ই ডিসেম্বর সোহরাওয়ার্দী বৈরুতে ইন্তেকাল করেন।

১৯৬৪

২৫শে জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে অনুষ্ঠিত এক সভায় আওয়ামী লীগকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়। এই সভায় দেশের প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের ভোটের মাধ্যমে সংসদীয় সরকারব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবি সাধারণ মানুষের ন্যায্য অধিকার আদায় সম্বলিত প্রস্তাব গৃহীত হয়। সভায় মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যথাক্রমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১১ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি গঠিত হয়। দাঙ্গার পর আইয়ুববিরোধী ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য বঙ্গবন্ধুর উদ্যোগ গ্রহণ। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ১৪ দিন পূর্বে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়

১৯৬৫

শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও আপত্তিকর বক্তব্য প্রদানের অভিযোগে মামলা দায়ের। এক বছরের কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে হাইকোর্টের নির্দেশে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে তিনি মুক্তিলাভ করেন।

১৯৬৬

৫ই ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধী দলসমূহের জাতীয় সম্মেলনের বিষয় নির্বাচনী কমিটিতে বঙ্গবন্ধু ঐতিহাসিক ৬ দফা দাবি পেশ করেন। প্রস্তাবিত ৬ দফা ছিল

Scanned with CamScanner

বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ। ১লা মার্চ বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। বঙ্গবন্ধু ৬ দফার পক্ষে জনমত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সারা বাংলায় গণসংযোগ সফর শুরু করেন। এ সময় তাঁকে সিলেট, ময়মনসিংহ ও ঢাকায় বারবার গ্রেফতার করা হয়। বঙ্গবন্ধু এ বছরের প্রথম তিন মাসে আটবার গ্রেফতার হন। ৮ই মে নারায়ণগঞ্জ পাটকল শ্রমিকদের জনসভায় বক্তৃতা শেষে তাঁকে পুনরায় গ্রেফতার করা হয়। ৭ই জুন বঙ্গবন্ধু ও আটক নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবিতে সারা দেশে ধর্মঘট পালিত হয়। ধর্মঘটের সময় ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও টঙ্গীতে পুলিশের গুলিতে তেজগাঁও শিল্প এলাকায় মনু মিয়াসহ ১১ জন শ্রমিক নিহত হয়।

১৯৬৮

৩রা জানুয়ারি পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধুকে এক নম্বর আসামি করে মোট ৩৫ জন বাঙালি সেনা ও সিএসপি অফিসারের বিরুদ্ধে পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার অভিযোগ এনে রাষ্ট্রদ্রোহী হিসাবে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে। ১৭ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুকে জেল থেকে মুক্তি দিয়ে পুনরায় জেলগেট থেকে গ্রেফতার করে ঢাকা সেনানিবাসে আটক রাখা হয়। বঙ্গবন্ধুসহ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অভিযুক্ত আসামিদের মুক্তির দাবিতে সারা দেশে বিক্ষোভ শুরু হয়।

১৯শে জুন ঢাকা সেনানিবাসে কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামিদের বিচারকার্য শুরু হয়।

১৯৬৯

৫ই জানুয়ারি ৬ দফাসহ ১১ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত। কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার ও বঙ্গবন্ধুর মুক্তি দাবিতে দেশব্যাপী ছাত্র আন্দোলন শুরু করে। এই আন্দোলন গণআন্দোলনে পরিণত হয়। পরে ১৪৪ ধারা ও কারফিউ ভঙ্গ, পুলিশ-ইপিআর-এর গুলিবর্ষণ, বহু হতাহতের মধ্য দিয়ে গণঅভ্যুত্থানে রূপ নিলে আইয়ুব সরকার ১লা ফেব্রুয়ারি গোলটেবিল বৈঠকের আহ্বান জানায় এবং বঙ্গবন্ধুকে প্যারোলে মুক্তি দান করা হবে বলে ঘোষণা দেয়া হয়। বঙ্গবন্ধু প্যারোলে মুক্তিদান প্রত্যাখ্যান করেন। ২২শে ফেব্রুয়ারি জনগণের অব্যাহত চাপের মুখে কেন্দ্রীয় সরকার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে বঙ্গবন্ধুসহ অন্যান্য আসামিকে মুক্তি দানে বাধ্য হয়। ২৩শে ফেব্রুয়ারি রেসকোর্স (সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) ময়দানে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে

Scanned with CamScanner

বঙ্গবন্ধুকে সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। প্রায় ১০ লাখ ছাত্র জনতার এই সংবর্ধনা সমাবেশে শেখ মুজিবুর রহমানকে আনুষ্ঠানিকভাবে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। বঙ্গবন্ধু রেসকোর্সের ভাষণে ছাত্র সমাজের ১১ দফা দাবির প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানান।

১০ই মার্চ বঙ্গবন্ধু রাওয়ালপিন্ডিতে আইয়ুব খানের গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করেন। বঙ্গবন্ধু গোলটেবিল বৈঠকে আওয়ামী লীগের ৬ দফা ও ছাত্র সমাজের ১১ দফা দাবি উপস্থাপন করে বলেন, 'গণঅসন্তোষ নিরসনে ৬ দফা ও ১১ দফার ভিত্তিতে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান ছাড়া কোন বিকল্প নেই'। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ও রাজনীতিবিদরা বঙ্গবন্ধুর দাবি অগ্রাহ্য করলে ১৩ই মার্চ তিনি গোলটেবিল বৈঠক ত্যাগ করেন এবং ১৪ই মার্চ ঢাকায় ফিরে আসেন। ২৫শে মার্চ জেনারেল ইয়াহিয়া খান সামরিক শাসন জারির মাধ্যমে ক্ষমতাসীন হন। ২৫শে অক্টোবর বঙ্গবন্ধু তিন সপ্তাহের সাংগঠনিক সফরে লন্ডন গমন করেন।

৫ই ডিসেম্বর শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আওয়ামী লীগের আলোচনা সভায় বঙ্গবন্ধু পূর্ব বাংলার নামকরণ করেন 'বাংলাদেশ'। তিনি বলেন, "*একসময় এদেশের বুক হইতে, মানচিত্রের পৃষ্ঠা হইতে 'বাংলা' কথাটির সর্বশেষ চিহ্নটুকুর চিরতরে মুছিয়া ফেলার চেষ্টা করা হইয়াছে। ...একমাত্র 'বঙ্গোপসাগর' ছাড়া আর কোন কিছুর নামের সঙ্গে 'বাংলা' কথাটির অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। ...জনগণের পক্ষ হইতে আমি ঘোষণা করিতেছি–আজ হইতে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশটির নাম 'পূর্ব পাকিস্তান'-এর পরিবর্তে শুধুমাত্র 'বাংলাদেশ'।*

১৯৭০

৬ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু পুনরায় আওয়ামী লীগ সভাপতি নির্বাচিত হন। ১লা এপ্রিল আওয়ামী লীগ কার্যকরী পরিষদের সভায় নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৭ই জুন রেসকোর্স ময়দানের জনসভায় বঙ্গবন্ধু ৬ দফার প্রশ্নে আওয়ামী লীগকে নির্বাচিত করার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান। ১৭ই অক্টোবর বঙ্গবন্ধু তাঁর দলের নির্বাচনী প্রতীক হিসাবে 'নৌকা' প্রতীক পছন্দ করেন এবং ঢাকার ধোলাইখালে প্রথম নির্বাচনী জনসভার মধ্য দিয়ে নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করেন। ২৮শে অক্টোবর তিনি জাতির উদ্দেশে বেতার-টিভি ভাষণে ৬ দফা বাস্তবায়নে আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের জয়যুক্ত করার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান। ১২ই নভেম্বরের গোর্কিতে উপকূলীয় এলাকায় ১০ লক্ষ মানুষের প্রাণহানি ঘটলে বঙ্গবন্ধু নির্বাচনী প্রচারণা বাতিল করে দুর্গত এলাকায়

Scanned with CamScanner

চলে যান এবং আর্তমানবতার প্রতি পাকিস্তানী শাসকদের ঔদাসীন্যের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান। তিনি গোর্কি উপদ্রুত মানুষের ত্রাণের জন্য বিশ্ববাসীর প্রতি আহ্বান জানান ৭ই ডিসেম্বর সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। আওয়ামী লীগ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদের ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন এবং প্রাদেশিক পরিষদের ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৮৮টি আসন লাভ করে।

১৯৭১

৩রা জানুয়ারি রেসকোর্সের জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব জনপ্রতিনিধিদের শপথ গ্রহণ পরিচালনা করেন। আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্যরা ৬ দফার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা এবং জনগণের প্রতি আনুগত্য থাকার শপথ গ্রহণ করেন। ৫ই জানুয়ারি তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানে সর্বাধিক আসন লাভকারী পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো কেন্দ্রে আওয়ামী লীগের সাথে কোয়ালিশন সরকার গঠনে তাঁর সম্মতির কথা ঘোষণা করেন। জাতীয় পরিষদ সদস্যদের এক বৈঠকে বঙ্গবন্ধু পার্লামেন্টারি দলের নেতা নির্বাচিত হন। ২৮শে জানুয়ারি জুলফিকার আলী ভুট্টো বঙ্গবন্ধুর সাথে আলোচনার জন্য ঢাকায় আসেন। তিন দিন বৈঠকের পর আলোচনা ব্যর্থ হয়ে যায়। ১৩ই ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ৩রা মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের বৈঠক আহ্বান করেন। ১৫ই ফেব্রুয়ারি ভুট্টো ঢাকায় জাতীয় পরিষদের বৈঠক বয়কটের ঘোষণা দিয়ে দুই প্রদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দুই দলের প্রতি ক্ষমতা হস্তান্তর করার দাবি জানান।

১৬ই ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু এক বিবৃতিতে জনাব ভুট্টোর দাবির তীব্র সমালোচনা করে বলেন, 'ভুট্টো সাহেবের দাবি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। ক্ষমতা একমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আওয়ামী লীগের কাছে হস্তান্তর করতে হবে। ক্ষমতার মালিক এখন পূর্ব বাংলার জনগণ।'

১লা মার্চ ইয়াহিয়া খান অনির্দিষ্টকালের জন্য জাতীয় পরিষদের বৈঠক স্থগিতের ঘোষণা দিলে সারা বাংলায় প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। বঙ্গবন্ধুর সভাপতিত্বে আওয়ামী লীগ কার্যকরী পরিষদের জরুরি বৈঠকে ৩রা মার্চ দেশব্যাপী হরতাল আহ্বান করা হয়। ৩রা মার্চ সারা বাংলায় হরতাল পালিত হবার পর বঙ্গবন্ধু অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তর করার জন্য প্রেসিডেন্টের প্রতি দাবি জানান।

৭ই মার্চ রেসকোর্সের জনসমুদ্র থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম,

Scanned with CamScanner

জয় বাংলা'। ঐতিহাসিক ভাষণে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতিকে শৃঙ্খল মুক্তির আহ্বান জানিয়ে ঘোষণা করেন, "প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে।... রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেবো। এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ।"

তিনি শত্রুর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য সবাইকে প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানান এবং ইয়াহিয়া খানের সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। একদিকে রাষ্ট্রপতি জেনারেল ইয়াহিয়ার নির্দেশ যেত, অপরদিকে ধানমন্ডি ৩২ নম্বর সড়ক থেকে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ যেত, বাংলার মানুষ বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ মেনে চলতেন। অফিস, আদালত, ব্যাংক, বীমা, স্কুল-কলেজ, গাড়ি, শিল্প কারখানা সবই বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ মেনেছে। ইয়াহিয়ার সব নির্দেশ অমান্য করে অসহযোগ আন্দোলনে বাংলার মানুষের সেই অভূতপূর্ব সাড়া ইতিহাসে বিরল ঘটনা। মূলত ৭ই মার্চ থেকে ২৫শে মার্চ বাংলাদেশ স্বাধীন দেশ হিসাবে বঙ্গবন্ধুই রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন। ১৬ই মার্চ ঢাকায় ক্ষমতা হস্তান্তর প্রশ্নে মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক শুরু হয়। আলোচনার জন্য জনাব ভুট্টোও ঢাকায় আসেন। ২৪শে মার্চ পর্যন্ত ইয়াহিয়া-মুজিব-ভুট্টো আলোচনা হয়। ২৫শে মার্চ আলোচনা ব্যর্থ হবার পর সন্ধ্যায় ইয়াহিয়ার ঢাকা ত্যাগ। ২৫শে মার্চ দিবাগত রাতে নিরীহ নিরস্ত্র বাঙালির ওপর পাকিস্তান সেনাবাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে। আক্রমণ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পিলখানা রাইফেল সদর দফতর ও রাজারবাগ পুলিশ হেডকোয়ার্টার।

বঙ্গবন্ধু ২৫শে মার্চ রাত ১২টা ২০ মিনিটে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন:

> This may be my last message, from to-day Bangladesh is independent. I call upon the people of Bangladesh wherever you might be and with whatever you have, to resist the army of occupation to the last. Your fight must go on until the last soldier of the Pakistan occupation army is expelled from the soil of Bangladesh and final victory is achieved.
>
> *[অনুবাদ : এটাই হয়ত আমার শেষ বার্তা, আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। বাংলাদেশের জনগণ, তোমরা যে যেখানেই আছ এবং যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শেষ পর্যন্ত দখলদার সৈন্য বাহিনীকে প্রতিরোধ করার জন্য আমি তোমাদের আহ্বান জানাচ্ছি। পাকিস্তান দখলদার বাহিনীর শেষ সৈনিকটিকে বাংলাদেশের মাটি থেকে বিতাড়িত করে চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত তোমাদের যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে।]*

Scanned with CamScanner

ঘোষণা করেন। ১৪ই ডিসেম্বর বাংলাদেশের প্রথম সংবিধানে বঙ্গবন্ধু স্বাক্ষর করেন। ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকর হয়। প্রশাসনিকব্যবস্থার পুনর্গঠন, সংবিধান প্রণয়ন, এক কোটি মানুষের পুনর্বাসন, যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়ন, শিক্ষাব্যবস্থার সম্প্রসারণ, শিক্ষার্থীদের জন্য প্রাথমিক স্কুল পর্যন্ত বিনামূল্যে এবং মাধ্যমিক শ্রেণি পর্যন্ত নামমাত্র মূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ, মদ, জুয়া, ঘোড়দৌড়সহ সমস্ত ইসলামবিরোধী কর্মকাণ্ড কার্যকরভাবে নিষিদ্ধকরণ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড পুনর্গঠন, ১১,০০০ প্রাথমিক স্কুল প্রতিষ্ঠাসহ ৪০,০০০ প্রাথমিক স্কুল সরকারিকরণ, মুক্তিযুদ্ধে পাকবাহিনীর হাতে ধর্ষিতা মেয়েদের পুনর্বাসনের জন্য নারী পুনর্বাসন সংস্থা, মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন, ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মাফ, বিনামূল্যে/স্বল্পমূল্যে কৃষকদের মধ্যে কৃষি উপকরণ বিতরণ, পাকিস্তানীদের পরিত্যক্ত ব্যাংক, বীমা ও ৫৮০টি শিল্প ইউনিটের জাতীয়করণ ও চালু করার মাধ্যমে হাজার হাজার শ্রমিক-কর্মচারীর কর্মসংস্থান, ঘোড়াশাল সার কারখানা, আশুগঞ্জ কমপ্লেক্সের প্রাথমিক কাজ ও অন্যান্য নতুন শিল্প স্থাপন, বন্ধ শিল্প কারখানা চালুকরণসহ অন্যান্য সমস্যার মোকাবেলা করে একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক অবকাঠামো তৈরি করে দেশকে ধীরে ধীরে একটি সমৃদ্ধিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করার প্রয়াস চালানো হয়। অতি অল্প সময়ে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক রাষ্ট্রের স্বীকৃতি লাভ ছিল বঙ্গবন্ধু সরকারের উল্লেখযোগ্য সাফল্য।

১৯৭৩

জাতীয় সংসদের প্রথম নির্বাচনে ৩০০ আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগের ২৯৩ আসন লাভ। ৩রা সেপ্টেম্বর আওয়ামী লীগ, সিপিবি ও ন্যাপের সমন্বয়ে ঐক্যফ্রন্ট গঠিত হয়। ৬ই সেপ্টেম্বর জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানের জন্য বঙ্গবন্ধু আলজেরিয়া যান। ১৭ই অক্টোবর তিনি জাপান সফর করেন।

১৯৭৪

২২শে ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশকে পাকিস্তান স্বীকৃতি দেয়। ২৩শে ফেব্রুয়ারি ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (ওআইসি) শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান গমন করেন। ১৭ই সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে এবং বঙ্গবন্ধু ২৫শে সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে প্রথমবারের মতো বাংলায় ভাষণ দেন।

Scanned with CamScanner

১৯৭৫

২৫শে জানুয়ারি রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির সরকারব্যবস্থা প্রবর্তন এবং বঙ্গবন্ধুর রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ। ২৪শে ফেব্রুয়ারি দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে জাতীয় দল বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ গঠন। বঙ্গবন্ধু জাতীয় দলে যোগদানের জন্য দেশের সকল রাজনৈতিক দল ও নেতাদের প্রতি আহ্বান জানান। বিদেশি সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে বাঙালি জাতিকে আত্মনির্ভরশীল হিসাবে গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। তাই স্বাবলম্বিতা অর্জনের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক নীতিমালাকে নতুনভাবে ঢেলে সাজান। স্বাধীনতাকে অর্থবহ করে মানুষের আহার, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা ও কাজের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি ঘোষণা দেন যার লক্ষ্য ছিল –দুর্নীতি দমন; ক্ষেতে খামারে ও কলকারাখানায় উৎপাদন বৃদ্ধি; জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এবং জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা। এই লক্ষ্যে দ্রুত অগ্রগতি সাধিত করবার মানসে ৬ জুন বঙ্গবন্ধু সকল রাজনৈতিক দল, পেশাজীবী, বুদ্ধিজীবী মহলকে ঐক্যবদ্ধ করে এক মঞ্চ তৈরি করেন, যার নাম দেন বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ। বঙ্গবন্ধু এই দলের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।

সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রামে অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়ে অভূতপূর্ব সাড়া পান। অতি অল্প সময়ের মধ্যে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হতে শুরু করে। উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। চোরাকারবারি বন্ধ হয়। দ্রব্যমূল্য সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার আওতায় চলে আসে।

নতুন আশার উদ্দীপনা নিয়ে স্বাধীনতার সুফল মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবার জন্য দেশের মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে অগ্রসর হতে শুরু করে। কিন্তু মানুষের সে সুখ বেশি দিন স্থায়ী হয় না।

১৫ই আগস্টের ভোরে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বাংলাদেশের স্থপতি বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিজ বাসভবনে সেনাবাহিনীর কতিপয় উচ্চাভিলাষী বিশ্বাসঘাতক অফিসারদের হাতে নিহত হন। সেদিন বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণী মহীয়সী নারী বেগম ফজিলাতুননেছা, বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠপুত্র মুক্তিযোদ্ধা লে. শেখ কামাল, পুত্র লে. শেখ জামাল, কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেল, দুই পুত্রবধূ সুলতানা কামাল ও রোজী জামাল, বঙ্গবন্ধুর ভাই শেখ নাসের, ভগ্নিপতি ও কৃষিমন্ত্রী আবদুর রব সেরনিয়াবাত ও তাঁর কন্যা বেবী সেরনিয়াবাত, বঙ্গবন্ধুর ভাগ্নে যুবনেতা ও সাংবাদিক শেখ ফজলুল হক মণি ও তাঁর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী আরজু

Scanned with CamScanner

মণি, বঙ্গবন্ধুর সামরিক সচিব কর্নেল জামিল আহমেদ এবং ১৪ বছরের কিশোর আবদুল নঈম খান রিন্টুসহ ১৬ জনকে ঘাতকরা হত্যা করে।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট মহামানব বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শহীদ হবার পর দেশে সামরিক শাসন জারি হয়। গণতন্ত্রকে হত্যা করে মৌলিক অধিকার কেড়ে নেয়া হয়। শুরু হয় হত্যা, ক্যু ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতি। কেড়ে নেয় জনগণের ভাত ও ভোটের অধিকার।

বিশ্বে মানবাধিকার রক্ষার জন্য হত্যাকারীদের বিচারের বিধান রয়েছে, কিন্তু বাংলাদেশে জাতির জনকের আত্মস্বীকৃত খুনিদের বিচারের হাত থেকে রেহাই দেবার জন্য ২৬শে সেপ্টেম্বর এক সামরিক অধ্যাদেশ (ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স) জারি করা হয়। জেনারেল জিয়াউর রহমান সামরিক শাসনের মাধ্যমে অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করে পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স নামে এক কুখ্যাত কালো আইন সংবিধানে সংযুক্ত করে সংবিধানের পবিত্রতা নষ্ট করে। খুনিদের বিদেশে অবস্থিত বিভিন্ন দূতাবাসে চাকরি দিয়ে পুরস্কৃত করে।

১৯৯৬ সালের ২৩শে জুন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করার পর ২রা অক্টোবর ধানমন্ডি থানায় তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ তাঁর পরিবারের সদস্যগণকে হত্যার বিরুদ্ধে এজাহার দায়ের করা হয়। ১২ই নভেম্বর জাতীয় সংসদে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল করা হয়। ১লা মার্চ '৯৭ ঢাকার জেলা ও দায়রা জজ আদালতে বিচারকার্য শুরু হয়। ৮ই নভেম্বর '৯৮ জেলা ও দায়রা জজ কাজী গোলাম রসুল ৭৬ পৃষ্ঠার রায় ঘোষণায় ১৫ জনকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন। ১৪ই নভেম্বর ২০০০ সালের হাইকোর্টে মামলার ডেথ রেফারেন্স ও আপিলে দুই বিচারক বিচারপতি মোঃ রুহুল আমিন এবং বিচারপতি এ.বি.এম খায়রুল হক দ্বিমতে বিভক্ত রায় ঘোষণা করেন। এরপর তৃতীয় বিচারপতি মোঃ ফজলুল করিম ১২ জনের মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেন। এরপর পাঁচজন আসামি আপিল বিভাগে লিভ টু আপিল করে। ২০০২-২০০৬ পর্যন্ত বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের সময় মামলাটি কার্যতালিকা থেকে বাদ দেয়া হয়। ২০০৭ সালে শুনানির জন্য বেঞ্চ গঠিত হয়। ২০০৯ সালে ২৯ দিন শুনানির পর ১৯শে নভেম্বর প্রধান বিচারপতিসহ পাঁচজন বিচারপতি রায় ঘোষণায় আপিল খারিজ করে ১২ জনের মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখেন। ২০১০ সালের ২রা জানুয়ারি আপিল বিভাগে আসামিদের রিভিউ পিটিশন দাখিল এবং তিন দিন

Scanned with CamScanner

শুনানি শেষে ২৭শে জানুয়ারি চার বিচারপতি রিভিউ পিটিশনও খারিজ করেন। এদিনই মধ্যরাতের পর ২৮শে জানুয়ারি পাঁচ ঘাতকের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। ঘাতকদের একজন বিদেশে পলাতক অবস্থায় মারা গেছে এবং ছয়জন বিদেশে পলাতক রয়েছে। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিচারের দাবি ৩৪ বছর পর বাস্তবায়িত হলো।

১৫ই আগস্ট জাতির জীবনে এক কলঙ্কময় দিন। এই দিবসটি জাতীয় শোক দিবস হিসেবে বাঙালি জাতি পালন করে।

Scanned with CamScanner

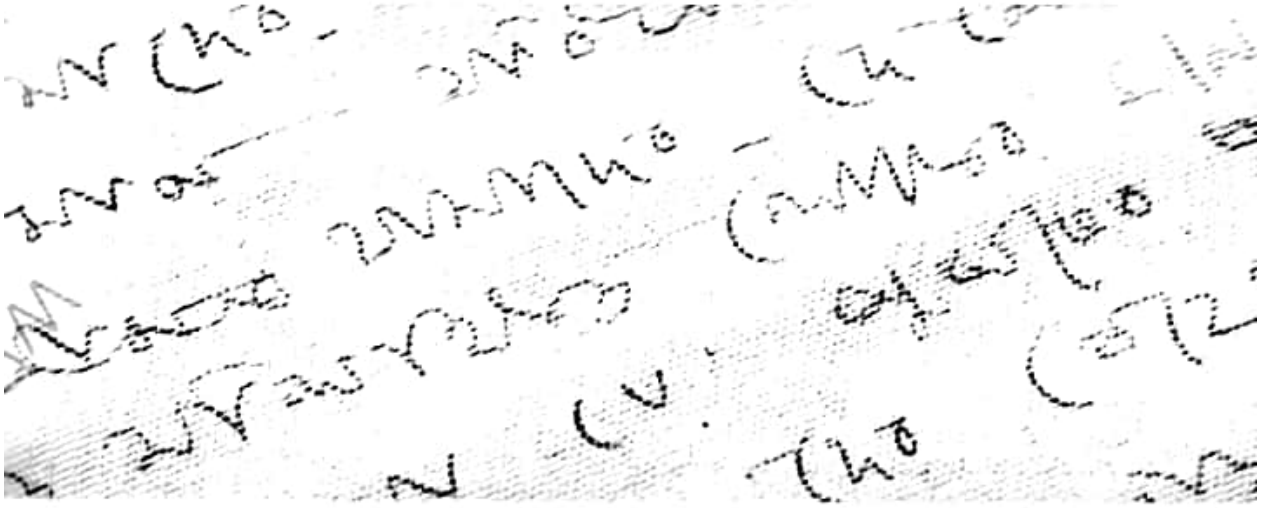

টীকা

আজমল খাঁ : রাজনীতিবিদ আতাউর রহমান খানের আত্মীয়। তৎকালীন বার্মার রেঙ্গুনে ব্যবসা করতেন। পিকিং শান্তি সম্মেলনে যাওয়ার পথে রেঙ্গুনে যাত্রাবিরতিকালে তাঁর ব্যক্তিগত গাড়িতে চড়িয়ে শেখ মুজিবুর রহমান-সহ আরও কয়েকজন রাজনীতিককে রেঙ্গুনের বিভিন্ন স্থান ঘুরিয়ে দেখান। তাঁর বাসায়ও আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেন।

আতাউর রহমান খান (১৯০৭-১৯৯১) : আওয়ামী লীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সহসভাপতি। সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ-এর অন্যতম সদস্য। আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি হিসেবে যুক্তফ্রন্টের যুগ্ম আহ্বায়ক। এ কে ফজলুল হকের নেতৃত্বে গঠিত যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় (১৯৫৪) পূর্ববঙ্গ সরকারের বেসামরিক সরবরাহ দপ্তরের মন্ত্রী এবং ১৯৫৬-৫৮ সময়কালে মুখ্যমন্ত্রী। পরে আওয়ামী লীগের সঙ্গে মতবিরোধ দেখা দেওয়ায় তিনি ১৯৬৯ সালে জাতীয় লীগ নামে রাজনৈতিক দল গঠন করেন। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর বঙ্গবন্ধু প্রতিষ্ঠিত বাকশালে যোগদান করেন। পরবর্তীকালে সেনাশাসক হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের সরকারে যোগ দিয়ে নয় মাস প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : *ওজারতির দুই বছর, স্বৈরাচারের দশ বছর, প্রধানমন্ত্রীত্বের নয় মাস*।

আবদুল্লা মল্লিক : পাকিস্তানি রাজনীতিবিদ। পিকিং শান্তি সম্মেলনে তিনি পাকিস্তান প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসেবে চীন সফর করেন।

আব্বাসউদ্দীন আহমদ (১৯০৯-১৯৫৯) : কিংবদন্তিতুল্য সংগীতশিল্পী। পূর্ববঙ্গ সরকারের প্রচার বিভাগে এডিশনাল সং অর্গানাইজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর কণ্ঠে পল্লিগীতি বিশেষ মাত্রা অর্জন করে।

আরফান খান : রাজনীতিবিদ আতাউর রহমান খানের আত্মীয়। টাঙ্গাইলের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান। রেঙ্গুনের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আজমল খাঁর পিতা।

ইয়ার মোহাম্মদ খান (১৯২০–১৯৮১) : রাজনীতিবিদ। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতাদের একজন। আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা কোষাধ্যক্ষও। তাঁর ঢাকার বাসভবন (১৮ কর্কুন বারী লেন) ছিল আওয়ামী লীগের প্রথম দলীয় কার্যালয়। তিনি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে একটি জিপ দান করেন।

Scanned with CamScanner

উ নু (১৯০৭-১৯৯৫) : সাবেক বার্মা অর্থাৎ বর্তমান স্বাধীন মিয়ানমারের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। তিনি ক্ষমতাসীন হয়ে ঘোষণা করেন দেশটির সাধারণ পরিচয় হবে একই ধর্ম–বৌদ্ধধর্মের ভিত্তিতে। তাঁর রাজনৈতিক দলের নাম ইউনিয়ন পার্টি। ছাত্ররাজনীতির মধ্য দিয়ে রাজনীতিতে তাঁর আবির্ভাব।

এ. কে. গোপালন (১৯০৪-১৯৭৭) : তাঁর পুরো নাম আইলিয়াথ কাট্টিয়ারি গোপালন (Ayillyath Kuttiari Gopalan)। ভারতের বিখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা। জন্ম ভারতের উত্তর কেরালায়। ব্রিটিশ ভারতে খেলাফত আন্দোলনে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের শুরু। ১৯২৭ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান এবং মহাত্মা গান্ধীর খাদি আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ভারতীয় লোকসভার সদস্য। তাঁর বিখ্যাত আত্মজীবনী 'Ente Jeevitha Kadha' বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তিনি পিকিং শান্তি সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন।

এম এ ওয়াদুদ (১৯২৫-১৯৮৩) : জন্ম চাঁদপুরে। ভাষাসংগ্রামী ও মুক্তিযোদ্ধা। গণতান্ত্রিক যুবলীগ, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ এবং কচিকাঁচার মেলার প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য। প্রাদেশিক ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্যে কয়েকবার কারাবরণ করেন। পাকিস্তানের সূচনালগ্ন থেকে বাংলাদেশের অভ্যুদয় পর্যন্ত বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

কারেন সম্প্রদায় : বার্মার একটি পাহাড়ি নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী। সে-সময়ের উ নু সরকারের বিরুদ্ধে অধিকার আদায়ের জন্যে গেরিলা যুদ্ধ চালাচ্ছিল। কারেন বিদ্রোহী যোদ্ধারা আক্রমণ করে পাহাড়ি জঙ্গলে লুকিয়ে যেতো। তবে তাদের এই বিদ্রোহের পেছনে জনগণের সমর্থন ছিল না। স্থানীয় কমিউনিস্ট পার্টির আন্দোলনের নেপথ্যে কারেন সম্প্রদায়ের সমর্থন ছিল। বার্মা সরকারের কাছে তারা দীর্ঘদিন ধরে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দাবি করে আসছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান যখন বার্মা অধিকার করে তখন কারেন সম্প্রদায়ের হাতে বহু অস্ত্র চলে আসে। পরে অবশ্য সরকার কারেনদের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার দিতে রাজি হয়।

ক্লিমেন্ট এটলি (১৮৮৩-১৯৬৭) : ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ। তিনি ১৯৪৫ সাল থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী এবং ১৯৩৫ সাল থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত লেবার পার্টির নেতা ছিলেন।

খান গোলাম মহম্মদ খান লুন্দখোর (১৯০৮-?) : সীমান্ত প্রদেশ আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক। ১৯৫৩ সালে ময়মনসিংহে আওয়ামী লীগের বিশেষ কাউন্সিলে আমন্ত্রিত হয়ে আসেন। পিকিং শান্তি সম্মেলনে পাকিস্তান প্রতিনিধিদলের সদস্য হয়ে তিনি চীন সফর করেন।

খোন্দকার আবদুল হামিদ (১৯১৮-১৯৮৩) : সাংবাদিক ও রাজনীতিক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। ১৯৪৬ সালে কলকাতার দৈনিক ইত্তেহাদের মধ্য দিয়ে তাঁর

Scanned with CamScanner

সাংবাদিকতা জীবনের শুরু। দৈনিক মিল্লাত পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি ও দৈনিক আজাদ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস (১৯২৩-১৯৯৫) : লেখক, সাংবাদিক, সংস্কৃতিসাধক ও রাজনীতিক। দেশ বিভাগের পূর্বে কলকাতায় আজাদ ও ইত্তেহাদে সাংবাদিকতা শুরু। বিভাগ-উত্তরকালে ঢাকা থেকে সাপ্তাহিক যুগের দাবি প্রকাশ ও সম্পাদনা করেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ভারত গমন এবং যুদ্ধে সক্রিয় সহযোগিতা প্রদান। আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য (১৯৭৮-১৯৮১) *ভাসানী যখন ইউরোপে, কতো ছবি কতো গান, মুজিববাদ, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন* ইত্যাদি গ্রন্থের লেখক।

চিয়াং কাইশেক (১৮৮৭-১৯৭৫) : বিশ শতকের একজন চীনা সামরিক ও রাজনৈতিক নেতা। সান ইয়াৎ-সেনের অন্যতম ঘনিষ্ঠ সহযোগী চিয়াং ছিলেন চীনা জাতীয়তাবাদী ও কুওমিন্তাঙ (কেএমটি) দলের একজন প্রভাবশালী সদস্য। ১৯২৬ সালে চিয়াং সমগ্র চীনকে একত্রিত করার উদ্দেশ্যে উত্তর অভিযান পরিচালনা করেন এবং অত্যন্ত স্বল্প সময়ের মধ্যে সমগ্র চীনের অঘোষিত নেতায় পরিণত হন। ১৯২৮ থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত প্রজাতন্ত্রী চীনের জাতীয় সামরিক কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ছিলেন। দ্বিতীয় চীন-জাপান যুদ্ধের পর সমগ্র চীনের একচ্ছত্র অধিপতি হিসেবে অধিষ্ঠিত হন। ১৯৪৯ সালের শেষের দিকে লাল চীন সৈন্যবাহিনী ক্যান্টন শহর দখল করলে চিয়াং সহযোগীদের নিয়ে পালিয়ে ফরমোজা দ্বীপে আশ্রয় নেন।

চৌ এন-লাই (১৮৯৮-১৯৭৬) : চীনের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। চীনের অবিসংবাদিত নেতা মাও সে তুং-এর অধীনে তিনি কাজ করেন এবং চীনের কমিউনিস্ট পার্টির ক্ষমতায় আরোহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। দক্ষ ও ঝানু কূটনীতিক চৌ এন-লাই বৈদেশিক নীতি পুনর্গঠনসহ চীনা অর্থনীতির উত্তরণে ব্যাপক ভূমিকা রাখেন।

চ্যু তে (১৮৮৬-১৯৭৬) : চীনের রাজনীতিবিদ, বিপ্লবী এবং কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম পথিকৃৎ। তিনি দ্বিতীয় চীন-জাপান যুদ্ধের সময় এইট রুট আর্মির কমান্ডার-ইন-চিফ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ১৯৫৫ সালে তিনি পিপলস লিবারেশন আর্মির অন্যতম প্রধান প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে বিবেচিত হন।

জওহরলাল নেহরু (১৮৮৯-১৯৬৪) : জাতীয় কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতা ও স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। ১৯৪০ সালের ৩১শে অক্টোবর বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণে ভারতকে বাধ্য করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ শুরু করার অপরাধে তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয় এবং ১৯৪১ সালে মুক্তি দেওয়া হয়। ১৯৪২ সালের ৭ই আগস্ট বর্তমান মুম্বাইয়ের কংগ্রেস অধিবেশনে ঐতিহাসিক 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের প্রস্তাবক। এ প্রস্তাবের কারণে পরদিন তাঁকে গ্রেফতার করে আহমেদনগর দুর্গে নিয়ে যাওয়া হয়। এটা ছিল তাঁর দীর্ঘ ও শেষ কারাবাস। ১৯৪৫ সালের জানুয়ারিতে মুক্তিলাভ করেন। তিনি আধুনিক ভারতের রূপকার।

জহিরুদ্দীন : ইসলামিয়া কলেজে শেখ মুজিবুর রহমানের সহপাঠী-বন্ধু। তখন ছিলেন মুসলিম লীগের একনিষ্ঠ কর্মী। বাড়ি কলকাতায়। দেশভাগের পর ঢাকায় চলে আসেন

Scanned with CamScanner

কর্মজীবনে ছিলেন আইনজীবী। আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্তির মাধ্যমে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ভূমিকা পালন করেন। ভাষা আন্দোলনের পর শহিদ পরিবারের পক্ষে তিনি আইনি লড়াইয়ে অবতীর্ণ হন। ১৯৬৭ সালে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে মামলার সওয়াল-জবাব করেন।

জি. এম. সৈয়দ (১৯০৪-১৯৯৫) : পুরো নাম গোলাম মুরতজা সৈয়দ। পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের বিশিষ্ট রাজনীতিক। আধুনিক সিন্ধি জাতীয়তাবাদের প্রধান প্রবক্তা। তিনি শান্তিপূর্ণ ধর্মীয় সহাবস্থান, ধর্মনিরপেক্ষতা, সিন্ধি জাতীয়তাবাদের প্রস্তাবিত সুফি মতাদর্শের রাজনৈতিক বাস্তবায়ন পুনরুদ্ধার করেছিলেন এবং সিন্ধুদেশ আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপন করেন। সিন্ধুবিরোধী নীতির বিরোধিতার কারণে জীবনের প্রায় ৩০ বছর কারাবাস ও গৃহবন্দি অবস্থায় কাটিয়েছেন। পিকিং শান্তি সম্মেলনে পাকিস্তান প্রতিনিধিদলের সদস্য হয়ে তিনি অংশ নেন।

তফাজ্জল হোসেন (১৯১১-১৯৬৯) : ডাক নাম মানিক মিয়া। বিখ্যাত সাংবাদিক ও রাজনৈতিক ভাষ্যকার। বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তাঁর সম্পাদিত ইত্তেফাকের ভূমিকা ছিল তুলনারহিত। শেখ মুজিবুর রহমানের ৬ দফা এ পত্রিকার মাধ্যমে গোটা পূর্ববাংলার জনগণের কাছে 'আমাদের বাঁচার দাবী' হিসেবে জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এ জন্যে অগণতান্ত্রিক ও স্বৈরাচারী পাকিস্তানি সরকারসমূহ তাঁকে বারবার কারাগারে নিক্ষেপ করে এবং তাঁর পত্রিকা বন্ধ করে দেয়।

তাহিরা মাজহার আলী (১৯২৪-২০১৫) পাকিস্তানের নারী অধিকার, রাজনৈতিক ও মানবাধিকার কর্মী। পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী সিকন্দার হায়াত খান তাঁর বাবা। তাঁর স্বামী পাকিস্তানের সমাজতান্ত্রিক বুদ্ধিজীবী ও সাংবাদিক মাজহার আলী খান। পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ সাংবাদিক, লেখক, চলচ্চিত্রনির্মাতা ও মানবাধিকার কর্মী তারিক আলীর মাতা। পিকিং শান্তি সম্মেলনে পাকিস্তান প্রতিনিধিদলের সদস্য হয়ে মহিলাদের পক্ষ থেকে তিনি বক্তৃতা করেন।

নাজিম হিকমত (১৯০২-১৯৬৩) : তুরস্কের বিখ্যাত কবি ও নাট্যকার। ১৯৫০ সালে চিলির কবি ও রাজনীতিবিদ পাবলো নেরুদার সঙ্গে যৌথভাবে নোবেল শান্তি পুরস্কার পান। বিপ্লবী কবিতা লিখে যাঁরা গণমানুষের হৃদয়ে স্থায়ী আসন করে নিয়েছেন, নাজিম হিকমত তাঁদের অন্যতম। তাঁর কবিতা পৃথিবীর প্রায় ৫০টি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তিনি দীর্ঘদিন জেল খেটেছেন। 'জেলখানার চিঠি' তাঁর বিশ্বখ্যাত কবিতা। মস্কোতে অবস্থানকালে রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব তাঁকে ভীষণভাবে আলোড়িত করে। পিকিং শান্তি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন তিনি।

নানকিং বিশ্ববিদ্যালয় : এটি চীনের একটি প্রাচীন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়। চীনা ভাষায় এটি জিনলিং (Jinling) বিশ্ববিদ্যালয় নামে পরিচিত। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৮৮ সালে। পিকিং সম্মেলনে শেখ মুজিবুর রহমান প্রতিনিধিদলের সঙ্গে নানকিং বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করেন।

Scanned with CamScanner

পাকিস্তান শান্তি কমিটি : বিশ্ব শান্তি পরিষদের একটি শাখা। পিকিং শান্তি সম্মেলনে পাকিস্তান শান্তি কমিটির পক্ষে একটি প্রতিনিধিদল অংশ নিয়েছিলেন। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে অংশ নেন রাজনীতিবিদ পীর মানকী শরীফ, খান গোলাম মহম্মদ খান লুন্দখোর, মাহমুদুল হক কাসুরী, ফজলুল হক সায়েদা, আব্দুল্লা মল্লিক প্রমুখ আর পূর্ব পাকিস্তান থেকে রাজনীতিবিদ আতাউর রহমান খান, সাংবাদিক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া, রাজনীতিবিদ শেখ মুজিবুর রহমান, সাংবাদিক ও লেখক খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস ও উর্দু লেখক ইউসুফ হাসান।

পিকিং : চীনের এক সময়ের রাজধানী। চীনা ভাষায় পিকিং-এর নাম বেইজিং। বর্তমানে এটি 'বেইজিং' নামেই পরিচিত এটি চীনের রাজনীতি, শিক্ষা, বুদ্ধিবৃত্তি ও সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র। এর লোকসংখ্যা ২১.৫৪ মিলিয়ন (২০১৮)।

পিকিং শান্তি সম্মেলন : নয়াচীন সরকারের উদ্যোগে পিকিংয়ে ১৯৫২ সালের ২-১২ই অক্টোবর অনুষ্ঠিত হয় এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় আঞ্চলিক শান্তি সম্মেলন (Peace Conference of the Asian and Pacific Regions)। এই সম্মেলনে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান যোগ দিয়েছিলেন। পূর্ব পাকিস্তান থেকে আরও যোগ দেন রাজনীতিবিদ আতাউর রহমান খান, সাংবাদিক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া, লেখক-সাংবাদিক খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস ও উর্দুভাষী লেখক সৈয়দ ইউসুফ হাসান। শান্তি সম্মেলনে ৩৭টি দেশের প্রতিনিধিবৃন্দ অংশ নেন। শেখ মুজিবুর রহমান মাতৃভাষা বাংলায় বক্তৃতা করেন। এই শান্তি সম্মেলনে অংশ নিয়েছিলেন তুরস্কের বিখ্যাত কবি নাজিম হিকমত, রাশিয়ার বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি লেখক আইজ্যাক আসিমভ ও ভারতের বিখ্যাত লেখক মনোজ বসু।

পীর মানকী শরীফ (১৯২৩-১৯৬০) : পুরো নাম পীর আমিনুল হাসনাত। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের একজন প্রগতিশীল ধর্মীয় নেতা। ১৯৪৫ সালে মুসলিম লীগে যোগ দেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে ব্যাপক অবদান রাখেন।

ফজলুল হক সায়েদা : পশ্চিম পাকিস্তান সীমান্ত প্রদেশের আওয়ামী মুসলিম লীগ নেতা। পিকিং শান্তি সম্মেলনে পাকিস্তান প্রতিনিধিদলের সদস্য হয়ে তিনি চীন সফর করেন।

বোরহান শহীদ : চীনের সিং কিয়াং প্রদেশের তৎকালীন গভর্নর। পিকিং শান্তি সম্মেলনে তিনি অংশ নেন।

ভাষা আন্দোলন : বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদাদানের দাবিতে সংগঠিত গণ-আন্দোলন। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকার রাজপথে ছাত্রমিছিলে পুলিশের গুলিতে শহিদ হন সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারসহ আরও অনেকে। এই ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে শেখ মুজিবুর রহমান কারাবরণ করেন। পরবর্তী সময়ে ১৯৫৬ সালের পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকেও রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর ইউনেস্কো ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

Scanned with CamScanner

হিসেবে ঘোষণা করে। এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনকে একটি মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করে। পিকিং শান্তি সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু মাতৃভাষা বাংলায় বক্তৃতা করে ইতিহাস সৃষ্টি করেন।

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী (১৮৮০-১৯৭৬) : তাঁর রাজনীতির সূত্রপাত ঘটে আসামে। ১৯১৯ সালে কংগ্রেসে যোগদান করে খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ ও কারাদণ্ড ভোগ করেন। ১৯২৬ সালে আসামে কৃষক-প্রজা আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। ১৯৩৭ সালে কংগ্রেস ত্যাগ করে মুসলিম লীগে যোগ দেন। ঐ বছর আসামে বাঙালি নিপীড়নের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। ১৯৪৪ সালে আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। পাকিস্তান আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯৪৭ সালে আসামে পুনরায় গ্রেফতার হন। ১৯৪৮ সালে মুক্তিলাভ করে পূর্ব বাংলায় চলে আসেন। ১৯৪৯ সালে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হন। ১৯৫৭ সালে আওয়ামী লীগ ত্যাগ করে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) প্রতিষ্ঠা করেন ও এর সভাপতি নির্বাচিত হন। ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে বাংলাদেশের সকল গণআন্দোলনে মুখ্য ভূমিকায় অংশগ্রহণ করেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় ছয় সদস্যবিশিষ্ট সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটির সভাপতি ছিলেন।

মনোজ বসু (১৯০১-১৯৮৭) : বাংলা সাহিত্যের খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক। জন্ম যশোর জেলার কেশবপুরের ডোঙ্গাঘাটা গ্রামে। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ *নিশিকুটুম্ব, সৈনিক, বাঁশের কেল্লা, বনমর্মর, চীন দেখে এলাম* ইত্যাদি। তিনি সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কারসহ নানা পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। পিকিং শান্তি সম্মেলনে তিনিও বাংলায় বক্তৃতা করেন।

মহাত্মা গান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৮) : পুরো নাম মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। ভারতের জাতির পিতা এবং ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতা। ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গা শুরু হলে তা নিরসনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। ব্রিটিশবিরোধী অহিংস আন্দোলনের নেতা। নাথুরাম গডসে নামক এক আততায়ীর গুলিতে নিহত হন।

মাও সে তুং (১৮৯৩-১৯৭৬) : চীনা বিপ্লবী তাত্ত্বিক, রাজনৈতিক নেতা, লেখক ও কবি। ১৯৪৯ সালে সমাজতন্ত্রী চীন প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১৯৭৬ সালে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি চীনের অবিসংবাদিত নেতা। তাঁর তাত্ত্বিক অবদান, সমরকৌশল এবং কমিউনিজমের নীতি এখন একত্রে 'মাওবাদ' নামে পরিচিত। ১৯৪৯ সালের ১লা অক্টোবর তাঁর নেতৃত্বে নয়াচীন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এটি ছিল দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে চলা গৃহযুদ্ধ এবং আন্তর্জাতিক যুদ্ধের চূড়ান্ত পরিণতি।

মাজহার আলী খান (১৯১৭-১৯৯৩) : পাকিস্তানের সমাজতান্ত্রিক বুদ্ধিজীবী ও বিখ্যাত সাংবাদিক। ১৯৫০-এর দশকে পাকিস্তান টাইমস-এর সম্পাদক ছিলেন। পিকিং শান্তি সম্মেলনে যোগদানের আগে থেকেই বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তাঁর পরিচয়। ব্রিটিশ ভারতের

Scanned with CamScanner

পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী সিকান্দার হায়াত খানের জামাতা। পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ সাংবাদিক, লেখক, চলচ্চিত্রনির্মাতা ও মানবাধিকার কর্মী তারিক আলীর পিতা।

মাহবুব : শেখ মুজিবুর রহমানের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সহপাঠী। ১৯৫২ সালে তিনি ছিলেন চীনের পাকিস্তান দূতাবাসের তৃতীয় সচিব। শান্তি সম্মেলন চলাকালীন পিকিংয়ে আকস্মিকভাবে সস্ত্রীক মাহবুবের সঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমানের দেখা হয়। মাহবুব-দম্পতির বাসায় আতাউর রহমান খান, তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া, খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াসসহ শেখ মুজিবুর রহমান একাধিকবার তাদের আন্তরিকতা ও আতিথেয়তায় অভিভূত হন।

মিয়া মাহমুদ আলী কাসুরী (১৯১০-১৯৮৭) : পাকিস্তানের প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ, মানবাধিকার কর্মী এবং বামপন্থি আইনজীবী। তিনি ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম। তিনি পাকিস্তান পিপলস পার্টিতে ১৯৭০ সালে যোগ দেন এবং ১৯৭৩ সালে ১ম পাকিস্তানের সর্বসম্মত সংবিধান তৈরিতে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। পাকিস্তান পিপলস পার্টির গণতন্ত্রবিরোধী কার্যকলাপে অসন্তুষ্ট হয়ে ১৯৭৩ সালে অন্যতম বিরোধী দল আসগর খানের তেহরিক-ই-ইস্তেকলাল পার্টিতে যোগ দেন ও মৃত্যু অবধি ঐ দলের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। তিনি স্ট্যালিন শান্তি পুরস্কারে ভূষিত হন।

মিয়া মুহাম্মদ ইখতিখারউদ্দিন (১৯০৮-১৯৬২) : ১৯৩৭ সালে তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মনোনয়নে পাঁবোর ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৪৫ সালে মুসলিম লীগে যোগ দেন। ১৯৪৭-৫৪ সাল অবধি তিনি পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য ছিলেন। এছাড়া তিনি ছিলেন আজাদ পাকিস্তান পার্টির (১৯৫০-৫৬) প্রতিষ্ঠাতা নেতা এবং ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি অব পাকিস্তানের একজন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য।

মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক (১৮৮১-১৯৩৮) : আধুনিক তুরস্কের জনক। ওসমানীয় সাম্রাজ্যের সামরিক কর্মকর্তা, বিপ্লবী রাজনৈতিক, লেখক এবং তুরস্কের প্রথম রাষ্ট্রপতি। আধুনিক তুর্কি প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় আতাতুর্ক সামরিক কর্মকর্তা ছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ওসমানীয় সাম্রাজ্যের পতনের পর তুরস্কের স্বাধীনতা যুদ্ধে তুর্কি জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। আঙ্কারায় একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রতিষ্ঠা করে এর মাধ্যমে মিত্রবাহিনীকে পরাজিত করেন তাঁর এই সামরিক অভিযানের ফলেই তুরস্ক স্বাধীনতা লাভ করে।

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ (১৮৭৬-১৯৪৮) : পাকিস্তান আন্দোলনের প্রধান নেতা। প্রথম জীবনে অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক চেতনায় বিশ্বাসী হলেও শেষ পর্যন্ত ধর্মতান্ত্রিক দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন ও প্রথম গভর্নর জেনারেল হন। ১৯৪৮ সালে ঢাকায় এসে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দেওয়ায় ছাত্রদের তীব্র প্রতিবাদের মুখে পড়েন

ম্যাডাম সান ইয়াৎ-সেন (১৮৯৩-১৯৮১) : চীনা ভাষায় তাঁর নাম Soong Ching-Ling। একজন চীনা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব চীন প্রজাতন্ত্রের অন্যতম নেতা সান

Scanned with CamScanner

ইয়াৎ-সেনের দ্বিতীয় স্ত্রী। ১৯৪৯ সালের আগে ও পরে চীনের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৪৯ সালে নয়াচীন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তিনি বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ভাইস চেয়ারম্যান এবং জাতীয় গণ-কংগ্রেসের স্থায়ী কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান। ১৯৮১ সালের মে মাসে তাঁকে চীনের 'সম্মানিত রাষ্ট্রপতি' উপাধি দেওয়া হয়। তিনি পিকিং শান্তি সম্মেলনে উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন। ১৯৫৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) : বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভা। তিনি একাধারে কবি, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, ছোটোগল্পকার, প্রাবন্ধিক, দার্শনিক, সংগীত রচয়িতা, সুরস্রষ্টা, গায়ক, চিত্রশিল্পী, অভিনেতা, সমাজসেবী ও শিক্ষাবিদ। ১৯১৩ সালে গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থের জন্য তাঁকে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি' তাঁর রচিত।

লিবারেশন ডে : ১লা অক্টোবর নয়াচীনের স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস। এ দিন চীনের ৬০ কোটি মানুষ শোষণ ও বঞ্চনা থেকে দেশকে মুক্ত করে। দিনটি সরকারি ছুটির দিন এবং একে কেন্দ্র করে আরও ৬ দিন সাধারণ ছুটি পালিত হয়। ১লা অক্টোবর চীনবাসী কাজকর্ম ছেড়ে আনন্দে মেতে ওঠে। ব্যক্তি ও রাষ্ট্র এক বছরে কী কাজ করেছে তার পারস্পরিক সমীক্ষা করে। সেদিন তারা মাও সে তুং-এর বাণী শোনে। বাড়ি, গাড়ি, রাস্তাঘাটে থাকে শুধু লাল পতাকা। সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী এবং পদাতিক, অশ্বারোহী ও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর যৌথ উদ্যোগে প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়। মহিলা ন্যাশনাল গার্ড, কৃষক ও শিশু-কিশোরদের শোভাযাত্রার মাধ্যমে সবাই আনন্দ-উৎসবে অংশ নেয়। দেশব্যাপী অনুষ্ঠিত হয় এই আনন্দ-উৎসব ও কনসার্ট। ১৯৪৯ সালের ১লা অক্টোবর নয়াচীন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দেশটির প্রথম চেয়ারম্যান মাও সে তুং-এর আনুষ্ঠানিক ঘোষণা ও ভাষণের মধ্য দিয়ে নতুন পিপলস লিবারেশন আর্মির প্রথম পাবলিক প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়।

লিয়াকত আলী খান (১৮৯৬-১৯৫১) : পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। ১৯৫১ সালের ১৬ই অক্টোবর এক আততায়ী যুবকের গুলিতে নিহত হন।

সরদার শওকত হায়াত খান (১৯১৫-১৯৯৮) : পাকিস্তানের রাজনীতিবিদ, সামরিক কর্মকর্তা ও পাকিস্তান আন্দোলনের কর্মী। তিনি ব্রিটিশ-নিয়ন্ত্রিত পাঞ্জাবে মুসলিম লীগকে সংগঠিত করতে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। পাকিস্তান প্রতিনিধিদলের সদস্য হয়ে তিনি পিকিং শান্তি সম্মেলনে যোগ দেন।

সাইফুদ্দিন কিচলু (১৮৮৮-১৯৬৩) : ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামী ও জাতীয়তাবাদী নেতা। ১৯২৪ সালে অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৫২ সালে তাঁকে লেলিন শান্তি পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। পিকিং শান্তি সম্মেলনে তিনি ছিলেন ভারতীয় প্রতিনিধিদলের প্রধান।

Scanned with CamScanner

সান ইয়াৎ-সেন (১৮৬৬-১৯২৫) : চীনা বৈপ্লবিক লেখক, চিকিৎসক ও রাজনীতিবিদ। তিনি চীন প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রপতি ও নয়াচীনের পিতা। তিনি ছিলেন কুওমিন্তাঙ দলের প্রথম নেতা। তিনি চিকিৎসাশাস্ত্রে পড়াশোনা শেষ করে লন্ডন যান। দেশে রাজনৈতিক আদর্শ প্রচারের জন্য তিনি বিপন্ন হয়। তিনি সেদেশের মানচু রাজবংশের অপশাসনের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন। তিনি বিদেশে থাকা অবস্থায় ১৯১১ সালে মানচু রাজবংশের পতন হয়। ১৯১২ সালে তিনি রাষ্ট্রপতির পদ থেকে চ্যুত হন। ১২ই মার্চ তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

সৈয়দ আহমদ খান (১৮১৭-১৮৯৮) : স্যার সৈয়দ আহমদ নামে সমধিক পরিচিত। তাঁর জন্মনাম সৈয়দ আহমেদ তাকভি। ভারতের বিখ্যাত রাজনীতিক ও শিক্ষাবিদ। তিনি মুসলমানদের শিক্ষাবিস্তারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

সৈয়দ ইউসুফ হাসান (১৯২৬-?) : বিশিষ্ট উর্দুভাষী লেখক। ভাষা আন্দোলনে অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১০ সালে বাংলা একাডেমির পক্ষ থেকে তাঁকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। পিকিং শান্তি সম্মেলনে পাকিস্তান প্রতিনিধিদলের সদস্য হয়ে তিনি চীন ভ্রমণ করেন।

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী (১৮৯২-১৯৬৩) : প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ ও আইনজীবী। গণতান্ত্রিক নীতি ও জনমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এই নেতা 'গণতন্ত্রের মানসপুত্র' বলে খ্যাত। শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক গুরু। ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় জননন্দিত বক্তা। যুক্তফ্রন্ট গঠনের শীর্ষস্থানীয় নেতা। যুক্ত বাংলার শেষ প্রধানমন্ত্রী (১৯৪৬)। তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন।

হ্যাংচো হ্রদ : চীনের হ্যাংচো প্রদেশের একটি মিঠাপানির হ্রদ। এটি পশ্চিম হ্রদ (West Lake) নামেও পরিচিত। এই হ্রদে অনেক মন্দির, প্যাগোডা, উদ্যান এবং কৃত্রিম দ্বীপ রয়েছে। পিকিং সম্মেলনে পাকিস্তান প্রতিনিধিদলের সদস্যদের সঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমান নৌকা চালিয়ে এই হ্রদের সৌন্দর্য উপভোগ করেন।

১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ : এটি সাধারণত পঞ্চাশের মন্বন্তর (বাংলা ১৩৫০ সন) নামে অধিক পরিচিত। এই গুরুতর দুর্যোগে পূর্ববাংলার প্রায় সাত লক্ষ পরিবার তথা ৩৮ লক্ষ মানুষের আর্থ-সামাজিক বিপর্যয় ঘটে। ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৬ সালব্যাপী এই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ এবং এর ফলে সৃষ্ট মহামারিতে ৩৫ থেকে ৩৮ লক্ষ লোক মারা যায়। এ ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ নিয়ে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সিরিজ ছবি আঁকেন। তাঁর এসব চিত্রে দুর্ভিক্ষের দুঃসহ অবস্থার বাস্তবচিত্র উঠে এসেছে। সেসময় শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন আইএ পরীক্ষার্থী। তিনি তখন কংগ্রেস, ফরোয়ার্ড ব্লক ও কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীদের সঙ্গে মুসলিম লীগের যুবকর্মীদের নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটিতে যোগ দেন। দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সাহায্যার্থে লঙ্গরখানা পরিচালনা করেন।

Scanned with CamScanner